# যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনতত্ত্ব

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে

আর, এন, এণ্ড কোম্পানী, মালাকারটোলা, ঢাকা

চিকিৎসক, আইনজীবি, সমাজসেবী ও উচ্চশিক্ষিত
নর-নারী ভিন্ন অন্যের পাঠ নিষেধ।



রাজ সংস্করণ

প্রথম সংস্করণঃ ১লা জানুয়ারী ১৯৪৩।







ঢাকা, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

# মুখবন্ধ

এই গ্রন্থ যিনি লিখিয়াছেন তিনি একজন তরুণ সাহিত্যিক। ছাপিবার পূর্ব্বে ইহার পাণ্ডুলিপির অধিকাংশই আমায় পড়িতে দেন। পাঠ করিয়া আমার মন্দ লাগে নাই। এই অপরাধের দণ্ড স্বরূপ লেখক আমাকে ধরিয়া বসিলেন, ইহার একটা মুখবন্ধ লিখিয়া দিতে হইবে। লঘু অপরাধে গুরুদণ্ড ;—অনেক অনুরোধেও তিনি আমাকে নিষ্কৃতি দিলেন না, ইহাই আমার মুখবন্ধ লেখার কৈফিয়ৎ। কিন্তু আমার যাহা ভাল লাগিয়াছে, অন্যেরও তাহা ভাল লাগিবে, সেরূপ মনে করার ধৃষ্টতা আমার নাই।

আমি লেখকও নহি, সমালোচকও নহি। সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ লাভের ধৃষ্টতাও আমার নাই, তবু লেখক কিছুতেই আমাকে আত্মগোপন করিতে দিলেন না। লেখকের ইচ্ছা আমাকে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লিখিতেই হইবে।

যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায়ও ক্রমশঃ অনেক গ্রন্থ লেখা হইতেছে। যদিও অল্পদিন আগেও কাম-শাস্ত্রের উল্লেখ বা আলোচনা ভদ্র-রুচির বিচারে অপাংক্তেয় ছিল। শুধু যে আমাদের দেশেই এ ব্যবস্থা তাহা নয় ; প্রগতিশীল খাস ইয়োরোপেও এ ব্যবস্থার ব্যতিক্রম হওয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত সম্ভব হয় নাই। মানুষের সমুদয় চিন্তা ও কর্ম্মের মৌলিক প্রেরণা রূপে কামবৃত্তির স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া মনীষী ফ্রয়েডকেও সভ্য-জগতের বিচারে কম নিন্দাভাজন হইতে হয় নাই। যৌন-বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ Psychology of Sex ছয় ভল্যুম গ্রন্থ লিখিয়াও মনীষী Havalock Ellis ইংল্যাণ্ডে তাহা প্রকাশ করিবার মত সাহসী প্রকাশক পান নাই। এই সকল বৈজ্ঞানিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও সাহিত্যিকগণের এই সম্বন্ধে প্রচেষ্টাও সাধারণের বিচারে কম লাঞ্ছিত হয় নাই। ইবসেন, বার্ণাড্‌শ, ডি-এইচ

লরেন্স, জেমস্ জয়েস্-এর মত ধুরন্ধর সাহিত্যরথীগণও যৌনপ্রবৃত্তির নানা জটিল রহস্য সাহিত্যের মধ্য দিয়া রূপ দিতে গিয়া স্বদেশে-বিদেশে গালাগালি কিছু কম খান নাই।

মনোস্তাত্ত্বিকেরা বলেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিগুলির (Insticts) মধ্যে পেটের ক্ষুধার বেগ ও কামবৃত্তির (Sexual Instict) বেগই অন্যান্য সহজাত বৃত্তিগুলির বেগ হইতে বেশী দুর্ণিবার। কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত সমাজের অধঃপতন ও বিবর্ত্তন, সাহিত্যকলার চিরন্তন সৃষ্টি ও সাময়িক রূপায়ন; ধর্ম্মের প্রসার ও সঙ্কোচ যে এই দুর্ণিবার দুইটী বৃত্তিকে ঘিরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, কালের ইতিহাস ও মানুষের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। এখন প্রশ্ন এই যে, যে বৃত্তি মানুষের এমন দুর্ণিবার ও সহজাত, তাহাকে লইয়া খোলাখুলি আলোচনা করাকে মানুষ চিরকালই অপছন্দ করিয়াছে কেন? আমার মনে হয় দুর্ণিবার বলিয়াই তাহাকে লইয়া বেশী ঘাটানো ভদ্র ও শুচিমনের নিকট চিরকালই সূক্ষ্ম রুচির বিঘাতক বলিয়া ঠেকিয়াছে। স্বভাবতই যে বৃত্তি এত প্রবল, যার নিবৃত্তি সাধারণ মানুষ কেন, অতি মানুষের পক্ষেও দুরধিগম্য, সেই কামবৃত্তিকে লইয়া খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিতে গেলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও অবাধ যৌন-সঙ্গম বৃদ্ধি যে বেশী করিয়া বৃদ্ধি পাইবে না,—এ কথাও জোর করিয়া বলা যায় না। তারপর ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরোধপূর্ব্বক ব্রহ্মচারীর জীবন যাপনের উচ্চ আদর্শও সকল জাতির ধর্ম্মগ্রন্থে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সে আদর্শ অত্যন্ত কঠিন বলিয়াই সকল দেশের সকল উচ্চমনা মানবই ইহার অস্বাভাবিক প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে এই প্রবৃত্তিকে অতিশয় কদর্য্য ও ঘৃণ্যরূপে অঙ্কিত করা হইয়াছে; নারীকে নরকের দ্বার বলিয়া বিভীষিকার সৃষ্টি করা হইয়াছে,– ইহাও সুস্থ মনের লক্ষণ নহে।

যে শক্তি (Libido) মানুষের জ্ঞান ও কর্ম্মের পিছনে আত্মাশক্তিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে, যাহা মানুষের সমস্ত প্রকার সৃষ্টির মূলে, সেই কাম-প্রবৃত্তিকে অস্বীকার করা মূঢ়তা, আবৃত রাখা অনিষ্টকর। তবে তাহাকে সুস্থ, কল্যাণপ্রদ ও সমাজ-সম্মত উপায়ে চরিতার্থ করার উপরেই নির্ভর করে সমস্ত প্রকার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রকৃত শিক্ষা দীক্ষা। এইজন্য আমার মনে হয়, কামবৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজন আছে—অবশ্য গৃহস্থের পক্ষে, সন্ন্যাসীর পক্ষে নয়।

পুরাকালে ভারতবর্ষে, আরবে, মিশরে, চীনে কামশাস্ত্র বিষয়ক অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল কামশাস্ত্রের সহিত বর্ত্তমানের Sex-Psychology বা যৌন-বিজ্ঞানের পার্থক্য অনেক। সে সকল প্রাচীনকালের ও দেশের কামশাস্ত্রগুলি রচিত হইয়াছিল সম্পূর্ণ আলাদা দৃষ্টিকোণ হইতে। উহার উদ্দেশ্য ছিল যৌন-প্রবৃত্তিকেই বিশেষ ভাবে উদ্রিক্ত করা এবং নানা সুষ্ঠু ও কলাসম্মত উপায়ে কামক্রিয়াকে উপভোগ করার কৌশল শেখানো। সে সকল কামশাস্ত্রগুলিকে কাম-বিজ্ঞান কিংবা সাইকোলজি বলা যায় না এই কারণে যে, উহার বেশীর ভাগই Pornography-র সামিল—বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে লিখিত নয়। অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃত কাম-রসাত্মক (erotic) সাহিত্যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্' দুই সহস্র বছরের প্রাচীন গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বর্ণনীয় বিষয়ের ও উহার যুক্তিপূর্ণ রচনাবলী নবীন হেবলক্ এলিস্‌কেও হার মানায়। তবে ইহার সংখ্যা অতি অল্প।

আধুনিক কালের কাম-বিজ্ঞান বা যৌন-মনোস্তত্ত্ব কিন্তু Pornography-র সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। ইহার সীমানা বিস্তৃত। শরীর-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীবতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, চিকিৎসা-শাস্ত্র, রসশাস্ত্র এইসব আজ আধুনিক কাম-বিজ্ঞানের কুক্ষিগত। বিবাহ হইতে সুরু করিয়া

ব্যভিচার, বলাৎকার, পতিতাগমন, আত্মরতি (Narcissism), সমরতি (Homo-sexuality), পশ্বাচার প্রভৃতি আরও অনেক কিছু অর্থাৎ যত রকম স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক উপায়ে মানুষ কামবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া থাকে, আধুনিক কাম-বিজ্ঞান তাহার সব কিছুকেই এক অখণ্ড কামবৃত্তির (Libido) খণ্ড অভিব্যক্তি বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। তাহা ছাড়া এই কামবৃত্তি প্রতিহত বা repıessed হইলে যে সমস্ত মানসিক প্রতিক্রিয়া, যথা :—অনৈসর্গিক-আসক্তি, আত্মাবমাননা (Masochism), পরপীড়ন (Sadism), প্রতীকাশ্রয় (erotic symbolism), উদ্‌ঘাটন (exhibitionism), পানিমৈথুন (Masturbation) প্রভৃতিও নব্য কাম-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। অতঃপর স্ত্রী-পুরুষের যে সমস্ত যৌনব্যাধি—পুরুষের লৈঙ্গিক অসামর্থ্য, নারীর বন্ধ্যাত্ব বা অসারতা, শীঘ্রপতন, রতিজরোগ সমূহ, মূর্চ্ছা, উম্মত্ততা প্রভৃতি ব্যাধিও এই ব্যাপক শাস্ত্রের গবেষণার বিষয়। এমন কি উর্দ্ধায়িত (Sublimated) কামবৃত্তির যে সমস্ত অভিব্যক্তি অর্থাৎ শিল্পকলার অনুশীলন, ধর্ম্মানুষ্ঠান, জনসেবা কিংবা অবদমিত কামের (repressed) যে লোকাতীত স্বীকৃতি যথা, বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন স্ত্রী-আচার, টোটেম, সামাজিক রীতি-নীতি এ সকলও নব্য কামশাস্ত্রের এলাকায় পড়ে। এক কথায় নব্য কামশাস্ত্র আজ মানবের সভ্যতার ও কৃষ্টির সকল অঙ্গেই যৌন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হইতে আলোকসম্পাত করিতে ইচ্ছুক। ফ্রয়েড, এডলার ইয়ুং, হেবলক এলিস, ফোরেল, ক্রাফট্ এ্যাবিং প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক ও মনীষীদের মনীষার সংস্পর্শে আসিয়া আধুনিক কামশাস্ত্র আজ সভ্যতার এক প্রকাণ্ড নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বক্ষ্যমান আলোচ্য পুস্তকখানিও আধুনিক কামশাস্ত্রের একখানা প্রবেশিকা বা Introduction-এর মত। কারণ আধুনিক কামশাস্ত্রের

সমস্ত বিষয়বস্তুর দিক্‌দর্শন ইহাতে আশা করা যায় না। তবুও স্বল্প কথায় গ্রন্থকার যৌন-বিজ্ঞানের অনেক কথাই বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। লিখিবার রচনা কৌশলের উপরই যৌন-বিজ্ঞানের ভাল মন্দ নির্ভর করে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ একটা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি লইয়া এই শাস্ত্র লিখিতে না পারিলে উহা কদর্য্য পর্ণোগ্রাফীতে পর্য্যবসিত হয়। কাজেই এবিষয়ে নবীন লেখকগণের খুবই সতর্ক থাকা উচিত। নচেৎ এই শ্রেণীর সাহিত্য রচনার লোভ সম্বরণ করিতে হইবে। তাই কামসূত্রের গ্রন্থকার বাৎসায়ন সম্পর্কে বলা হইয়াছে:—"He himself had followed strictly the pure life of a Brahmachari, while composing the work for the benefit of the world and not for feeding the flames of desire."

আলোচ্য পুস্তকে সংক্ষিপ্তভাবে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে অল্প কথায় গ্রন্থকার নানা বিষয়ে আলোক সম্পাত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাতে বক্তব্যগুলি খুব দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই বিষয়টীর মুল্য খুব বেশী। যৌন-ইতিহাসের অধ্যায়টী পুস্তকের তুলনায় একটু বেশী বড় হইয়া গিয়াছে; কিন্তু কৌতূহলী পাঠকেরা ইহাতে অনেক নূতন কথার সন্ধান পাইবেন। যৌন-সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য অধ্যায়টী একটু ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে আরও কিছু বলা উচিত ছিল। কারণ বাল্য, কৌশোর ও যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপরই যৌনপ্রবৃত্তির ভোগক্ষমতা ও স্বাস্থ্য নির্ভর করে। যৌনতন্ত্র ও তাহার কার্য্যাবলী অধ্যায়টীতে অল্প কথায় জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি বলা হইয়াছে। কিন্তু যৌনযন্ত্রের সুন্দর সুন্দর ছবি না থাকিলে অনভিজ্ঞ লোকের পক্ষে ইহা অনুধাবন করা শক্ত হয়। জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও

তাহার প্রক্রিয়া অধ্যায়টী বেশ সুন্দর হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যাটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইতে কোন অংশে হীন নয়। বরং অর্থনৈতিক সমস্যার মূল উপায় জন্ম-নিয়ন্ত্রণ। এ সম্পর্কে প্রায় সকল কথাই বলা হইয়াছে। যৌনব্যাধি ও তাহার প্রতিকার অধ্যায়টিও ভাল হইয়াছে। তবে যে সমস্ত ঔষধের কথা বলা হইয়াছে, তাহার উপকারিতা সম্বন্ধে আমার মত আনাড়ীর কোন জ্ঞান না থাকিবারই কথা। তবে এই অধ্যায়টিতে শীঘ্র স্খলন (Ejaculatio Præcox) সম্বন্ধে সতন্ত্রভাবে কোন কিছু বলা হয় নাই। সভ্য সমাজে শতকরা নব্বই জনই এই ব্যাধিগ্রস্ত। সভ্যতার ইতিহাসে ইহা একটী প্রকাণ্ড সমস্যা। তবে বাজীকরণ ঔষধী অণুঅধ্যায়ে ইহার উদ্দেশ্য কতকটা সিদ্ধ হইয়াছে। সর্ব্বশেষে যৌনসঙ্গম ও যৌনতৃপ্তি অধ্যায়। এই অধ্যায়টীও অন্যান্য বিষয়বস্তুর তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এই বিষয়টী কামশাস্ত্রের মুখ্য বিষয়। এই সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ স্ত্রী-পুরুষের জ্ঞাতব্য বস্তু অনেক আছে। যাঁহারা কৌতুহলী পাঠক তাঁহাদের জন্য দুই একটী গ্রন্থকারের বইয়ের নাম উল্লেখ করি। ডাঃ মেরী ষ্টোপস্-এর 'Married Love' ও "Enduring Passion" এবং Dr. Van-De-Valde-এর "Ideal Marriage" এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনতৃপ্তি' গ্রন্থখানা নূতন হাতের লেখা ও প্রবেশিকা পুস্তক মাত্র। তথাপি লেখকের লিপিচাতুর্য্য ও সংযম প্রশংসার বিষয়। পুস্তকখানির অভিজ্ঞ মহলে বহুল প্রচার আশা করি। ইতি—

৯ই পৌষ ১৩৪৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস।

# ভূমিকা : যৌন-প্রবৃত্তি ও সমাজ

যৌন-প্রবৃত্তিতে মানুষকে এখনও পশুর চেয়ে খুব বেশী উন্নত বলা যাইতে পারে না। যৌন এক অরাজক বৃত্তি, ইহা কেবলই বন্ধন ছিঁড়িতে চায়। দাম্পত্য-জীবনেও মনে-প্রাণে একনিষ্ঠ নর নারী জগতে খুব কমই মিলিবে।

যৌন-প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে, রক্ত-মাংসে গড়া প্রতি প্রাণী হইতে আরম্ভ করিয়া বুদ্ধিজীবী প্রতি নর নারীকেই ইহা পীড়ন করে। মানুষ যতই ধর্ম্মসাধনা করুক, যতই চিরকুমার সাজিয়া থাকুক, যত বড় চরিত্রবানই তিনি হউন না কেন, তথাপি তাহার মধ্যে এই বৃত্তি প্রবল হইবেই। এইজন্য হিন্দুর আরাধ্যা বাক্‌দেবী সরস্বতী মহাজ্ঞানী বেদব্যাসেরও চৈতন্য উৎপাদনের জন্য বলিয়াছিলেন: "বলবানিন্দ্রিয়গ্রামঃ বিদ্বাংসমপি কর্ষতি" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ এতই বলবান ও দুর্জ্জয় যে, উহারা অতি বড় পণ্ডিতকেও পীড়ন করে।

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে অদ্যাবধি মানুষের সমাজে জ্ঞাত সহজাত বৃত্তিগুলির মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তিই দুর্দ্দান্ত প্রবৃত্তি। বিপথে চালিত হইলে অন্য কোন প্রকার প্রবৃত্তি অপেক্ষা এই দুর্দ্দমনীয় যৌন-প্রবৃত্তি আমাদের ধ্বংস সাধন করিতে পারে। অথচ রক্ষণশীলদের গোড়ামীর ফলে মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনা করাটা আজিও অন্যায। নবীনদের যৌন শিক্ষা দিবার মত প্রশস্ত মন বর্ত্তমানের অনেক উচ্চশিক্ষিত আধুনিকদের মধ্যেও খুঁজিয়া মিলিবে না।

আজ যে দুইটী প্রবল সমস্যা বিশ্বসংসারকে আন্দোলিত করিতেছে, তাহার একটী অর্থনৈতিক আর অপরটী হইতেছে যৌন-সমস্যা,—এই দুইটী সমস্যার সমাধান খুজিতেই মানুষ আজ সামাজিক রীতি-নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত। পাশ্চাত্যের অন্যতম চিন্তাশীল মনীষী বার্টেণ্ড রাসেলও ঠিক এই কথাই তাঁর প্রসিদ্ধ "ম্যারেজ এ্যাণ্ড মরেল" গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন: **There are at the present day two influential school of thought, one of which derives everything from an economic source, while the other derives everything from a family or sexual source, the former school that of Marx, the latter that of Freud**

কার্ল মার্কস্ ও ফ্রয়েডই এই প্রবল দুইটী সমস্যাকে জগৎ সমক্ষে সর্ব্বপ্রথম দেখাইয়া দেন—মানুষের সকল অতৃপ্তির মূল কোথায়?

আমাদের সমাজ ব্যবস্থার বর্ত্তমান প্রচলিত ধারা অনুসারে যুবশক্তিকে আমরা যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ করিয়া রাখি, কোনপ্রকার যৌনশিক্ষা তাহাদের আমরা দেই না, অথচ যৌন-জ্ঞান ভিন্ন কোন শিক্ষাই সম্পূর্ণ নয়। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে ফ্রয়েড বলিয়াছেন : It conceals from them that part sexuality will play in their lives, and does not prepare then for the aggressions of which they are destined to become the objects. Sending the young out into life with such a false psychological orientation is as if one were to equip people going on a polar expedition with summerclothing and maps of the Italian lakes.

যৌন-অজ্ঞতার ফলে ছেলেমেয়েরা নানাপ্রকার সঙ্কটে জড়িত হইয়া পড়ে। যৌন-অজ্ঞতাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যৌনবিকারে পরিণত হয়। এ কথার সমর্থনে Rene' Guyon মহাশয়ও তাঁহার "সেক্স্ লাইফ এ্যাণ্ড সেক্স্ এথিক্স্" গ্রন্থে বলিতেছেন : Every educational system which definitely bans all sexual activity until a comparatively late age is a varitable hot-bed for the development of sexual neurosis.

কাজেই আমার বিবেচনায় যৌন বিষয়কে আবহাওয়ার কথার মত সাধারণ ও লঘু করিয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত এবং ইহার ফলে অজ্ঞতাজনিত বহু দুষ্কৃতির অবসান ঘটিবে। সমাজরীতির গোড়ামীতে যৌনশাস্ত্র সম্পর্কে বহু স্ত্রী-পুরুষই অজ্ঞতা বশতঃ ব্যাধিগ্রস্ত ও অভিশপ্ত জীবনকে বরণ করেন। অথচ আমাদের দেশে প্রাচীনকালে যৌন-শাস্ত্র শিক্ষা কোন নিন্দনীয় বা লজ্জাকর ব্যাপার ছিল না—তাহাতে শ্লীল অশ্লীলতার কোন প্রশ্নও উঠিত না।

সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ডাঃ ম্যাগনাস হাসফিল্ড একবার ভারত-ভ্রমণে আসিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন : 'সাধারণ লোক মনে করে যৌন-বিজ্ঞান আলোচনা পাপ ; উহা হইতে বিরত থাকাই 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধং' পুরুষের লক্ষণ কিন্তু প্রকৃত কথা ঠিক তার বিপরীত—যৌন-বিজ্ঞান না জানাই পাপ—মানসিক বিকারের লক্ষণ।' যৌন-বিজ্ঞানালোচনার বিষয়ে ডাঃ হার্সফিল্ড প্রাচীন ভারতবর্ষকে আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন তিনি বলিয়াছিলেন: 'প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে

যৌন-বিজ্ঞানের আলোচনা হইত ও কাম-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্' আজিও বর্ত্তমান আছে ; কিন্তু অন্যগুলি প্রায় লুপ্ত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা যৌন-বিজ্ঞানকে পাপ মনে করিয়া উহার আলোচনায় লজ্জাবোধ করিতেন না।'

প্রাচীনকালে ভারতের আদর্শ এমন ছিল যে, কাম-শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অভ্যাস না করিলে তাহার বিদ্যাশিক্ষাই অপূর্ণ থাকিত। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় মহাজ্ঞানীও এই শাস্ত্র অধ্যয়ন না করিবার ফলে তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। আজন্ম সংযমী চিরকুমার আচার্য্য শঙ্কর যখন তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অঙ্গীকার অনুযায়ী তাঁহাকে দাসত্ব গ্রহণে আহ্বান করেন, তখন তৎপত্নী উভয়ভারতী শঙ্করকে উদ্দেশ করিয়া বলেন : শঙ্করাচার্য্য পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রের একাঙ্গকে মাত্র পরাজিত করিয়াছেন সুতরাং তাঁহাকে পূর্ণ পরাজয় করিতে এখনও পারেন নাই ; এখনও তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গকে ( পত্নীকে ) তর্কে পরাজিত করিতে বাকী আছে।

শঙ্কর সেকথা স্বীকার করেন। ফলে শঙ্কর ও উভয়ভারতীর মধ্যে পুনরায় বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ হয়। উভয়ভারতী শঙ্করকে চৌষট্টি কামকলা সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। কিন্তু আকুমার ব্রহ্মচারি শঙ্কর তার কোন কলাই পরিজ্ঞাত নহেন। উভয়ভারতী তাঁহার প্রশ্নের উত্তর না পাইয়া মন্তব্য করেন : বিদ্যার একাঙ্গ কামশাস্ত্র যে অধ্যয়ন ও অভ্যাস করে নাই, তাঁহার বিদ্যা সম্পূর্ণ হয় নাই। শঙ্কর বাধ্য হইয়া পরাজয় স্বীকার করেন। তারপর শঙ্কর যোগবলে এক মৃতরাজার দেহে প্রবেশ করিয়া ব্যবহারিক কামকলা শিক্ষা করেন ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্' পাঠে এই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন।

ইতিহাসের এই একটীমাত্র উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝা যাইবে যে, প্রাচীন ভারতে কামচর্চ্চা কোন অনাদরের বস্তু ছিল না। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ মন্তব্য করিয়াছেন : Man is born of passion—কাম হইতেই মানুষ উৎপন্ন হয়। সৃষ্টিপ্রবাহ সচল রাখিবার মূলে যাহার অপরিহার্য্য প্রয়োজন, সেই প্রবলতর কাম সম্পর্কে জ্ঞানার্জ্জন করাটা অশ্লীলতার অজুহাতে অবজ্ঞা করা চলে না। তাই প্রাচীন ভারতের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণও তাহা করেন নাই। তাঁহারা সাহিত্যের সকল রসের মধ্যে আদি রসকেই প্রধান করিয়াছেন। এই আদিরসকে আশ্রয় করিয়াই জগতের বহু বড় বড় সৃষ্টিকলা সম্ভব হইয়াছে—অনেক মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। আমাদের শাস্ত্র, পুরাণ,

ইতিহাস, নাটক প্রভৃতির মধ্যে দিয়া ইহার আলোচনার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। বাল্মিকী, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি, ভারবী, মাঘ প্রভৃতি সাহিত্যাচার্য্যগণের রচনায় এ রসের প্রাদুর্ভাব কতখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে তাহা প্রাচীন সাহিত্যরসিক পাঠকমাত্রেই জানেন।

আমাদের ধর্ম্মের অঙ্গ হিসাবেও কামকলা চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছে। লিঙ্গ ও যোনীপিঠ সৃষ্টির মূলে কি সৃষ্টির মূলাধার কাম-ই পূজিত হইতেছে না?

এ যুগে ধর্ম্ম ও সকল বিদ্যারই অপব্যবহারের ফলে কোন গুরুই কামশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন না, তাই কামশাস্ত্রের সুপণ্ডিত অধ্যাপকও আজ খুঁজিয়া মিলিবে না। সমাজের অযথা গোড়ামীর ফলেই না আজ সেই সকল কামশাস্ত্র-গ্রন্থগুলিও লুপ্ত হইয়াছে। ভারতের আর্য্য-সভ্যতার আদিম প্রভাতে শ্বেতকেতুর মত সমাজতত্ত্ববিদ্ ও যৌন কলাবিদ্ ঋষি, যিনি নর-নারীর মিলন আদর্শকে জগতে বরণীয় করিয়া গিয়াছেন,—নারীকে দিয়াছেন অপরূপ মর্য্যাদা ও তাঁর ললাটে অঙ্কন করিয়াছেন সতীত্বের জয়টীকা, তেমনি ঋষি, তেমনি মনীষী এ যুগে জন্মায় কৈ? অথর্ব্ব-বেদের অন্যতম মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি পাঞ্চালরাজ বাভ্রব্য, চারায়ণ, দীর্ঘতমা, সুবর্ণাভ, ঘোটকমুখ, গোনর্দ্দীয়, গোনিকাপুত্র, দত্তক, কচুমার প্রমুখ ঋষিগণ যৌনশাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের ভাবধারা গ্রহণ করিয়া ও বাভ্রব্যের সঙ্কলিত গ্রন্থের উপর অধিক পরিমাণে নির্ভর করিয়া মহর্ষি বাৎসায়ন তাঁহার "কাম-সূত্রম্" নামক জগৎপ্রসিদ্ধ যৌন-গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন মনীষীগণের মতে: কাম মীমাংসায় মানুষ শিক্ষিত হইলে ধর্ম্মে, অর্থে ও কাম চরিতার্থতায় সাফল্যলাভ করিতে ও ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখে সুখী হইয়া অন্তে অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

মহর্ষি বাৎসায়ন বলিয়াছেন: কাম শরীরকে রক্ষা করে, ধারণ করে, উহা ধর্ম্ম ও অর্থের ফল স্বরূপ। বস্তুতঃ আহারে সংযম অভ্যাস না করিলে যেমন অজীর্ণ, অম্ল প্রভৃতি পীড়ায় আক্রান্ত হইতে হয়, তেমনি কামক্রীড়ায় সংযম অভ্যাস না করিলে ও ত্রিকালজ্ঞ ঋষি নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন না করিলে অকালে জরাগ্রস্ত ও ভীষণ রোগাক্রান্ত হইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হয়।

এই সম্পর্কে ইয়োরোপের অন্যতম দার্শনিক বালজাক্ বলিয়াছেন: "যৌন-সঙ্গমও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার" এবং এই বিজ্ঞানকে না জানার দরুণ কত কত জীবনই না

ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠিতেছে! কত অসুখী স্বামী-স্ত্রী'ই না ইহার জন্য চরম দুঃখময় জীবনকে বরণ করিয়া লইতেছেন।

সমাজে যৌন শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় যৌন-ক্ষুধা বিপথে ধাবিত হইয়া উহার তৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়ায়। বালক ক্রমশঃ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যখন তাহার মনে যৌন-ইচ্ছার উদ্ভব হয়, তখন সে ইচ্ছার স্বাভাবিক তৃপ্তির কোন উপায় না দেখিয়া পানিমৈথুন করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে তাহার যৌন-ইচ্ছা অনেকটা তৃপ্তিলাভ করে; পরে সে পত্রিকায় ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখিয়া ও ব্রহ্মচর্য্য সম্পর্কে অস্বাভাবিক কঠোরতাপূর্ণ পুস্তক পড়িয়া হঠাৎ পানিমিথুন বন্ধ করিয়া দেয়। তখন উৎকণ্ঠা রোগ তাহার মনে আসিয়া বাসা বাঁধে এবং উহার ফলে যুবশক্তি উদ্বোধনের প্রথম উষায়ই বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহার যৌবনকুসুম ঠিক মত দল মেলিতে পারে না। অনেকের হয়ত সেই কীটদ্রংষ্ট্র কুসুমের ন্যায় জীবন, বিবাহের ভিতর দিয়া অসুখী জীবনের খাঁদে পড়ে—তখন তিক্ত ঔষধ গিলিবার মত পরম মধুর দাম্পত্য-জীবনও চরম বিষাদের বস্তু হইয়া উঠে

যৌন-শিক্ষা না পাইবার ফলে যৌনবিকার ও মানসিক উৎকণ্ঠা ধীরে ধীরে অনেকের মধ্যেই সংক্রামিত হইয়া সমাজদেহে বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করিতেছে।

অনেক বিবাহিত-জীবনে দেখা যায়, অতৃপ্ত সহবাসের দরুণ স্বামী ভীষণ উৎকণ্ঠা রোগে ভুগিতেছেন; অনেক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এই রোগে আক্রান্ত হন। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে: 'বিয়ে হলেই পুত্রকন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা'— এ কথাটা যে বাঙ্গালী জীবনে খুবই সত্য কথা, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেক সংসারে মা ষষ্ঠীর এত বেশী কৃপা বর্ষে যে, স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই দম আটকাইবার উপক্রম হয়। সুতরাং অনেক ক্ষেত্রে তাহারা বাধ্য হইয়া গর্ভনিরোধের প্রণালীর বিষয় চিন্তা করেন। এ ক্ষেত্রেও যৌন-অজ্ঞতা ভীষণ বাধার সৃষ্টি করে। পাছে এই দুষ্কার্য্যের জন্য ভগবান লাঠী লইয়া তাড়া করেন, গর্ভনিরোধের বিরুদ্ধে এও একটা প্রধান যুক্তি! ইহাকে সাধু ভাষায় অস্বাভাবিকতা বলা হয়। অনেকে স্বাভাবিক অর্থে বনে জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুকে যাহা করিয়া থাকে তাহাই স্বাভাবিক, বাকী সবই অস্বাভাবিক বুঝিয়া থাকেন! কাজেই দেখা যায় ধর্ম্মের সহিত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ জড়িত বলিয়া পাদ্রী ধর্ম্মযাজক ও ব্রাহ্মণপণ্ডিত অথবা ঐ শ্রেণীর 'ধার্ম্মিক' লোকেরাই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বেশী আন্দোলন করিয়াছেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ এক সময়ে মরা কাঁটা ছেঁড়া করিয়া 'এনাটমী' শিক্ষা

করাও অশাস্ত্রীয় ও অধর্ম্মের ব্যাপার ছিল। বসন্ত রোগে ঔষধ খাওয়াইতে অনেক লোক এখনও আপত্তি তুলিয়া থাকেন, কারণ বসন্ত "শীতলা মায়ের দয়া"—ঔষধ খাইলে মা শীতলা চটিতে পারেন।

এই ভয় ও বিশ্বাসের জন্য সাধারণ লোকে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কেও বৈজ্ঞানিকভাবে অনুসন্ধান করিতে পারেন না। অনেকেই গোপনে নিজের বুদ্ধি খরচ করিয়া যাহা সুবিধা বলিয়া মনে করেন, উহার জন্য সেই উপায়ই অবলম্বন করেন। জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মতে জন্ম-নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় ব্রহ্মচর্য্য পালন। কিন্তু সুস্থ বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের কাছে তথাকথিত ব্রহ্মচর্য্য বা কঠোর ইন্দ্রিয়দমন নীতি সম্পর্কে মোটা মোটা বই বা লম্বা বক্তৃতা খুব কাজে আসে না। বহু সন্তানের পিতা বৃদ্ধের দ্বারা লিখিত এইসব উপদেশে কান না দেওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের নিকট হবিষ্যান্ন ও উপবাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আজ পর্য্যন্তও কোন ফল পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক এই সব গোড়ামীর ফলে যৌন সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়েরই মত জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রকাশ্য আলোচনা ও উপযুক্ত প্রক্রিয়া জানা অধর্ম্ম বলিয়া লোকে আনাড়ীর ন্যায় এই জটিল ব্যাপার সমাধানের চেষ্টা পায়; তাহার ফল অনেক সময়ই খারাপ হয়।

জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রণালী সমূহের মধ্যে withdrawal বা সহবাস-বিরতি বলিয়া যে প্রথা আছে তাহা এইরূপ: সঙ্গম সময়ে রেতঃস্খলনের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে স্ত্রী-অঙ্গ হইতে পুং-জননেন্দ্রিয় খুলিয়া ফেলা। ইহাতে স্ত্রী-অঙ্গ মধ্যে রেতঃপাত না হইয়া বাহিরে রেতঃপাত ঘটিয়া থাকে। জন্ম-নিয়ন্ত্রণের এই প্রক্রিয়া অনেককাল অবলম্বন করার ফলে স্বামী স্ত্রী উভয়েরই মনে অতৃপ্ত ইচ্ছা ধীরে ধীরে জমা হইতে থাকে এবং ইহার ফলে একদিন স্বামী অথবা স্ত্রী অনেক সময় উভয়েই দারুণ উৎকণ্ঠা রোগে আক্রান্ত হয়। পরিণামে ইহা হইতে সাধারণ স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও নারীগণ অনেক সময় ইহা হইতে স্নায়ুরোগগ্রস্তা অথবা হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্তা হইয়া থাকে।

যৌন-অজ্ঞতার ফলে অনেক পুরুষের এমন অবস্থা ঘটে যে, তাহারা নারীকে দেখিয়া দস্তুরমত ভয় পান ও এই ভয়ের জন্য অনেক সময় তাহাদের নপুংসকত্ব ঘটে। তবে ইহা সাধারণতঃ ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার,—নারীর সহিত খানিকটা পরিচিত হইলে ও নারীর প্রতি ভালবাসার আকর্ষণ আসিলে ইহা সহজেই কাটিয়া যাইতে পারে। মেয়েদের মধ্যেও এইরূপ পুরুষ-ভীতি বা স্বামী-ভীতি আসিয়া দেখা দেয়,—ইহাও একশ্রেণীর উৎকণ্ঠা

রোগের পর্য্যায়ভুক্ত। কিন্তু তাহাদের এই পীড়া সাধারণতঃ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। মেয়েদের এইরূপ পীড়াক্রান্ত হওয়ারও মূলে রহিয়াছে যৌন-অজ্ঞতা।

নব-পরিণীতা বধূর যৌন সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান খুব কমই থাকে—অনেক ক্ষেত্রে সে একেবারেই অজ্ঞ। সে বেচারী হয়ত একটু আধটু প্রেমের বুলি শিখিয়াছে। মনে মনে সে স্বপ্নে বিভোর হইয়া আছে: রূপবান কিশোর রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া কবে তাহাকে চুরি করিয়া মেঘের ভিতর দিয়া লইয়া গিয়া বনের মধ্যে সারাহ্ণে নীরব শিবমন্দিরে দেবতার সম্মুখে তাহার গলায় মালা পরাইয়া দিবে; কিন্তু বাস্তবের কঠিন সংঘাতে সে হঠাৎ একদিন দেখিতে পায়, পাঞ্জাবীপরা অতি সাধারণ গোছের একটী রোগা পটকা ছোকড়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়া গেল। কল্পনার স্বর্ণময় মেঘলোকের পরিবর্ত্তে তাহার জুটিল হয়ত একটী স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার ঘর। তাহার উপর স্বামী-প্রেমের বাস্তব দিকটার সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না। এসব কথা তাহার পঠিত কেতাবে লেখে না, বাপ-মা শিখায় না, বিবাহিত সখীরা শুধু মুচকি হাসিয়া একটু ইসারা প্রকাশ করে মাত্র। সুতরাং সে শিখিবে কোথায়? কাজেই সে ইহার জন্ম প্রস্তুত থাকে না মোটেই। হঠাৎ প্রথম রজনীর স্বামী-সহবাস তাহার নিকট ঘৃণার বস্তু ও কষ্টদায়ক হইয়া পড়ে। মানসিক দিকটা ছাড়িয়া দিলেও শারীরিক দিক হইতেও এরূপ অবস্থা সৃষ্টির একটা কারণ থাকে। সাধারণতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কুমারী কন্যার যোনীদ্বার সতীচ্ছদ (Hymen) নামক একটী ঝিল্লীর মত পর্দ্দায় ঢাকা থাকে। প্রথম স্বামী-সহবাসের সঙ্গে সঙ্গে উহা ছিন্ন হইয়া যায় এবং সারিতে কিছুটা সময় লাগে। এ সময় যোনীদেশেও খানিকটা বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে। কাজেই বিবাহের পর কিছুদিন স্বামী-সহবাস করাটা বেচারীর নিকট একটা যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার। ইহারই ফলে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক হইতে স্বামী তাহার ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়ায়। সে স্বামীর নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেই যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে। স্বামীর নিকট যাইতেই সে উৎকণ্ঠায় ও ভয়ে অস্থির হইয়া পড়ে, এই কারণে অনেকে শ্বশুরবাড়ী যাইতেও অস্বীকৃতা হন, স্বামী তাহার নিকটে আসিলেই তাহার ফিট্ হইতে আরম্ভ হয়। অনেক সময়ই যৌন-অজ্ঞতা বশতঃ এই শ্রেণীর মেয়েদের 'হুড়কো' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী যদি বুদ্ধিমান, ধীর প্রকৃতির ও যৌনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া থাকিতেন তবে সতীচ্ছদ ছিন্ন ব্যাপারটা একটা আনন্দের ভিতর দিয়াই

সুসমাপ্ত হইতে পারিত এবং ঐ শারীরিক কষ্টটুকু নববধূ হাসিমুখেই সহ্য করিয়া লইতেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতে আমি যৌন বিষয়ে মোটামুটিভাবে জ্ঞানলাভ করিবার পক্ষে জগতের বহু যৌনতত্ত্ববিদের গ্রন্থাদি ও মতবাদ আলোচনা করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাও উহার সঙ্গেই মিশিয়া রহিয়াছে। 'জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও উহার প্রক্রিয়া' অধ্যায়ের আলোচনার দিকটা মদীয় সম্পাদিত 'পথিক' নামক মাসিকে ধারাবাহিক যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হইয়াছিল উহারই অংশ বিশেষ। শ্রীমেঘনাথ শর্ম্মা ছদ্মনামে আমি উহা লিখিয়াছিলাম। 'যৌনব্যাধি ও তাহার প্রতিকার' অধ্যায়ের রচনা সমূহ ইতিপূর্ব্বে 'হ্যানিম্যান' নামক সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক মাসিকের কয়েকটী সংখ্যায় স্বনামেই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই চিকিৎসাধ্যায়ে আমি রমণীগণের বিবিধ ঋতুসংক্রান্ত পীড়া ও গণোরিয়া, সিফিলিস এবং আরো আরো যৌনব্যাধি সম্পর্কে রচনাসমূহ লিপিবদ্ধ করিব বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলাম এবং এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপিতও হইয়াছিল; কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে পুস্তক মুদ্রণকার্য্যে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলাম, ইহাতে পুস্তকের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ করিতে হয়, কাজেই বাধ্য হইয়া আমাকে উহা বর্জ্জন করিতে হইল। ঐ সকল ব্যাধি ও অন্যান্য যৌনব্যাধিসকল লইয়া একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিতেই মানসী হইয়াছি। 'যৌন-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য' অধ্যায়টী মাসিক 'শান্তি'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া 'শান্তি'তে 'ডেয়ার' ছদ্মনামে এই পুস্তকে প্রকাশিত আমার আরও দুই একটা রচনা প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থ রচনায় সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত অনেক রচনা হইতেও আমি অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছি ও মতামতও উদ্ধৃত করিয়াছি--অনেকের নাম প্রকাশ করিতেও পারি নাই। তাহা ছাড়া পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যৌনতাত্ত্বিকগণের অনেকানেক গ্রন্থ আমার এই গ্রন্থ রচনার মূলে প্রেরণা যোগাইয়াছে; অনেক চিকিৎসা-গ্রন্থ, শাস্ত্র ও ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ইতিহাসের সহায়তা লইয়াছি। একসঙ্গে আমি উক্ত গ্রন্থ সমূহের লেখক ও প্রকাশকগণের নিকট ঋণ স্বীকার করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

বন্ধুবর ডাঃ হরিনাথ দে এম-এস-সি, পি-এইচ্-ডি., ইহার পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে কয়েকটী বিষয়ে পরামর্শ দিয়াছেন ও তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে কোন কোন বিষয় সংযোজন ও বর্জ্জন করিয়াছি। উকিল শ্রীযুক্ত জগন্নাথ সাহা বি-এল মহাশয় এই পুস্তকের

পাণ্ডুলিপিখানি পাঠ করিয়া আইনসঙ্গত ব্যাপারগুলি সম্পর্কে আমাকে শোধরাইয়া দিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীপবিত্রকুমার রায় চৌধুরী পুস্তকের প্রুফাদি সংশোধন কার্য্যে আমায় অনেকখানি সাহায্য করিয়াছেন। ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, ব্যাঙ্কার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, সুহৃদবর শ্রীতারকনাথ দাস মহাশয় এই পুস্তক প্রকাশে আমায় যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহে আজ ইহা পুস্তকাকারে রূপ পরিগ্রহ করিল। এইজন্য এই সঙ্গে তাঁহাদেরও ধন্যবাদ জ্ঞাপন না করিয়া পারিলাম না।

সর্ব্বশেষে আমি সকৃতজ্ঞচিত্তে ও আনন্দ সহকারে জানাইতেছি যে, দর্শন, মনোস্তত্ত্ব ও যৌনবিজ্ঞানে সুপণ্ডিত, ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার, শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র দাস মহাশয় এই পুস্তকের মুখবন্ধটি লিখিয়া দিয়া আমায় চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন এবং ইহার জন্য পুস্তকের মর্য্যাদা যে অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেকথা বলাই বাহুল্য মনে করি।

শ্রীরমেন্দ্রনাথ দে।

# সূচীপত্র


| বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১। | মুখবন্ধ: শ্রীযোগেশচন্দ্র দাস ... | ১— ৬ |
| ২। | ভূমিকা: যৌনপ্রবৃত্তি ও সমাজ ... | ৭—১৬ |
| ৩। | প্রথম অধ্যায়: সহজাত প্রবৃত্তি : : যৌন চেতনার বিকাশ : : নর ও নারীর প্রভেদ : : সৃষ্টিকার্য্যে নর ও নারী : : প্রেম, কাম ও বিবাহ : : প্রেমের ক্ষেত্রে নর ও নারীর প্রভেদ : : দাম্পত্য-জীবনে আধুনিক সমস্যা ও নারী-প্রগতি : : অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি ... ... ... | ১৭— ৭৪ |
| ৪। | দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রাচীন সমাজচিত্র ও যৌন ইতিহাস :— প্যালেষ্টাইন, মিশর, ব্যাবিলোন, সিরিয়া, ফিনিসিয়া, পারস্য, গ্রীস, রোম, ভারতবর্ষ | ৭৪—১৫২ |
| ৫। | তৃতীয় অধ্যায়: যৌন-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য :— ব্রহ্মচর্য্য ও পানিমৈথুন : : বাল্যজীবনে পালনীয় : : বিবাহিত জীবনের আদর্শ ... ... | ১৫৩—১৬৬ |
| ৬। | চতুর্থ অধ্যায়: যৌনযন্ত্র ও তাহার কার্য্যাবলী :— পুং-জননেন্দ্রিয় : : স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় : : প্রজনন রীতি ... ... ... | ১৬৭—১৮৩ |
| ৭। | পঞ্চম অধ্যায়: জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও তাহার প্রক্রিয়া :— জন্ম-শাসন কেন প্রয়োজন : : গর্ভ-নিরোধক প্রক্রিয়া সমূহ ... ... | ১৮৪—২১০ |
| ৮। | ষষ্ঠ অধ্যায়: যৌনব্যাধি ও তাহার প্রতিকার :— শুক্রমেহ, শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য : : পানিমৈথুন বা মাষ্টার্বেশন : : স্বপ্নদোষ বা নাইট্ পলিউসন : : পুরুষত্বহানি : : প্রিয়েপিজম বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস : : প্রবল সঙ্গমেচ্ছা : : সঙ্গমে বিতৃষ্ণা : : ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পোটেন্সী : : বাজীকরণ ঔষধী ... | ২১১—২৩১ |
| ৯। | সপ্তম অধ্যায়: যৌনসঙ্গম ও যৌনতৃপ্তি ... | ২৩২—২৪০ |

# যৌনপ্রবৃত্তি ও যৌনতৃপ্তি

## প্রথম অধ্যায়

### সহজাত প্রবৃত্তি :

পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণী-জগৎ সম্বন্ধেই আলোচনা করিলে দেখা যায়, প্রত্যেকেরই একটা নিজ নিজ সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) আছে যাহা তার সকল কর্ম্মধারা ও জীবনকে পরিচালিত করে। এই যে সহজাত বা বংশগত স্বতঃস্ফূর্ত্ত বুদ্ধি ও চেতনা—মনোবিজ্ঞানবিদেরা তাহার নাম দিয়াছেন traditional consciousness বা জাতিগত চেতনা। যেরূপ পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার মধ্যে যে প্রাণীকে জীবনধারণ করিতে হয়, জীবন-সংগ্রামে যুঝিবার জন্য সেই প্রাণীকে প্রকৃতি তেমনি দৈহিক অবয়বও প্রদান করিয়াছে।

মানুষেরও যাবতীয় কর্ম্মকে অনুপ্রাণিত করে তাহার সহজাত প্রবৃত্তি ও বিচারবুদ্ধি (reason)। সহজাত প্রবৃত্তি সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই অন্যান্য প্রাণীদের মত মানব-চরিত্রেও প্রোথিত হইয়া আছে। এই সহজাত প্রবৃত্তিই মানুষের কর্ম্ম ও প্রকৃতির আদি প্রেরণা। কিন্তু বিচারবুদ্ধির উদ্ভব হইয়াছে মানুষের জ্ঞান ও ভাববিকাশের সঙ্গে সঙ্গে।

সহজাত প্রবৃত্তি প্রত্যেক প্রাণীরই অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী। কিন্তু প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকে, তাহার উৎপত্তির কারণ দুইটী : (১) বংশানুগত কর্ম্মধারা ও (২) দৈহিক গঠন।

প্রথমটী অর্থাৎ বংশানুগত কর্ম্মধারা—আদি সৃষ্টিকাল হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া যে প্রাণী যে যে বিশেষ কর্ম্ম করে, তাহা পুনঃ পুনঃ কোটী কোটীবার সেই প্রাণীর মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবার ফলে ঐ কর্ম্মের একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত বুদ্ধি তাহার চেতনরাজ্যে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই মিশিয়া থাকে। তাহার এই জাতিগত চেতনাকেই সাইকোএনালিষ্টগণ বলিয়া থাকেন traditional consciousness.

দ্বিতীয়তঃ দৈহিক গঠন। যে প্রাণীকে যেরূপ পারিপার্শ্বিক আব-হাওয়ার মধ্যে জীবনযাপন করিতে হয়, প্রকৃতি তাহার সেইরূপ দেহ ও প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গড়িয়া তুলিয়াছে। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে সেই প্রাণীর সেই সব বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে এবং যুগ যুগান্তকাল তাহা ব্যবহারের ফলে একটা সহজাত প্রবৃত্তি সেই প্রাণীর মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। কোন কোন প্রাণীর সেই সহজাত কতকগুলি প্রবৃত্তি তাহার বর্ত্তমান জীবনযাত্রা পথে প্রয়োজন না হইলেও তাহা হইতে সে বিরত হইতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ ইঁদুরের কাঠ, কাপড় প্রভৃতি শুধু শুধু কুচি কুচি করিয়া কাটা, গণ্ডারের শিং দিয়া কাদা ঘাঁটা, বিড়ালের নখ দিয়া মাটী আঁচড়ানো প্রভৃতি কার্য্য তাহাদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও উহা না করিলে তাহারা সুস্থবোধ করে না। এ সকল হইল প্রাণীর জাতিগত সহজাত প্রবৃত্তির কথা। কিন্তু এমন কয়টী প্রবৃত্তি আছে যাহা প্রত্যেক প্রাণী-জগতেই বিদ্যমান এবং এইগুলিকে শুধু প্রবৃত্তি বলিলেও ভুল করা হইবে—এইগুলি মূলতঃ প্রকৃতির বিধানানুসারে প্রত্যেক প্রাণীরই প্রয়োজনীয়। যথা: পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা কিংবা মানুষ—জীব-জগতের সর্ব্বত্র পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীরই মুখ্য উদ্দেশ্য সন্তানোৎপাদন করা। কারণ সৃষ্টিপ্রবাহ সচল না থাকিলে সৃষ্টি লোপ পাইতে বেশীদিন লাগিত না।

মানুষের দিকে দেখিতে গেলেও ইহার কোন ব্যতিক্রম নাই ; কিন্তু নারী ও পুরুষের এই সহজাত প্রবৃত্তি একই উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন। সৃষ্টি-কার্য্যে নারী ও পুরুষের মধ্যে যে দুইটী দুর্ব্বার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, তাহার একটী হইতেছে যৌন-আকর্ষণ ও অপরটী দৈহিক-ক্ষুধা। অন্য একটী শক্তিশালী প্রবৃত্তি হইতেছে পেটের ক্ষুধা ও তাহার তৃপ্তিসাধন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, অন্নের ক্ষুধা এবং যৌন ক্ষুধাই মানবের সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী প্রেরণা।

## যৌন চেতনার বিকাশ ঃ

মনোস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ ফ্রয়েডের থিওরী অনুসারে দেখা যায় ঃ মানবশিশু যখন শয্যায় মলমূত্র ত্যাগ করে এবং মাতৃস্তন্য পান করে তখনও স্তনবৃন্ত দংশনের মুখে তাহার যৌন-বোধের উন্মেষ হয়। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর তাহার প্রথম যৌনানুভূতি হয় ওষ্ঠ ও মাড়িতে এবং এই অনুভূতি তখন সুপ্ত অবস্থায় থাকে। তখন তাহা শিশুর জননযন্ত্রে বা গুহ্যপ্রদেশে সংক্রামিত হয়না—ইহা তখন শরীরের অন্যান্য অংশে হস্তপদাদিতে সংক্রামিত হইয়া থাকে এবং এইজন্যই শিশু অতিরিক্ত হস্তপদ সঞ্চালনের দ্বারা সেই যৌনানুভূতিরই আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। শিশুজীবন সম্পর্কে ডাঃ ফ্রয়েডের এই থিওরীর অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনাও অনেক বৈজ্ঞানিক করিয়াছেন। আমার মতও অনেকটা সেইরূপ। কারণ অতি শিশুকালের এই সকল চাঞ্চল্যকে যৌনতার রূপ দেওয়া ব্যাপারটা আগাগোড়াই অনুমান মাত্র। এ অনুমান স্বতঃসিদ্ধ একথা জোর করিয়া বলা চলে না।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত এ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, ৩।৪ বৎসর বয়স হইতেই অনেক বালক-বালিকা পানিমেহন করিয়া থাকে।

আমাদের ভারতে যৌনশাস্ত্রের কোন পণ্ডিতই কিন্তু অতি শিশুর যৌনচেতনা লাভের কথা কোথাও বলেন নাই। মহর্ষি বাৎসায়ন তাঁহার প্রামাণ্য গ্রন্থ 'কামসূত্রম্'-এ বালক-বালিকা ও কিশোর-কিশোরীর যৌন-বোধের বিকাশ লক্ষ্য করিয়াছেন বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ন্যায় অত অল্প বয়সে নহে। বাৎসায়ন বালক-বালিকা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে স্বমেহন, সমকাম, পশুমেহন প্রভৃতিও লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তথাপি অতিক্ষুদ্র মানবশিশুর যৌনবোধ সম্পর্কে কোন অভিমত ব্যক্ত করেন নাই।

পাশ্চাত্য যৌনতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডাঃ রোবি, হ্যামিলটন, ডাঃ ফ্রয়েড, ক্রাফ্‌ট্‌ এ্যাবিং, অস্কার ফিশ্চার প্রভৃতি অনেকেই অতিশিশু হইতে ৫।৬, ৮।৯ বৎসরের বালক-বালিকাদের মধ্যে যৌনবোধ ও যৌনচেতনার বিকাশ সম্পর্কে অনেক প্রমাণসিদ্ধ মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে একথাও ঠিক, পাশ্চাত্য দেশেও যে অধিকাংশ শিশু বা বালক-বালিকাই অতি শৈশবে যৌনচেতনা লাভ করিয়া তাহার তৃপ্তি খোঁজে তাহা তাঁহারাও বলেন নাই।

হ্যামিলটন সাহেব অতি শৈশবকাল হইতেই শিশুদের বাহ্যে প্রস্রাব ত্যাগকালীন যৌন-আনন্দ অনুভব করিবার কথা বলিয়াছেন। ইহার প্রমাণ আমরাও বালকদের ক্ষেত্রে পাইয়া থাকি বটে, কিন্তু তাহারা তৎকালে প্রকৃতপক্ষে যৌন আনন্দ লাভ করে কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ বাহ্যে প্রস্রাব ত্যাগকালীন আপনা হইতে যৌন-ইন্দ্রিয় উচ্ছ্রিত হয়, তাহাতে তাহাদের মনে আনন্দসঞ্চার হইতে দেখা যায় কি? আর বালিকাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে কোন চাক্ষুষ প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না।

আমেরিকান যৌন-বৈজ্ঞানিক বোরি সাহেব বহু গবেষণার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, আট বছর বয়ঃক্রমের পূর্ব্বেই স্বতঃপ্রবৃত্তি

বশতঃ অথবা পানিমৈথুনের দ্বারা কোনপ্রকার যৌন উত্তেজনা অনুভব না করিয়াছেন এমন পুরুষ বা নারী তাঁহার চোখে পড়ে নাই।

ঐ সকল অভিমতকে আমি তাঁহাদের দেশ সম্পর্কেই ধরিয়া লইব, উহা সকল জাতির উপর প্রযোজ্য নহে। আর পৃথিবীর সকল দেশের সকল মানুষের যৌনচেতনার বিকাশ কখনও একই রকম বয়সে বা কোন ধরাবাধা নিয়মে কখনই ঘটে না। দেশ কাল ভেদে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী ইহার মধ্যে অনেক প্রকার ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। ইহা ছাড়া বংশানুক্রেমিক প্রভাবও অনেক ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে, অনেক বনবাসী মানুষের সমাজে শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতেই যৌনজীবনে পরিপক্কতা লাভ করিয়া থাকে। মলি-নোউস্কি সাহেব 'সেক্সুয়েল লাইফ অব স্যাভেজেস্' গ্রন্থে নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ অনেক দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন: নিউ গুয়েনা দ্বীপের অন্তর্গত ট্র্যাম্বিয়াণ্ডা দ্বীপবাসী লোকেরা শিশুদের সমক্ষেই নিঃসঙ্কোচচিত্তে স্বাভাবিকরূপেই যৌনক্রিয়া সম্পাদন ও যৌন-বিষয়ক আলাপ আলোচনাদি করিয়া থাকে। সেখানকার বালিকাদের পুংজননেন্দ্রিয় সম্পর্কেও কোনপ্রকার কৌতুহল নাই, কারণ তাহারা পিতা ও অন্যান্য পুরুষদের হামেসাই তাহাদের চক্ষের সমক্ষে উলঙ্গ হইয়া মৎস্য-শিকার করিতে দেখিয়া থাকে। ইহাতে পুংজননযন্ত্র সম্পর্কে তাহাদের কৌতুহল দমিত হইয়া যায়। অতি অল্প বয়স হইতেই এদেশের বালক-বালিকাগণ যৌন-উপদেশ লাভ করতঃ যৌন-সম্পর্কীয় নানারূপ ক্রীড়া-কৌতুকে মত্ত হয়। অবশ্যই এসময় হস্ত ও মুখই তাহাদের এই কার্য্যের প্রধান সহায়ক হইয়া থাকে বটে; কিন্তু ৫।৬ বছর বয়স হইতে ইহারা প্রকৃত যৌনকার্য্যেও সাড়া দেয়। তখন তাহারা ইহাকে এক প্রকার খেলার বস্তু হিসাবে মনে স্থান দিলেও আট বছর বয়সের মধ্যে প্রায় সমস্ত বালিকারই প্রকৃত যৌনজীবনের ভিত্তি

স্থাপিত হইয়া যায়। তবে এ দেশের বালকদের প্রকৃত যৌনজীবন সুরু হয় আরও একটু বেশী বয়সে অর্থাৎ সাধারণতঃ ১০ হইতে ১২ বৎসরের মধ্যেই। অতি শৈশব হইতেই যে এ দেশের বালক-বালিকারা নানারূপ যৌন-বিষয়ক খেলায় মাতে তাহাতে কাহাকেও কোন আপত্তি করিতে দেখা যায় না।

মার্গারেট মিড্-এর সামোয়া দেশ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থপাঠে জানা যায়ঃ সে দেশের বালক-বালিকাগণেরও অতি শৈশবেই যৌন-উন্মেষ দেখা দেয় ও যৌনজ্ঞান লাভ করে। যদিও সেখানে ছেলে ও মেয়েরা দূরে দূরে অবস্থান করে তথাপি তাহাদের নিকট যৌন ব্যাপারটা কোন অপরিজ্ঞাত বিষয় নহে। অতি বাল্য বয়সেই সেখানকার বালক-বালিকারা এ বিষয়ে সকল রকম পটুতা লাভ করে। ৬।৭ বছর বয়স হইতেই সে দেশের বালিকাগণ পানিমেহন সুরু করে, আর বালকেরা দলবদ্ধ অবস্থায়ও ঐ কার্য্য ও সমমেহন কার্য্যাদি লোক সমক্ষে সম্পন্ন করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

আবার কোন কোন বন্যজাতিদের মধ্যে ইহার ব্যতিক্রম এবং সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। এড্মিরালিটী আয়ল্যাণ্ডের লোকেরা যৌন-সঙ্গম ব্যাপারটা বিশেষ লজ্জাবহ ও ঘৃণাস্কর মনে করে। কিন্তু এস্কুইমো বালক-বালিকাগণ অতি শিশুকাল হইতেই সর্ব্বসাধারণের সম্মুখেই সহবাস করিতে কোনপ্রকার সঙ্কোচ বোধ করে না।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম জাতিগণের মধ্যে দেখা যায়, সেখানেও বালক-বালিকারা উন্মুক্ত স্থানেই কোন প্রকার লজ্জা সরম না করিয়া যৌন-সঙ্গমে রত হয়। তবে ইহাদের বালক-বালিকাগণ একটু বেশী বয়সে যৌনপক্কতা লাভ করে অর্থাৎ ১৫ বছর বয়স্ক বালক এবং ১০ বছর বয়স্ক বালিকাদেরই অধিক ক্ষেত্রে যৌনপক্কতা লাভ করিতে দেখা যায়।

প্রকৃত কথা এই যে, যৌনপ্রবৃত্তিটী যদিও সহজাত তথাপি মানব-জীবনে যৌনচেতনার আদি বিকাশ যে কাহার কি ভাবে ও কোন্ সময়ে ঘটে তাহার কোন ধরাবাধা নিয়ম নাই। জগতের কোন নর-নারীই ঠিক একইভাবে যৌনচেতনা লাভ করে না। ইয়োরোপ ও এ্যামেরিকার যৌন-বৈজ্ঞানিক ও মনো-বৈজ্ঞানিকদের বিরাট গবেষণার ফলে প্রমাণসহ এ সত্য প্রকটিত হইয়াছে যে, সে দেশের বালক-বালিকাগণের অধিকাংশই খুব শৈশবেই যৌনচেতনা লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু সে তুলনায়—যদিও আমাদের দেশে নর-নারীর যৌবন লাভ ইয়োরোপ ও এ্যামেরিকার নর-নারীগণ হইতে অনেক আগেই ঘটিয়া থাকে তথাপি আমাদের দেশের বালক বালিকাগণ অধিক ক্ষেত্রে তদপেক্ষা কিছু বেশী বয়সেই যৌনচেতনা লাভ করে। ইউরোপ ও এ্যামেরিকার বালক-বালিকাগণ বয়স্ক নরনারীর চুম্বন, আলিঙ্গন দৃশ্যাদি হামেসাই চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া তাহাদের মনের উপর একটা অনুকরণপ্রিয়তার ছাপ পড়ে এবং তাহার ফলেও অনেক সময় তাহারা একটু অল্প বয়সেই যৌনচেতনা লাভ করে। আমাদের দেশেও যে সকল শিশুবা পিতা-মাতার অসাবধানতার ফলে অতর্কিতে মাঝে মাঝে পিতা-মাতার সঙ্গমকালীন দৃশ্যাদি পরিদর্শন করিয়া থাকে সেই দৃশ্য তাহাদের মনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং সেই সকল কারণে তাহারা সাধারণতঃ একটু অল্প বয়সেই যৌনচেতনা উপলব্ধি করে।

শিশুদের অতি অল্প বয়সে যৌনচেতনা লাভ করিবার মূলে আরও কতকগুলি কারণ দেখা যায়। যেমন গৃহপালিত পশু প্রভৃতির সঙ্গম দৃশ্যাদি পরিদর্শন করা; পুংশিশুর মুত্রযন্ত্রে প্রস্রাবের ময়লা জমিয়া চুলকানি বশতঃ যৌনইন্দ্রিয় নাড়াচাড়া ও উহা উচ্ছ্রিত হইয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ লাভ ও ক্রমে যৌনচেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া প্রভৃতি।

এইভাবে যৌনচেতনার বিকাশ সাধরণতঃ অর্জ্জিত ( acquired )। কিন্তু পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি যে বংশানুগত ( heredity ) কারণেও অনেক সময় শিশুগণের মধ্যে অল্প বয়সে যৌনচেতনাবোধ জন্মে অর্থাৎ শিশুর পিতা অথবা মাতা যদি অতি শৈশবেই যৌনচেতনা লাভ করিয়া থাকেন তবে তাহা তাহার সন্তানেও বর্ত্তিয়া থাকে। তাহাদের সন্তানগণও অতি অল্প বয়সেই যৌনচেতনা লাভ করে।

শিশুজীবনে যে যৌনচেতনার বিকাশ দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী বা অন্যান্য নিকটআত্মীয় স্বজন বা খেলার সাথী সঙ্গীদের অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হয়। কিন্তু এ সময়ের যৌন চেতনার মধ্যে প্রকৃত সঙ্গম বিষয়ে কোন জ্ঞান তাহাদের থাকে না বা প্রকৃত সঙ্গম কার্য্য অনুষ্ঠানের ব্যগ্রতাও তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। তবে অনেক শিশু পিতা-মাতার সঙ্গমকার্য্য পরিদর্শন করিয়া অনুকরণ-প্রিয়তা স্বভাব বশে উহা খেলার সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পায়। সে সঙ্গী বা সঙ্গিনী আপন ভাই অথবা বোন হইতেও কোন বাধা থাকে না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র যৌনঅঙ্গ নাড়াচাড়া, দর্শন, স্পর্শন কিংবা অপরের সঙ্গে ঐ বিষয়ে কৌতুহলোদ্দীপক আলাপ-আলোচনা বা নিজ নিজ অঙ্গ একে অপরের দ্বারা স্পর্শন বা ঘর্ষণ করাইয়া একটা অজ্ঞাত আনন্দ লাভ করে মাত্র।

শৈশব, বাল্য বা কৈশোরে যৌনচেতনার যে বিকাশ দেখা যায় তাহা সাধারণতঃ তিন পথে ধাবিত হইয়া যৌনতৃপ্তির আস্বাদ লাভ করে। যথা : প্রথমেই আত্মকাম বা Autosexual ( Narcissism ) ; দ্বিতীয়তঃ স্বকাম অর্থাৎ পানিমেহনাদি বা Masturbation ; তৎপর সমকাম বা Homo-sexual practice. এই সমস্তের ভিতর দিয়াই স্বাভাবিক মানুষের যৌনচেতনার বিকাশ জগতের সর্ব্বত্রই ঘটিতে দেখা যায়।

অবশেষে উহা পূর্ণতা লাভ করে heterosexuality বা বিপরীত লিঙ্গে মৈথুন বা নারী-পুরুষ মৈথুনের মধ্যে। পশুমেহনাদি যে সকল প্রবৃত্তি মানুষের মধ্যে দেখা দেয় তাহাকে অস্বাভাবিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে।

কৈশোরকাল পর্য্যন্ত মানুষের যৌনপ্রবৃত্তিটা সাধারণতঃ সমপ্রেমেই পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ পুরুষের পুরুষপ্রীতি ও নারীর নারীপ্রীতিই কৈশোরকাল পর্য্যন্ত অতিমাত্রায় প্রবল থাকে এবং ঐ বয়স পর্য্যন্ত সাধারণতঃ যৌনপ্রবৃত্তি স্বমিথুন ও সমমিথুনের পথে ধাবিত হইতে দেখা যায়।

এখানে ইয়োরোপ ও এ্যামেরিকার বালক-বালিকাদের সঙ্গে আমাদের দেশের বালক-বালিকাদের একটা তুলনামূলক আলোচনা করা চলে অর্থাৎ পাশ্চত্য দেশের ছেলেরা যৌনচেতনা লাভ করিয়া যে পথে উহার তৃপ্তি সাধনে অগ্রসর হয়, আমাদের দেশের ছেলেদেরও সে বিষয়ে বিশেষ কোন ইতর বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। তবে সেখানে ছেলেরা যত অধিক পরিমাণে মেয়ে-সঙ্গ লাভ করে, এখানে ছেলেরা ততটা লাভ করে না বলিয়া ইহারা অধিক ক্ষেত্রেই স্বমেহন বা সমমিথুনের ভক্ত থাকে।

কিন্তু সেদেশের বালিকারা বিশেষ করিয়া এ্যামেরিকান বালিকাগণ যত অল্প বয়সে যৌনচেতনা লাভ করিয়া ইহার ব্যবহারিক তৃপ্তিলাভে অগ্রসর হয়, আমাদের দেশের বালিকাগণের মধ্যে তাহা দেখা যায় অতি অল্প ক্ষেত্রে। আমাদের দেশের মেয়েদের নিকট হস্তমৈথুন ব্যাপারটা ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিজ্ঞাতই ছিল। কিন্তু অধুনা সহরের মেয়েদের মধ্যে এ প্রথাটি অধিক পরিমাণে বিস্তার লাভ করিয়াছে; তথাপি বহু বহু গ্রাম্যবালা এ বিষয়ে আজিও অনভিজ্ঞ। ইহা আমার ব্যক্তিগত অনুসন্ধানের দ্বারাও প্রমাণ পাইয়াছি। আমার পরলোকগতা

প্রথমা পত্নী ও আমার বর্ত্তমান সহধর্ম্মিণী এ অনুসন্ধান কার্য্যে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। তবে সমমিথুন ব্যাপারটা যে গ্রাম্যবালিকাগণের মধ্যেও দেখা যায় না তাহা বলা চলে না। আমার পরলোকগতা পত্নী অকপটে আমার নিকট ব্যক্ত করিয়াছিল যে, তাহার বাল্য সময়ে তাহাদের পাশের গ্রামের কোন বয়স্কা অবিবাহিতা বালিকা জোর করিয়া তাহার উপর নিজের সমকামিতা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে যাইয়া তাহাকে সামান্যরূপে আহত করিয়াছিল। এমনি ধরণের আরও প্রমাণও আমি সংগ্রহ করিয়াছি।

এইবার আমরা কৈশোরের ও যৌবনের সংমিশ্রণে যে প্রকৃত যৌন-চেতনাব উদ্বোধন, তাহার বিকাশ লক্ষ্য করিব। আমাদের দেশের ছেলেদের কৈশোরত্ব প্রাপ্তি ঘটে স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রায় চৌদ্দ, আর মেয়েদের বারো বছরে এবং এই কৈশোরত্বের পরিসমাপ্তি ও যৌবনের উদ্বোধন ছেলেদের স্বাভাবিক ক্ষেত্রে প্রায় সতেরো-আঠারোয়, আর মেয়েদের প্রায় পনেরো-ষোলয়। ঐ সময়টার মধ্যেই পুরুষ ও নারীর যৌবনোদ্ভেদ ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ Puberty Period. ঐ সময়েই নারী পুরুষের যৌনঅঙ্গগুলি পরিপূর্ণতা লাভ করে। মেয়েদের স্তনোদ্ভেদ, যৌনকেশ দেখা দেওয়া, জননযন্ত্রগুলিব স্বাভাবিকতা প্রাপ্তি, ঋতু প্রকাশ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি ঐ কৈশোর সময় হইতে যৌবন প্রাপ্তির মধ্যে ঘটিবেই। যে ক্ষেত্রে উহা না ঘটে সে ক্ষেত্রে তাহা ব্যাধির পর্য্যায়ভুক্ত এবং কৈশোরত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে ঘটিলে উহাও স্বাভাবিক নহে। পুরুষদের বেলায়ও ঠিক ঐ কথা। কৈশোর হইতে যৌবন প্রাপ্তিকালের মধ্যে তাহাদেরও যৌনকেশ দেখা দেওয়া, দাঁড়ি গোফ উঠা, বীর্য্যের পরিপক্কতা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে।

যৌবন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্বাভাবিক সুস্থ নারী-পুরুষের মনেই ধীরে ধীরে যৌনসঙ্গলিপ্সা জাগ্রত হইতে থাকে, তখন সমমিথুনের আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয় এবং নারী পুরুষ পরস্পরের প্রতি ক্রমেই আকর্ষিত হইতে থাকে এবং স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করে। এই সময়ে প্রত্যেক সুস্থ নারী পুরুষের মনেই কামনা বাসনা প্রবল হইতে থাকে, কামকেন্দ্র বিশেষভাবে উত্তেজনা প্রাপ্ত হয় এবং পুলক, শিহরণ, উন্মাদনা প্রভৃতি লক্ষণও প্রকাশ পায়। এই সময়ে শত চেষ্টাচরিত্র ও শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিলেও এই যৌবন-জোয়ার রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও থাকে না। কোন প্রকার ব্যবহারিক যৌনতৃপ্তি লাভ করিতে না চাহিয়া অতি সংযতভাবে জীবন যাপন করিলেও সুপ্তির মধ্যে কামনা ভোগ চলে। সাধারণ বাঙ্গালী জীবনে বর্ত্তমানে অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে এই সময়ে অনেক তরুণ ও তরুণীরই বিবাহিত জীবন আরম্ভ না হইবার ফলে তাহারা অনেকেই গোপনে স্বমেহন ও সমমেহনাদি কার্য্যে রত থাকে এবং যাহাদের সাহস অত্যন্ত বেশী ও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা জোটে তাহারা সমাজের রক্তচক্ষুকে ভয় না করিয়া কুমার বা কুমারী জীবনেই যৌন-লালসাকে স্বাভারিক পথেই চরিতার্থ করে।

স্বপ্নদোষ এ সময়ে একটা অপরিহার্য্য ব্যাপার। শত সংযত-জীবন যাপন করিলেও এই সময়ে ইহার প্রভাব শতকরা একজনও এড়াইতে পারেন কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এই সময়ে নারী ও পুরুষকে ইন্দ্রিয়ের তাড়নায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া নানারূপ ব্যভিচারেও লিপ্ত হইতে দেখা যায়।

যৌবনে স্বপ্নদোষের জন্য অনেক যুবক ঔষধের বিজ্ঞাপনাদি দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল হন। কিন্তু ইহার অত্যন্ত বাড়াবাড়ি না ঘটিলে তৎকালে

ভয়ার্ত হইবার কোনই কারণ নাই—তখন ইহা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। আমি যৌন-সংযম ও চিকিৎসাধ্যায়ে পরে এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি।

আলোচ্য অণুঅধ্যায়ে নর-নারীর যৌনচেতনার বিকাশ সম্পর্কে উপরে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে নানারূপ ইতর বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইলেও ইহাকে স্বাভাবিক যৌন পরিণতির পথেই টানিয়া আনা হইয়াছে। কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কোন নর-নারীর ক্ষেত্রে এমন সব অস্বাভাবিকতা অতিমাত্রায় বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যাহা পরবর্ত্তী জীবনেও অনেকানেক নর-নারীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিগুমান থাকিতে দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার স্বাভাবিক যৌনতৃপ্তির পথকে বিশেষ ঘৃণা করিয়া থাকেন ও অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনতৃপ্তি লাভে চিরঅভ্যস্ত হইয়া পড়েন। আবার অনেকে হয়েন উভকামী। এই সকল বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এখানে না করিয়া পরবর্ত্তী 'অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি' অণুঅধ্যায়ে করিব।

## নর ও নারীর প্রভেদ ঃ

পুরুষ এবং নারীর দৈহিক গঠন যে পৃথক ইহা প্রত্যক্ষই দেখা যায়। কিন্তু এ বিভিন্নতা শুধু বাহিরের অঙ্গগুলিতেই নয়, দেহাভ্যন্তরের অস্থি, কোষ, স্নায়ু, পেশী, রক্ত প্রভৃতি যাহা কিছু সবটাতেই বিভিন্নতা আছে। পুরুষ এবং নারীর মস্তিষ্কের গঠন, ইহার আকার এবং পরিমাণও বিভিন্ন। আবার নর ও নারীর এই প্রভেদ কেবল দেহের ভিতর ও বাহিরেই নহে এই প্রভেদ উভয়ের মনের মধ্যেও সুদূর প্রসারিত রহিয়াছে। ( হেবলক্ এলিস্—'ম্যান এ্যাণ্ড ওম্যান' )।

নর-নারীর দেহ-মনের এই প্রভেদ সম্পর্কে জন লাংডন ডেভিস্ তাঁহার 'এ সর্ট হিষ্টোরী অব ওমেন' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থে লিখিয়াছেন ঃ পুরুষ ও নারীর বিভিন্নতা শুধুমাত্র তাহাদের জননযন্ত্রেই নহে—ইহার প্রভেদ

তাহাদের দৈহিক উচ্চতা ও ওজন, শরীরের স্নায়ুকোষের পরিপূর্ণতা, গঠন, রক্তের চাপ, দৈহিক তাপ প্রভৃতি সব বিষয়েই এই প্রভেদ দেখা যায়। অবশ্যই এই বিভিন্নতা নিরর্থক নহে—প্রকৃতির একটা নিগূঢ় রহস্য ইহার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। বিভিন্ন সমাজের কোন সামাজিক আবেষ্টনও ইহার জন্য দায়ী নহে। নারী ও পুরুষের এই পার্থক্য তাহাদের নিজ নিজ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহা নর ও নারীর স্বাভাবিক জীবনধারাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছে।

## সৃষ্টিকার্য্যে নর ও নারী :

প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই যে যৌনপ্রবৃত্তি বর্ত্তমান, তাহার প্রধান উদ্দেশ্যই হইল নূতন জীবসৃষ্টি। সৃষ্টিকার্য্যের জন্যই নারী ও পুরুষকে উপযুক্ত বয়সের সময় সম্মিলিত হইতে হয়। যদিও মানুষ তাহার দুর্ব্বার প্রেরণা বশে আনন্দলাভের উদ্দেশ্যই এই পথে অগ্রসর হন এবং সৃষ্টির কথা চিন্তা করেন খুব কম ক্ষেত্রেই, তথাপি প্রকৃতি উহারই মধ্য দিয়া ইহার গৌণ লক্ষ্য ও আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া থাকে।

পুরুষের ভিতর কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে উন্নত এবং নারীর ভিতরও কতকগুলি বৃত্তি আছে উন্নত। নারীর সেই সেই বৃত্তিগুলি পুরুষের নাই; আবার পুরুষের সেই সেই বৃত্তিগুলিও নারীতে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায় না। উভয় প্রকার বৃত্তির সম্মিলনে অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলনেই মানুষ 'পূর্ণ-মানুষ' হয়। ইহারই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারগণ স্ত্রীকে অর্দ্ধাঙ্গিনী বলিয়া গিয়াছেন।

স্মরণাতীত কাল হইতে সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে যখন মানুষ পশুর ন্যায় বনে বনে বিচরণ করিত; সমাজ, শাস্ত্র, ধর্ম্ম, নীতি, সভ্যতার কথা মানবের নিকট ঘোর তমসাবৃত ছিল, সেইদিনও তাহার একমাত্র কার্য্য

ছিল আহারান্বেষণ ও পরিণত বয়সে যৌন-সংযোগের দ্বারা সন্তান উৎপাদন করা। যদিও আধুনিক বিজ্ঞানের উগ্রতম আবিষ্কারের ফলে পিতা ও মাতার দৈহিক মিলন ছাড়াও যন্ত্র সাহায্যে (test-tube) গর্ভসঞ্চার করা সম্ভব হইয়াছে এবং ইহার ফলে গরু, ঘোড়া, শূকর, মেষ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ পশুর জন্মলাভ সুলভ হইয়াছে কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে তাহা পরম সফলতার বার্ত্তা শোনায় নাই। তথাপি বর্ত্তমানে এ্যামেরিকায় অনেক নারী এইভাবেও সন্তান লাভ করিয়া থাকেন।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, পুরুষ একবার যে শুক্র ত্যাগ করে, তাহাতে বাইশ কোটী যাট লক্ষ বীর্য্যাণু পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকিতে দেখা গিয়াছে এবং ইহার প্রত্যেকটী একটী সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম। বৈজ্ঞানিকভাবে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পুরুষের ঐ বীর্য্যাণুর ভিতর যদি হাজার করা একটীও সজীব বীর্য্যাণু (যে বীর্য্যাণু জন্ম দিতে সক্ষম) থাকে তবে বৎসরে একজন পুরুষ অন্ততঃ তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ নারীর গর্ভ-সঞ্চার করিতে সক্ষম এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থায় অর্থাৎ test-tube সাহায্যে পুরুষের বীর্য্য লইয়া যদিও তাহা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু নারীর গর্ভাশয়ের পক্ষে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাহাতে এক হইতে সাতটীর অধিক সন্তান একবারে গর্ভে ধারণ করা সম্ভব। অন্ততঃ পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন নজির নাই। ('ইউজিনিকস্ রিভিয়্যু'—জুলাই-১৯৩৫)। তবে মহাভারতে দুর্য্যোধনাদির শত ভাইদের জন্মের কাহিনী অনেকেই পাঠ করিয়া থাকিবেন।

স্বাভাবিক উপায়ে মানুষ জন্মদান সম্পর্কে দেখা যায়, পঞ্চাশ-ষাট বৎসর বয়স্ক পুরুষ কুড়ি-বাইশ বছর বয়স্কা নারীর গর্ভ-সঞ্চার করিতে সক্ষম; কিন্তু ইহার উল্টা ব্যবস্থা হইলে তাহা সম্ভব নহে।

সৃষ্টিরক্ষা কার্য্যে বা প্রজনন ক্রিয়ায় পুরুষের একমাত্র কর্ত্তব্য নারীর গর্ভসঞ্চার করা এবং এই গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হইলেই পুরুষের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায়; কিন্তু নারীর পক্ষে তাহা হয় না। সন্তান জন্মদান ব্যাপারে পুরুষের কার্য্য যখন শেষ হয় তখন হইতে নারীর কার্য্য আরম্ভ হয়। গর্ভের নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নারীকে সেই সন্তান উদরে পোষণ করা ও প্রসবান্তে তাহাকে স্তন্যদান করিয়া আদরে, যত্নে, স্নেহে অত্যন্ত সতর্ক-ভাবে সেই অসহায় জীবকে বড় করিয়া তুলিতে হয়। মানবশিশুর মত অসহায় জীব পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই এবং এ অসহায় ভাব তাহার অন্যান্য প্রাণী হইতে দীর্ঘকাল স্থায়ী।

প্রকৃতি নারী-পুরুষকে মিলিত হইবার জন্য একটা দুর্ব্বার প্রেরণা দিয়াছে। সেই প্রাকৃতিক নিয়মে স্বাভাবিক গতিবশে নর-নারীর এই দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণের শেষ ফল মিলন ও যৌন-মিলনের প্রধানতম উদ্দেশ্যই হইল প্রজাসৃষ্টি। শাস্ত্রের ঋষিও তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন: 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা'......। কিন্তু অধুনা যদিও এ ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ কেবলমাত্র পুত্র উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই সুরতক্রিয়া সাধিত হয় না—আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই অধিক ক্ষেত্রে নর-নারী মত্ত হইয়া থাকে, তথাপি নর-নারীর মিলিত হইবার এই দুর্ব্বার প্রেরণা সন্তান জন্মদানের উদ্দেশ্যেই।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, বিশ্ব-জোড়া নারীরই মাতৃত্বক্ষুধা আছে এবং নারী-জীবনে ইহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেরণা ও অনেক ক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রধান ইচ্ছা ও সার্থকতা। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ নারীতত্ত্বানুসন্ধানী মনীষী লুডোভিচি তাঁহার জগৎ-বিখ্যাত প্রামাণ্য "উম্যান অব এ ভিণ্ডিকেশন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন নারীর এই সহজাত মাতৃত্ব ক্ষুধা তাহার সারা চেতন-রাজ্যে এমন নিবিড়ভাবে পরিব্যাপ্ত যে,

নারীর সমস্ত ভালমন্দ, চিন্তা ও কর্ম্মকুশলতা তাহার অজ্ঞাতসারে এই প্রবৃত্তি দ্বারাই পরিচালিত হয়।

নারীর ভিতর স্ত্রীত্ব ও মাতৃত্ব দুই-ই বর্ত্তমান। প্রথমে নারীর স্ত্রীত্বের অভিব্যক্তি পুরুষের কাছে। পরে সেই স্ত্রীত্ব সার্থক হইতে চায় মাতৃত্বে। তাই ত নারীর মা হইবার এত ঝোঁক। বিবাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নারীর অন্তর্নিহিত মাতৃত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সক্রিয় হইতে আরম্ভ হয়। একটা ছোট মেয়েকে 'মা' বলিলে যত খুসী ও কোমল হয়, পুরুষ ছেলেকে 'বাবা' বলিলে তাহার অল্পাংশও হয় না।

নারীর মাতৃত্ব প্রবৃত্তি যাহাতে ব্যর্থ না হয় তাহার জন্য শাস্ত্রকার মনু ও পরাশর প্রমুখ প্রাচীন হিন্দুঋষিগণ একবাক্যে বিধান দিয়াছেন:

ঋতুকালভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজচ্চৈনাং তদ্‌ব্রতো রতিকাময়্যা॥

—'মনুসংহিতা' (৩য় অঃ)।

নারীজীবনে মাতৃত্বের গভীর প্রভাব সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া মহর্ষি মনু—যিনি কোন অবস্থায়ই নারীর পত্যান্তর গ্রহণের অনুমতি দেন নাই—তিনিও অজাতসন্তানা নারীকে বিশেষ বিধান দিয়া গিয়াছেন:

দেবরাদ্বা সাপাণ্ডদ্বা স্ত্রিয়া সম্যঙ নিযুক্তয়।
প্রজেপ্সিতাধিগন্তব্যা সন্তানস্য পরিক্ষয়ো॥

অর্থাৎ দেবর বা অন্যান্য সপিণ্ডাধিকারী ব্যক্তিগণকেও অজাত-সন্তানা স্ত্রীর ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদনার্থ নিযুক্ত করিয়া পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

বিশ্ববিখ্যাত জার্ম্মান দার্শনিক নীট্‌শে (Nietzsche), স্কোপেন হাওয়ার প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ নারীর আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন তাহার পুরুষাভিমুখী এই মাতৃত্ব-প্রবৃত্তির জন্যে। যৌনপ্রবৃত্তি

নারীর একমাত্র প্রবৃত্তি ও তাহা তাহার মাতৃত্বের অপরিহার্য্য উপায়। মাতৃত্বের মধ্যেই নারীর পূর্ণ পরিণতি। এ সম্পর্কে মনীষী ফোরেল মহাশয়ও তাঁর "সেক্সুয়েল কোশ্চেন" গ্রন্থে লিখিয়াছেন: আমরণ কাল পর্য্যন্ত নারীর যৌন-জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ—বিবাহ। কারণ বিবাহের ভিতর দিয়াই তাহার মাতৃত্বের সার্থকতা ও নিরাপদ সম্ভাবনা। কিন্তু পুরুষের দিকে দেখিতে গেলে বিবাহের প্রতি তাহার তেমন কোন আকর্ষণ নাই বরং বহুপত্নীমুখী প্রবৃত্তির জন্যে স্বভাবতঃই সে বিবাহের জন্য তেমন উন্মুখ নহে।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন: বহুপাত্রে প্রেমদান প্রবৃত্তি পুরুষের ও একপাত্রে প্রেমদান প্রবৃত্তি নারীর জন্মার্জ্জিত। হিন্দুশাস্ত্রকারগণও বলিয়াছেন: 'পুরুষ বহুনারী গমন সম্পন্ন এবং স্ত্রী একপুরুষ গমন সম্পন্না এবং ইহা তাহাদের বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত স্বভাবের সহজ সংস্কার।' আর এই সংস্কার-বোধ হইতেই কৌলিন্য প্রথার সৃষ্টি হইয়াছিল।

তারপর নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান বৃত্তি রজঃ। বৈজ্ঞানিকগণ স্বীকার করিয়াছেন: রজঃ অপেক্ষা সুদূরব্যাপী বৃত্তি নারী-জীবনে আর পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যৌন-বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিকগণ একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন: এই রজঃ প্রভাবেই নারী সারাজীবন চালিত হইয়া থাকেন। তাহার মন-মেজাজ, খেয়াল-খুসী, সুখ-দুঃখ, সুস্থতা-অসুস্থতা অধিক মাত্রায় ইহারই উপর নির্ভর করে।

নরের জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকটা সমতালেই চালিত হইয়া থাকে। কিন্তু নারীর বেলায় তাহা কদাচ সম্ভব নহে। মাসে অন্ততঃ দুইবার তাহার জীবন উঠা নামা করিতে বাধ্য এবং ইহারই জন্য পুরুষের কাছে নারী চিরদিনই রহস্যময়ী থাকিয়া গিয়াছেন। এই রজঃ বত্তির

ফলেই তাহার খেদ, দুঃখ, অশ্রু-বিসর্জ্জন, অনুতাপ, আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে আনন্দের হাসি অধরপ্রান্তে প্রতিফলিত হওয়া; ক্রোধ, চপলতা, চঞ্চলতা; আবার পর মুহূর্ত্তেই স্নেহে দরদে বিগলিত হইতে দেখা যায়।

নর ছড়াইয়া দেয়, নারী কুড়ায়। সৃষ্টি ব্যাপারে নারী ও পুরুষের কার্য্য বিপরীত। পুরুষ পূরণ করে, নারী বৃদ্ধি পাওয়ায়। 'নারয়তি ইতি নারী'—নারী ধাতু হইতে নারী নিষ্পন্ন। পুর ধাতু অর্থাৎ পূরণ করা হইতে পুরুষ নিষ্পন্ন হইয়াছে। পুরুষ নারীর অভাব পূরণ করিয়াই সন্তুষ্ট।

মহামতি টেনিসন্ বলিয়াছেন: 'নারী অথবা পুরুষ একা অর্দ্ধেক মানুষ মাত্র। উভয়ে উভয়ের অভাব পূরণ করে এবং সর্ব্বদা তাহারা পরস্পরের ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা মিলাইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। একের যাহা আছে, অন্যে তাহা বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়না। একে অন্যকে পূরণ করে ও অপর অন্যের দ্বারা পূরিত হয়।' এই অবস্থায় স্ত্রীর গর্ভাবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন: পুরুষের শুক্র মধ্যস্থ জীবাণু (spermatozoa) গতিশীল, সূক্ষ্ম ও চঞ্চল এবং নারীর বীজ মধ্যস্থ জীবাণু (ovum) সকল উহা হইতে বড়, স্থাণুবৎ বা অচঞ্চল। নারীর প্রথম রজঃ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা যায় যে, নারী গর্ভধারণক্ষমা হইয়াছেন। প্রকারান্তরে তাহার ডিম্ব (ovum) পরিপক্ক হইলেই প্রথম রজঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে।

পুরুষ সংসর্গে স্ত্রীর অণ্ডাণুকোষ (ovary) হইতে স্ত্রী-বীজ (ovum) বাহির হইয়া গর্ভাশয়ের (uterus) দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং শুক্র-কীট সকল স্বতঃতাড়িত হইয়া জরায়ুর মুখের (os) মধ্যে প্রবেশ করে। অতঃপর ওজঃ সন্নিধানে আসিয়াই ওজঃ মধ্যে মিশিয়া যাইয়া তৎক্ষণাৎ জরায়ুর মধ্যে উপ্ত হয়—ইহাকেই গর্ভ হওয়া বলে।

সন্তান ধারণ ও সন্তান পরিচর্য্যা—নারীর বংশানুগত কর্ম্মধারা এবং তাহার দৈহিক গঠনও সর্ব্বতোভাবে এই কর্ম্মের উপযোগী। স্মরণাতীত কাল হইতে নারী বংশানুক্রমে মাতৃত্বের সাধনা করিয়া আসিয়াছে। নারীর দেহের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব্ব-অবয়বে মাতৃত্বের এক বিরাট আয়োজন। নারীর সহজাত প্রবৃত্তি মাতৃত্ব। কিন্তু সেইদিক দিয়া পুরুষকে দেখিতে গেলে পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি আত্ম-সংরক্ষণ ও সমাজ গড়ন এবং তাহারই ফাঁকে ফাঁকে কয়েকটী মুহূর্ত্তের যৌন-মিলনের আনন্দ উপভোগ। যৌনতার ক্ষেত্রে পুরুষের একমাত্র কার্য্য নারীর গর্ভ উৎপাদন, তাহারই জন্য প্রকৃতি তাহার শরীরের সামান্যতম অংশে মাত্র জননেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিয়াছে এবং তাহার যৌনানুভূতি কেবলমাত্র জননযন্ত্রের মাঝেই সীমাবদ্ধ। পুরুষের যৌনচেতনা উদ্বুদ্ধ হইলে যৌন-সংযোগ ও স্খলন বিনা পরিতৃপ্ত হয় না এবং যৌনতৃপ্তির সঙ্গেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া যায়—তাহার মনোরাজ্যে কোন চিহ্ন না রাখিয়াই। কিন্তু নারীর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম বহুদিক দিয়াই পরিলক্ষিত হয়। নারীর গর্ভধারণ ও সন্তান পরিচর্য্যার জন্যে প্রকৃতি তাহার সারাদেহেই জননেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি করিয়াছে। নারীর দেহভ্যন্তরে ডিম্বকোষ (Ovary). ডিম্ববাহীনল ( Fallopian tube ), জরায়ু ( Uterus or Womb ), স্তন্যকোষ প্রভৃতি গর্ভধারণোপযোগী বিবিধ জটিল যন্ত্রাদি ও মুক্তদেহে কুচযুগ, গুরু নিতম্ব, কোমল অঙ্গ, স্থূল উরু প্রভৃতি তাহার প্রমাণ।

গর্ভসঞ্চার উপযোগী কালকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য মাসিক ঋতুর ব্যবস্থা রহিয়াছে। গর্ভধারণ, প্রসব, স্তন্যদান ও পরিচর্য্যাদি অবসাদজনক কার্য্য আনন্দ সহকারে সমাধা করিবার জন্য প্রকৃতি নারীর যৌনানুভূতিকে সারাদেহে সঞ্চালন করিয়া দিয়াছে। ইহারই ফলে যৌনতৃপ্তি নারীর সমস্ত চেতনরাজ্যে ও অগ্রমস্তিষ্কে (Cerebrum)

একটা গভীর রেখাপাত করিয়া যায়। ( অটো উইনিন্‌জার কৃত 'সেক্স্‌ এ্যাণ্ড ক্যারেক্টার' )।

সন্তানকে জন্মদানান্তর সযত্ন পরিচর্য্যার দ্বারা সবল সুস্থ করিয়া তাহাকে তাহার ভবিষ্যতের অনুযায়ী মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলাই নারীর সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য হইয়া আছে। "ময়্যাল পয়েজন ইন মডার্ণ ফিক্‌সন্‌" গ্রন্থ প্রণেতা আর, বি, জন্‌সন মহাশয়ও সেই কথা বলিতেছেন : মাতার দায়িত্ব, কর্ত্তব্য, ধৈর্য্য প্রভৃতির উপর সারা বিশ্বসংসার যতটা নির্ভর করে, পুরুষের ক্ষেত্রে ততটা মোটেই নহে। কারণ সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে নারীরাই সৃষ্টি, স্থিতি ও পালন করেন এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ তাহার মধ্যে দিয়াই গঠিত হয়। পিতার চরিত্রদোষ থাকিলে সন্তানের যতটা অনিষ্ট হয়, মাতার চরিত্রদোষ থাকিলে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ বেশী মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা থাকে। পৃথিবীতে কোন সন্তান—এমনকি জারজ সন্তানও আপন মাকে অসতী বা কলঙ্কিণী দেখিতে বা ভাবিতে চাহে না। 'আদর্শ পুরুষ অপেক্ষা আদর্শ নারী মানব জাতির এক উচ্চতরের বিকাশ।' (দার্শনিক নীট্‌শে)।

## প্রেম, কাম ও বিবাহ :

প্রথমটীর স্বরূপ চূড়ান্তভাবে অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই ; দ্বিতীয়টী মানবের সহজাত প্রবৃত্তি হইতেই উৎপন্ন ও তৃতীয়টী নর ও নারীর মিলিত হইবার দুর্দ্দমণীয় আকাঙ্খা হইতে সৃষ্ট সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের বিজ্ঞানসম্মত বিকাশ।

কামের মূলে প্রেম বর্ত্তমান থাকিতে নাও পারে, কিন্তু প্রেমের মূলে কামনাসর্প লুক্কায়িত আছে ; আর বিবাহের মূলে প্রেম ও কাম উভয়েরই সমন্বয় ঘটিয়া থাকে। উভয়ের সমন্বয় ঘটিলে দাম্পত্য-জীবন সার্থক হইয়া উঠে, নতুবা হয় ব্যর্থ। অধুনা সভ্য নর-নারীর জীবনে

প্রেমের ও কামের সার্থকতা বিবাহিত-জীবনেই সবচেয়ে নিরাপদ, নিরুদ্বিগ্ন ও শান্তিপূর্ণ।

দেহ ছাড়া প্রেমের স্বরূপ উপলব্ধি কিংবা প্রেমের বিকাশ সম্ভব নয়।

প্রেমের আদর্শ কামগন্ধহীন করিয়া স্থাপন করিতে সেই প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের যুগ হইতে অদ্যাবধি কম চেষ্টা হয় নাই এবং দেশ-বিদেশেও প্রেমের আদর্শ লইয়া ও ইহাকে কামনাবিহীন প্রতিপন্ন করিতে বহু শত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহার ফলে Platonic love, প্রকৃত প্রেম, আদর্শ প্রেম প্রভৃতি বহু গালভরা বুলির সৃষ্টি হইলেও কামনা-সর্প প্রেমের বেদী যেমন করিয়া জড়াইয়া রহিয়াছে, আজিও সে সেই স্থান হইতে একতিল দূরে সরিয়া যায় নাই।

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যই ধরা যাউক। সেখানেও প্রেমের সঠিক স্বরূপ কি তাহা নির্ণীত হয় নাই। 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' উক্ত হইয়াছে: 'অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্'—কাজেই প্রেম যে কি পদার্থ তাহা কোন ব্যক্তি বিশেষকে বুঝানো যাইতে পারে না। ইহা 'মূকাস্বাদনবৎ' অর্থাৎ মূক ব্যক্তি যেমন কোন দ্রব্য আস্বাদন করিয়া তাহা কটু, তিক্ত বা কষায় কিছুই কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না, প্রেমও তেমনি আস্বাদনের বস্তু। কেবল প্রেমী ব্যক্তি নিজেই ইহা অনুভব করে, অন্যের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না এবং অন্যেও ইহার স্বরূপ জানিতে পারে না যদিনা সে নিজে প্রেমিক হয়। নারদীয় সূত্রে গোপিকাদিগের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যে ভালবাসা, তাহাকেই প্রকৃত প্রেম নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রেমের বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বহু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারা শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমের

প্রকারান্তর দেখাইয়াও মধুর প্রেমকে সর্ব্বোপরি স্থাপন করিয়াছেন। নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধীয় প্রেমকেই মধুর প্রেম বলে। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিগণের যে প্রেম, সেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাধারণ নায়ক নায়িকার যে প্রেম তাহা কামজ-মোহ মাত্র। 'চৈতন্য চরিতামৃত' গ্রন্থেও সেই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে :

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

কিন্তু ইহার মূলেও ইন্দ্রিয়প্রীতি ইচ্ছা 'কাম' রহিয়াই গেল। কারণ ব্রজাঙ্গনাগণের প্রেমও 'কাম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

মধুর প্রেমের ভাব সকল বৈষ্ণব শাস্ত্রে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে : মুরলীধ্বনি আদি উদ্দীপন বিভাব ; কটাক্ষ ও ঈষদ্ধাস্য প্রভৃতি অনুভাব ; স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়—এইগুলি সাত্ত্বিক ভাব এবং নির্ব্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্মৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিত্থা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিন্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, উৎসুক্য, অমর্ষ, অসূয়া, চাপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি ও বোধ এই একত্রিশটীকে বলা হইয়াছে ব্যাভিচার ভাব। কিন্তু মধুর রতি স্থায়ী ভাব। ইহাও আবার তিন প্রকার : সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা এবং শ্রীকৃষ্ণের নায়িকগণের মধ্যে কাহারা কোন্ শ্রেণীর ছিলেন তাহাও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখানো হইয়াছে। যথা : মথুরাস্থ কুব্জাদির সাধারণী রতি, দ্বারকাস্থ মহিষীদিগের সমঞ্জসা রতি এবং গোকুলবাসিনীদিগের সমর্থা রতি। ইহার প্রকার ভেদ এইরূপ : সামান্যভাবে নিজ সুখ তাৎপর্য্যযুক্ত রতিকে সাধারণী, শ্রীকৃষ্ণের ও নিজের সুখ তাৎপর্য্য বিশিষ্ট পত্নীভাবময়ী রতিকে সমঞ্জসা এবং কেবল শ্রীকৃষ্ণের সুখ তাৎপর্য্যান্বিতা রতিকেই সমর্থা রতি বলা হইয়াছে।

এই রতি প্রৌঢ়াবস্থায় মহাভাব দশা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে, যে মহাভাব শ্রেষ্ঠ ভক্তদিগেরও অনুসন্ধেয়।

এই রতির গাঢ়ত্বকে প্রেম বলে; আর ইহার পরিণত অবস্থাই স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাব। যেমন ইক্ষুবীজ, ইক্ষু, রস, গুড়, খণ্ড, শর্করা, সিতা এবং সিতাপলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল একই ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাই অবস্থাভেদে বিশেষ বিশেষ নাম ধারণ করে, প্রেমও তেমনি অর্থাৎ রতি ইক্ষুবীজবৎ, প্রেম ইক্ষুবৎ, স্নেহ রসবৎ, মান গুড়বৎ, প্রণয় খণ্ডবৎ, রাগ শর্করাবৎ, অনুরাগ সিতাবৎ, ভাব সিতাপলাবৎ।

যাহা হইতে চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল হয় এবং যাহা অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাবগাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রেম বলে। ধ্বংসের কারণ থাকিলেও যাহা ধ্বংসরহিত এইরূপ যে যুবক-যুবতীদিগের ভাব তাহাকেই বলে প্রেম। সেই প্রেম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইলে চিত্তকে করে দ্রবীভূত, তখন এই অবস্থাকে বলে স্নেহ। হৃদয়ে এই স্নেহ উদিত হইলে অঙ্গসঙ্গ, অবলোকন, দর্শন, শ্রবণ, স্মরণ কিছুতেই তৃপ্তিবোধ হয় না। আবার এই স্নেহেরও প্রকার ভেদ করা হইয়াছে: ঘৃতস্নেহ ও মধুস্নেহ। স্নেহের আধিক্য হেতু সকারণে বা অকারণে যে কোটিল্য তাহার নাম মান। এই মানও দ্বিবিধ। কান্ত দেহাদির সহিত ও নিজদেহাদির ঐক্য ভাবনাময় সম্ভ্রমবর্জ্জিত বিশ্রম্ভ বা বিশ্বাসের নাম প্রণয়। ইহাও দ্বিবিধ। প্রণয়ের উৎকর্ষতা হেতু যখন দুঃখ চিত্তমধ্যে সুখরূপে অনুভূত হয়, তখন হয় উহা রাগ। ইহাও দুই প্রকার।

যে অবস্থা প্রিয়জন সদাই অনুভূত হন ও প্রত্যেক অনুভাবেই নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহারই নাম অনুরাগ। সেই অবস্থায় নিকৃষ্ট প্রাণীতেও জন্মলালসা প্রেমবৈচিত্র্য বিচ্ছেদের অবস্থাতেও স্ফূর্ত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া হয়।

এই ভাব দ্বারকাস্থ শ্রীকৃষ্ণ-মহিষীদিগের পক্ষেও ছিল অতি দুর্লভ। ইহা কেবল গোকুলস্থ গোপিণীদিগের মধ্যেই বিদ্যমান ছিল। এই ব্রজদেবীর ভাবকেই মহাভাব বলে। ইহাও আবার দ্বিবিধ: রূঢ় ও অধিরূঢ়।

রূঢ় মহাভাব: শ্রীকৃষ্ণের সুখের পীড়াশঙ্কায় নিমেষকাল মাত্রও তাহার অদর্শন সহ্য হয় না এবং অধিরূঢ় মহাভাব: যে অবস্থায় কোটী ব্রহ্মাণ্ডগত সমস্ত সুখই তাহার দর্শনাদির জন্য সুখের নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয় ও অদর্শনাদি দুঃখকে সর্পবৃশ্চিকাদির দংশন হইতেও অত্যন্ত অধিক বোধ হয়, সেই অবস্থার নামই অধিরূঢ় মহাভাব।

অধিরূঢ় মহাভাব মোদন ও মাদন ভেদে দুই প্রকার। যাহাতে সুদীপ্ত সাত্ত্বিকভাব সকল উদয় হয় ও যাহার উদয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীবর্গেরও ক্ষোভাভিভব জন্মে তাহার নাম মোদন। এই মোদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধাতেই দৃষ্ট হয়, অন্যত্র দেখা যায় না। এই মোদনই বিচ্ছেদাবস্থায় মাদন নাম ধারণ করে। মাদনের উদয়ে পট্টমহিষিগণ কর্তৃক আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণেরও শ্রীরাধার বিরহতাপ জন্য মূর্চ্ছা হয়। ইহা বিশ্বের ক্ষোভ উৎপাদন করে, তরুলতাকেও রোদন করায়। এই মহাভাব শ্রীরাধাতে প্রায়ই উদিত হয়। দিব্যোন্মাদ এই মাদনেরই বৃত্তিভেদ। সেই অবস্থায় উদ্‌ঘূর্ণা ও প্রলাপাদি প্রেমময়ী অবস্থা সকল পরিদৃষ্ট হয় এবং এই অবস্থায় অনন্ত ভাবের উদ্গম হইয়া থাকে। এই মাদনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইহা কেবল শ্রীরাধাতেই উদিত হইয়া থাকে, অন্যত্র হয় না। ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

সেই প্রেমময়ী রাধা আজ বিশ্বের কোটী কোটী নারীর মধ্যে এবং সেই প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বের সকল নরের বুকেই বিরাজিত—যদি সহজ ভাবে আমরা এ সত্য মানিয়া লই তবে প্রেম ও কামের সকল বিভেদ

এইখানেই ঘুচিয়া যায়। কিন্তু অনেকে হয়ত তাহাতেও গোড়ামী ছাড়িবেন না। প্রকৃত প্রেমের মূলে নাকি তাহারা কামনার ধূপগন্ধ পান না। কিন্তু বৈষ্ণব সাহিত্যের ভাবধারায় এ সত্যই প্রকটিত হইয়াছে—শান্ত, সখ্য, দাস্য, বাৎসল্য প্রভৃতি সকল প্রেমের উপর মধুর প্রেমই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু উহার মূলে কাম বিদ্যমান। তবে এ কথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে কামের শ্রেষ্ঠ অংশই প্রেম। দাম্পত্য-জীবনে কামের মধ্য দিয়াই নর-নারী সেই প্রেমের রাজ্যে উন্নীত হইয়া থাকে।

একথা স্বতঃসিদ্ধ সে যৌনপ্রবৃত্তিই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি; প্রেমের বিকাশ হইয়াছে তাহার অনেক পরে। তাই কবি বলিয়াছেন :

হাজার হাজার বছর কেটেছে কেহত কহেনি কথা।
ভ্রমর ফিরিছে মাধবী কুঞ্জে, তরুরে ঘিরেছে লতা॥
চাঁদেরে চাহিয়া চকোরী উড়েছে, তড়িৎ খেলেছে মেঘে।
সাগর কোথায় খুঁজিয়া খুঁজিয়া তটিনী ছুটেছে বেগে॥
ভোরের গগনে অরুণ উঠিতে কমল মেলেছে আঁখি।
নবীন আষাঢ় যেমনি এসেছে চাতক উঠেছে ডাকি॥
কত যে গোপন মনের মিলন ভুবনে ভুবনে আছে।
সে-কথা কেমনে হইল প্রকাশ প্রথম কাহার কাছে॥

অধুনা নর-নারীর মধ্যে বিবাহ বা আদর্শ দাম্পত্য-জীবনই প্রেম ও কাম সমন্বয়ের পূর্ণ প্রতীক। সামাজিক সুশৃঙ্খলতা ও নৈতিক আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিবাহিত-জীবনে কামনার মধ্যে দিয়াই প্রেম সুন্দরতররূপে বিকশিত হইয়া উঠিতে পারে। কেবল কামকে লইয়া মানুষের তৃপ্তি নাই, আবার কেবল প্রেমের আরাধনায় মানুষ বাঁচিতে পারে না। উভয়েরই সমন্বয়ে যে দাম্পত্য-জীবন, উহাই নর-নারীর কাম্য। কেবল লালসা ও কামনাময় প্রেমহীন দাম্পত্যজীবন

মরুভূমির ন্যায়। বিশেষ করিয়া নারীর নিকট প্রেমহীন জীবন শ্মশান। কেবল কামনার তৃপ্তিতে তাহার তৃপ্তি নাই—প্রেমহীন দাম্পত্য-জীবনে স্বামীর হাসিয়া সোহাগ করাকেও সে অপমান মনে করে। তাই সখেদে সে বলে :

…আছি যেন সোনার খাঁচায়
একখানি পোষমানা প্রাণ।
এও কি বুঝাতে হয় প্রেম যদি নাহি রয়
হাসিয়ে সোহাগ করা শুধু অপমান ?…

তেমনি আবার প্রেমের পরশ পাইয়া প্রেমগরবিনী নারী গাহিয়া উঠে :

…তুমি মোরে
পরায়েছ গৌরব-মুকুট। পুষ্পডোরে
সাজায়েছ কণ্ঠ মোর ; তব রাজটীকা
দীপিছে ললাট মাঝে মহিমার শিখা
অহর্নিশি। আমার সকল দৈন্যলাজ,
আমার ক্ষুদ্রতা যত ঢাকিয়াছ আজ
তব রাজ আস্তরণে।…

এইবার বিবাহিত-জীবনের বাহিরে, যৌন-মিলনের পূর্ব্বাহ্নে নর-নারীর জীবনে যে প্রেম আসিয়া বাসা বাধে তাহারই আলোচনা করিয়া দেখিতে চাই। যাহা 'পূর্ব্বরাগ' নামে সারা বৈষ্ণব-সাহিত্য প্লাবিত করিয়াছে। পূর্ব্বরাগের মহিমা কীর্ত্তনে বৈষ্ণবকাব্য সবচেয়ে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেও ইহাকেও কামদশা নামে অভিহিত করা হয়।

রায়গুণাকর কবি ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী'তে ইহার লক্ষণ এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন :

অঙ্গসঙ্গ হওনের পূর্ব্বে যে লালস।
তাহে বলি পূর্ব্বরাগ তাহে দশা দশ॥
লালসা উদ্বেগ জড় কৃশ জাগরণ
ব্যগ্র রোগ বায়ু মোহ নিদানে মরণ।
প্রত্যেকে বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী নাগর॥

পূর্ব্বরাগ প্রথমে নায়িকাদিগেরই হয়, তৎপর নায়কদের। পূর্ব্বরাগের প্রাচীনত্বের মূলে দেখা যায় : নায়িকা নায়ককে স্বয়ং দর্শন, দূতী প্রভৃতির মুখে তাহার গুণ কীর্ত্তন, চিত্রাদি ও স্বপ্নদর্শন দ্বারা প্রথমে তাহাতে অনুরক্ত হয়। এই পূর্ব্বরাগ হইল নায়কদর্শন অভিলাষ ; পরে তদ্বিষয়ে চিন্তা, সর্ব্বদা তাহার কথা স্মরণ, সখী সমীপে তাহার গুণ কীর্ত্তন, তাহাকে পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মত্ততা, রোগ, মূর্চ্ছা ও পরে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। ইহাই পূর্ব্বরাগের দ্বাদশ অবস্থা ও ইহাকে কামদশা নামেও অভিহিত্ করা হইয়াছে। নায়কের অপ্রাপ্তিতে ক্রমে ক্রমে এই সকল অবস্থা হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত মহাকাব্য 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে পূর্ব্বরাগ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে। নিম্নে সংক্ষেপে একটু বর্ণনা করা যাইতে পারে।

গোস্বামী প্রবর 'উজ্জ্বল নীলমণি' গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার সম্মিলনের পূর্ব্বে দর্শন ও শ্রবণাদিজনিত রতির উন্মীলনকে পূর্ব্বরাগ বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে দর্শনজনিত পূর্ব্বরাগ আবার সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপটে দর্শন এবং স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি বিবিধ।

সাক্ষাৎ দর্শনে :

কিরূপ দেখিলু মধুর মুরতি পিরীতি রসের সার।
হেন লয় মনে এ তিন ভুবনে তুলনা নাহিক আর॥

চিত্রপট দর্শনে :

শুন মাধব আর কি বোলব তোয়।
সো বৃষভানু কুমারীবর সুন্দরী
অহর্নিশি তোয়া লাগি রোয়॥
তুয়া অনুরূপ একপট লেখিয়া
দেহলুঁ তাকর আগে॥
সো রূপ হেরি মূরছি পড়ি ভূতলে
মানই করম অভাগে॥

স্বপ্ন দর্শনে :

মনের মরম কথা, তোমারে কহিএ এথা,
শুন শুন পরাণের সই॥
স্বপনে দেখিলুঁ যে, শ্যামের বরণ দে,
তাহা বিনা আর কারো নই॥

শ্রবণজনিত পূর্ব্বরাগে :

পহিলে শুনলুঁ অপরূপ ধ্বনি কদম্ব কানন হৈতে।
তার পরদিনে ভাটের বর্ণনে শুনি চমকিত চিতে॥
আর একদিনে মোর প্রাণসখী কহিল যাহার নাম।
গুণিগণ গানে শুনিলুঁ শ্রবণে তাহার এ গুণগাম॥

নাম শ্রবণে :

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম॥
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো।
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।

বংশীধ্বনি শ্রবণে :

রাই কহে কেবা যেন, মুরলী বাজায় হেন,
বিষামৃতে একত্র করিয়া।
জল নহে জল জনু, কাঁপাইছে সব তনু,
প্রতি অঙ্গ শীতল করিয়া॥

পূর্ব্বরাগ অবস্থায় নায়ক-নায়িকার মিলন না হওয়ার জন্য পরস্পরের যে ভাব হয়, তাহাকে কহে দশা। এই দশা দশপ্রকার। যথা : লালসা, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ প্রভৃতি। সর্ব্বশেষ মৃত্যুদশা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দশা সমূহের প্রতিকারের পর যদি প্রিয়জনের সহিত মিলন না হয়, তবে ক্রমে মদনবাণে পীড়িত হইয়া মৃত্যুদশাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অধুনা প্রাচ্যজীবনে পূর্ব্বরাগের আর সে কদর দেখা যায় না। কিন্তু পাশ্চাত্যে 'পূর্ব্বরাগ' বা কোর্টশিপ বহুল প্রচলিত ও বিশেষ সমাদৃত। অবশ্যই ইহার প্রধান কারণ নারী-পুরুষের অবাধ মিশ্রণের অপরিমেয় সুযোগ সুবিধা। বর্ত্তমানে আমাদের দেশে পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবকগণই বর বা কণে নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ দিয়া থাকেন ; কাজেই সেইরূপ পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ব্বরাগের সুযোগ আমাদের বর্ত্তমান জীবন-যাত্রায় নাই বলিলেই চলে। পাশ্চাত্যেও অর্থ বা বংশমর্য্যাদাগত অভিভাবক নির্ব্বাচিত বিবাহ যে না আছে তাহাও নয়। কিন্তু পূর্ব্বরাগ অধুনা আমাদের জীবনেও সেই পূর্ব্বের ন্যায় বা পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রচলিত না থাকিলেও ইহা অন্যরূপভাবে নব্যবিবাহিত জীবনে দেখা দেয়। নব্য বিবাহিত কিশোরী বা তরুণী পত্নীর সহিত তাহার স্বামীর কিছুকাল এই পূর্ব্বরাগের অভিনয় চলিয়া থাকে ; যেমন লুকাইয়া পরস্পরের দেখাশুনা করা, পতি কর্ত্তৃক পত্নীর অঙ্গ বা বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করা অথবা সকলের

অজ্ঞাতসারে চুম্বন চেষ্টা প্রভৃতি অনেক ছোটখাটো ব্যাপারের মধ্য দিয় পূর্ব্বরাগের মহিমা বিকশিত হইয়া উঠে। বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করিলে আমরা পূর্ব্বরাগকে যৌন মিলনের উদ্যোগপর্ব্ব হিসাবে ধরিয়া লইতে পারি। প্রকারান্তে ইহা যৌনজীবনের অনেকখানি স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। কারণ পূর্ব্বরাগ মানুষের স্বভাবজ প্রবৃত্তি, ইহা কোন-না-কোনরূপে বিকশিত হইয়া উঠিবেই। প্রাণী-জীবনে বা পশুপক্ষী জীবন হইতেও আমরা পূর্ব্বরাগ বা 'কোর্টশিপের' দৃষ্টান্ত পাইতে পারি। যৌন-মিলনের পূর্ব্বাহ্নে কপোতীর চারিধারে নর্ত্তন গুঞ্জন করিয়া ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া ধরিয়া কপোত তাহার প্রিয়তমার মন ভুলাইবার উদ্দেশ্যে কি যত্নই না করিয়া থাকে। কুকুর, ছাগল, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি জানোয়ারগণও যৌনমিলনের পূর্ব্বাহ্নে পরস্পরের গাত্রাবলেহন, ঘ্রাণ গ্রহণ প্রভৃতিদ্বারা পূর্ব্বরাগের আবেদন জানায়।

নর-নারীর বেশভূষা প্রসাধনাদি কার্য্যকেও পূর্ব্বরাগের অঙ্গীভূত বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। সুগন্ধি দ্রব্যাদির ব্যবহার, অলক্তরাগের ব্যবহার, কপালে টিপ্ কাটা, রকমারী করিয়া কাপড় জামা পরা এবং নায়কের হস্ত, পদ ও কেশ প্রভৃতির পরিচর্চ্চা, প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে নানারূপ মুখরোচক খাদ্যাদি প্রস্তুত করতঃ নিজে বসিয়া খাওয়ানো, হাস্য-লাস্যময় চলাফেরা, বঙ্কিক কটাক্ষপাত, বসনাদি বিত্রস্ত প্রভৃতি কার্য্যদ্বারা পূর্ব্বরাগেরই মহিমা প্রকাশ পাইয়া থাকে।

নর-নারীর যৌনমিলনের পূর্ব্বে পূর্ব্বরাগের প্রয়োজনীয়তা আছে খুবই বেশী। কারণ পূর্ব্বরাগবিহীন যৌনমিলনে আনন্দের ভাগে অনেকখানি ভাঁটা পড়ে। "যৌনসঙ্গম ও যৌনতৃপ্তি" অধ্যায়ে আমি এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বরাগ সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'

গোবিন্দলাল ও ভ্রমরের দ্বারা ও প্রভাত মুখোপাধ্যায় তাঁহার 'নিষিদ্ধ ফল'-এ অনেকটা দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাস কিশোর জীবনে পূর্ব্বরাগের একটা মাধুর্য্যময় বর্ণনা করিয়াছেন—এখানে বাসনার দাবদাহ নাই, আছে স্নিগ্ধ চাঁদের আলো। সত্যিইত বালিকার নব-জীবনে ইহা একটা নূতন খেলাই বটে।

আয় বালিকা খেল্‌বি যদি, এই এক নূতন খেলা,

* * *

পুতুল টুতুল রেখে দিয়ে,
চল বকুলের বনে গিয়ে,
'বৌ বৌ বৌ' খেলি মোরা ফুলল সন্ধ্যা বেলা !

কিন্তু বালিকা বলিতেছে :

না ভাই ! তুমি দুষ্টু বড়,
আঁচল টেনে আকুল কর,
তোমার কেবল ঘোম্‌টা খুলে উদ্‌লা করে ফেলা !

কিশোর প্রেমিক বারণ করিতেছে :

"চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌, কস্‌নে কারে, এই এক নূতন খেলা।"

তারপর ক্রমান্বয়ে কবিতাটী প্রেমিকের আহ্বান ও প্রেমিকা-বালিকার মৃদু আপত্তি ও 'নূতন খেলা'র হাবভাব বর্ণন এবং কিশোর প্রেমিকের তাহাতে বাধাদান ও সেকথা কাহাকেও প্রকাশ করিতে বারণ করিতেছে। নিম্নে কেবল বালিকা কর্ত্তৃক 'নূতন খেলা'র হাবভাব বর্ণন অংশই লিপিবদ্ধ করিতেছি :

না না, আমি তোমার সনে,
যাবনা আর বকুল বনে,
চক্ষে মুখে বুকে তুমি ফুল দে' মার ডেলা !

তোমার কেবল কুসুম খোঁজা
কানে গোঁজা, খোপায় গোঁজা
আমি অমন বইতে নারি ফুলের বোঝা মেলা !
তোমার সনে গেলে ছাই,
সকাল আস্‌তে ভুলে যাই,
ভয়ে মরি একলা যেতে সবুজ সন্ধ্যা বেলা !
তুমি কেবল বনে যেয়ে,
মুখের পানে থাক' চেয়ে,
লজ্জা করে ! আর যাবনা নিত্যি সন্ধ্যা বেলা !
তুমি বড় লক্ষ্মীছাড়া,
ছেড়ে দাওনা খাড়াক্‌খাড়া,
আকুল করে বকুল গাছে কোকিল ডাকে মেলা !

তারপরও আবার সেই আহ্বান :

"আয় বালিকা খেলবি যদি এই এক নূতন খেলা !"

আবার প্রেমিকা বালিকার সলজ্জ মৃদু আপত্তি :

না ভাই তুমি দুষ্টু বড়
একটী বলে আরটি কর
ফাঁকি দিয়ে কোলে নিয়ে চুমো খেয়ে গেলা !
" চুপ চুপ চুপ, কস্‌নে কারে—এই এক নূতন খেলা !"

এইবার পূর্ব্বরাগের পরিণত অবস্থা নায়িকার অভিসার বেশ-সজ্জার একটা প্রাচীন দৃষ্টান্ত আমরা কবিবর চণ্ডীদাসের অমর কাব্যগ্রন্থ হইতে গ্রহণ করিতে পারি। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে অধুনা বিলাস বেশভূষা ও প্রসাধন-কলার চর্চ্চাও সেই প্রাচীন পূর্ব্বরাগের আধুনিক সংস্করণ। শ্রীরাধার অভিসারবেশ বর্ণনে কবি চণ্ডীদাস বলিয়াছেন :

সুখময়ী রাধা বেশ বানাইল,
বন্ধন করিল জাল।
নানা ফুলদাম, বেড়ি অনুপাম,
দিয়া মুকুতার মাল॥
দু'সারি মাণিক, তার পাশে পাশে
প্রবাল গাঁথিয়া মাল।
কণক চম্পক কবরী বেড়ল,
ভ্রমরা গুঞ্জরে ভাল॥
সিঁথায় সিন্দুর, তার মাঝে মাঝে,
দিয়াছে চন্দন ফোঁটা।
যেন শশধর, চৌদিকে বেড়ল,
কি তার কহিব ঘটা॥
নাসার বেসর, অতি মনোহর
হাসিতে মুকুতা হাসে।
কণক কাঁচুলি, তার পরিপাটি,
মুকুতা গাঁথনি পাশে॥
ঘাঘর কিঙ্কিনা, বাজে ঝিণিরিণি,
পিঠেতে ঝুলিছে ঝাঁপা।
তাহার মাঝারে, গাঁথি থরে থরে,
সুবাস কণক চাঁপা॥
নীল উরণী, ভুবন মোহিনী,
সোনার নুপুর পায়।
চলিতে চরণে, পঞ্চম বাজই
হংস-গমনে যায়॥

আধুনিক জীবনেও প্রেমিক পুরুষ তাহার প্রিয়তমার অভিসারিকা বেশের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে :

'প্রাণ সঁপেছি তোমার 'পরে—মন ছিল মোর তাও নিতে
কুরঙ্গিণীর রঙ্গ মাখা শর জুড়েচো ঐ চাউনিতে,
চপল তোমার আঁখির ঠারে ব্যাকুল আমার মন ভোলা,
চাঁদমু' হেরে চাঁদ শিহরে—শাঙন-ঘন কুন্তলা,
পাখীর রাজা লাজ পেয়ে যায় তোমার নাসার রূপ দেখি
ফটিক সাদা নোলক দোলে, রূপসায়রে ডুবতে কি ?
সরস তোমার ঠোঁট দুখানি রক্তিমাতে রঞ্জিত
কোরবে কি সই, অধর 'পরে চুম্বনে মোর বঞ্চিত ?
কোমল তোমার গাল দুটীতে লাল গোলাপের ফুল ফোটে
প্রাণের মাঝে ঢেউ খেলিয়ে কর্ণে তোমার দুল লুটে ;
কণক চাঁপার ফুল ফোটেলো, তোমার সোনার অঙ্গুলে
হাতের পাতা রঙ করা তায় রক্তজবার রঙগুলে,
কণ্ঠস্বরে চঞ্চরি চুপ—মঞ্জুলতার বীণ ঝরে
কুন্দধবল দন্তবিহগ বন্ধ অধর পিঞ্জরে।

* * * * * * *

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণও প্রেমকে লইয়া নানারূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। স্যার হার্ব্বার্ট স্পেন্সার প্রেমের অন্তর্নিহিত নয়টী সংজ্ঞার নির্দ্দেশ করিয়াছেন : The Physical impulse of sex : The feeling for beauty : Affection : Admiration and respect : Love of appobation : Self-esteemed Propmictony feeling : Extended liberty of action from the absence of personal barriers : Exaltation of the sympathies :

অতএব ইহার মাঝেও পূর্ব্ববর্ণিত বিষয়ের অনেকটা প্রতিধ্বনি আছে। পণ্ডিত প্রবর ক্রলি সাহেব বৈষ্ণবকাব্যের ন্যায়ই প্রেমকে জীবনের মত রহস্যময় ও বর্ণনাবিহীন বলিয়াছেন। তবে প্রেম যে মানবের জাতিগত চেতনা হইতে উদ্ভূত—যদিও ইহার লীলাখেলা সমাজগত জীবনেই, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ মনীষী বার্টাণ্ড রাসেল তাঁহার 'ম্যারেজ এ্যাণ্ড মরেল' গ্রন্থে বলিয়াছেন :—Love appears to be usually kindled by sexual appetite. অতএব প্রেম যে কামনার দুয়ারে বাঁধা, এখানেও তাহার সমর্থন পাওয়া গেল।

আলোচ্য অণুঅধ্যায়ে প্রেম, কাম ও বিবাহ লইয়া যে আলোচনা করা হইল তন্মধ্যে আমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, বিবাহিত জীবনের মাঝেই যাহাতে কামনার মধ্যে প্রেমের-ফুল সুন্দরতর রূপে প্রস্ফুটিত হইতে পারে তাহা সকলের জীবনেই কাম্য হওয়া উচিত। এই লইয়া দ্বন্দ্ব মীমাংসায় পাতার পর পাতা ব্যয় করিয়া লাভ নাই। মোটামুটিভাবে প্রেম ও কামের সীমারেখা দেখাইয়া ও উভয়ের সংযোগ ঘটাইয়া ইহার ভাববৈচিত্র্য সকলও দেখাইয়াছি—এই সকল ভাবসমূহ প্রাচীন কাব্য সাহিত্যের দ্বারা যাহা প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আজিও তাহা আধুনিক নব নব রূপে রূপান্তরিত হইয়া অনেক নর-নারীর জীবনে প্রকটিত হইয়া উঠিতে দেখা যায়। হয়ত সকল ভাববৈচিত্র্য বর্ত্তমান কর্ম্মবহুল জীবনযাত্রায় বিকশিত হইবার অবকাশ পায় না; কিংবা অধুনা রুচির সঙ্গেও খাপ খায় না, তথাপি মূল জিনিষ প্রতি নর-নারীর জীবন ক্ষেত্রে উপ্ত অবস্থায় সঞ্চারিত হইয়াই আছে। সুযোগ আসিলে তাহা ফলে ফুলে সুশোভিত হইয়া অনেক নর-নারীর জীবনে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া উঠে, কাহারও হয়ত জীবনভোর উহা সুপ্ত অবস্থায়ই রহিয়া যায়।

সর্ব্বশেষে আমি প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রসিদ্ধ কামকলাবিদ্ মহর্ষি বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্' গ্রন্থ হইতে দুই একটী উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াই এই অণু-অধ্যায়টীর পরিসমাপ্তি ঘটাইব।

মহর্ষি বাৎসায়ন বলিতেছেন: 'পুত্র-কন্যাগণ কলাবিদ্যা অধ্যয়নান্তে অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হইবে। যৌবনোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইবে। পরস্পর অনুরাগবশতঃ বিবাহের ফলে যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সে উৎফুল্লচরিত, অসঙ্কীর্ণচেতা, কর্ম্মবীর ও উৎসাহশীল হয়।' তবে তিনি পরস্পর অনুরাগ বশে যে বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ৮ প্রকার বিবাহের মধ্যে গন্ধর্ব্ব বিবাহের কথাই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজে উহার প্রচলন প্রায় নাই বলিলেই চলে; যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রণয়-বিবাহের প্রচলন আছে। কাজেই অভিভাবক নির্ব্বাচিত বিবাহিত জীবনেও যাহাতে দম্পতির মধ্যে অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে পারে তাহারই জন্য যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আর এ ক্ষেত্রে অভিভাবক-গণেরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ছেলেমেয়ের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী তথা প্রেমের সঙ্গী ও সঙ্গিনী নির্ব্বাচনের বেলা যেন তাঁহারা অযোগ্য নির্ব্বাচন না করেন। যোগেযোগ্যার যাহাতে মিলন ঘটে, ধীর স্থির হইয়া এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া তবেই এ কার্য্যে অগ্রসর হইবেন। জানি, ইহা আমাদের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় খুবই কঠিন ব্যাপার সন্দেহ নাই, তথাপি অনেক ক্ষেত্রে প্রলোভনের মোহে বশীভূত হইয়াই অনেক অভিভাবক বা অভিভাবিকাগণ অযোগ্য নর-নারীর মিলন ঘটাইয়া থাকেন। কিন্তু আজ এ সম্পর্কে আমাদের অভিভাবক ও অভিভাবিকাগণের সক্রিয় সচেতন হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

## প্রেমের ক্ষেত্রে নর ও নারীর প্রভেদ ঃ

প্রেমের ক্ষেত্রে বা ভালবাসার রাজ্যে নর ও নারীর অনেক পার্থক্য লক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে প্রসিদ্ধ জার্মান যৌনতত্ত্ববিদ্ ডাঃ মেগশাস্ হার্সফিল্ড বলিয়াছেন ঃ 'অধিকাংশ নারী ভালবাসা পাইতে চান ও অধিকাংশ পুরুষ ভালবাসা দিতেই ইচ্ছুক। নারী সন্তান, সন্তানস্থানীয় কিংবা স্বামীর প্রতি সন্তানভাব আরোপ করিয়া প্রাণ-মন সমার্পণান্তর ভালবাসিতে চায়।' পৃথিবীর খ্যাতনামা লেখিকা এলেন কী মহাশয়া বলেন ঃ 'নারীর ভালবাসা আত্মা হইতে উদ্বুদ্ধ হইয়া দেহের মাঝে ছড়াইয়া পড়িতে চায় বটে, কিন্তু অনেক সময় তাহা পারে না ; এই দিক দিয়া দেখিতে গেলে পুরুষের দাম্পত্য-প্রণয় কিন্তু শরীরের মধ্য হইতে জন্ম লইয়া আত্মার মাঝে পৌঁছিতে চায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাহা পারে না। দাম্পত্য প্রণয়ের এই প্রকার প্রভেদের জন্য মানুষের দুঃখ-কষ্টের অন্ত নাই।' নারীর প্রেম ভাবপ্রবণ। নারী পুরুষকে তাহার মনপ্রাণ ও চেতনা দিয়া ভালবাসে ; কিন্তু পুরুষের প্রেম সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়জ।

পুরুষ ও নারীর ভালবাসা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ যৌনতত্ত্ববিদ্ ক্রাফট্ এ্যাবিং মহাশয় তাঁহার 'সাইকোপ্যাথি অব্ সেক্সুয়ালিস্' গ্রন্থে বলিয়াছেন ঃ To woman love is life, to man it is the joy of life অর্থাৎ নারীর পক্ষে প্রেমই জীবন, আর পুরুষের বেলা উহা জীবনকে উপভোগ করিবার। প্রেমিক কবি লর্ড বায়রণ তাঁহার 'ডন জুয়ান' গ্রন্থে ব্যক্ত করিয়াছেন ঃ

Man's love is of man's life a thing apart ;
'Tis woman's whole existence.

ধর্ম্ম, কর্ম্ম, প্রীতি, প্রেম, আত্ম-বিসর্জ্জন প্রভৃতি নারীকে যে আদর্শ স্থানে নীত করে, পুরুষ সাধারণতঃ তাহার কোন নাগাল পায় না। মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যারূপে যে ভাবেই হউক নারীর-প্রেম নরের অপেক্ষা

অনেক শ্রেষ্ঠ, মহান ও পবিত্র। তাহা ছাড়া সকলের উপর দেখিতে গেলে নারীর শ্রেষ্ঠ দান মাতৃস্নেহ—যাহা হইতে পরার্থপরতা ও বিশ্বপ্রেমের সৃষ্টি হইয়াছে।

মানব শিশুর মত অসহায় জীব আর পৃথিবীতে নাই। সেই অসহায় জীবকে স্নেহ, ভালবাসা, দয়া প্রভৃতি নারী-হৃদয়ের সব কিছু সুকুমার বৃত্তি উজার করিয়া নিঃশেষে আত্ম-বিসর্জ্জনের দ্বারা পালন ও পরিপুষ্ট করিয়া তুলিতে হয়। এই দিক দিয়া নারীর সঙ্গে পুরুষের আকাশ-পাতাল প্রভেদ।

বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম যৌনতত্ত্ব সংগ্রাহক হেবলক্ এলিস্ নারী ও পুরুষের আপন আপন স্বভাব বশে যৌনসঙ্গী নির্ব্বাচন ক্ষেত্রে যে বিরোধী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া থাকেন তাহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন: 'স্বভাব বশে পুরুষ যে নারীকে পছন্দ করে, সে নারী সুন্দরী, কোমলাঙ্গবতী, লাবণ্যময়ী, মৃদুভাষী ও কোমলস্বভাবা হওয়া চাই; কিন্তু নারী আপন স্বভাববশে যে পুরুষকে পছন্দ করে, সে পুরুষ বীর্য্যবান, তেজী, বলশালী এমন কি লোমশ হইলেও ক্ষতি নাই।' অবশ্যই এই স্বভাবের মূলে প্রকৃতির কার্য্যকারিতা অনেক ক্ষেত্রে প্রতিপন্ন হইলেও অধুনা সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই স্বভাবজ স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। অর্জ্জিত স্বভাব বশে অধুনা নর-নারীর স্বভাব যে যুগধারার ন্যায়ই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, জগৎ-প্রসিদ্ধ মনোস্তত্ত্ববিদ্ ডাঃ সিগমুণ্ড ফ্রয়েডের নিম্ন বক্তব্যে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে। ফ্রয়েড বলিয়াছেন, 'আধুনিক অনেক নারীই নারীসম্পর্কশূন্য পুরুষকে পছন্দ করেন না—যে পুরুষ নারীকে ভালরূপ জানেন তাহাকেই পছন্দ করেন খুব বেশী। কিন্তু এইদিক দিয়া পুরুষের মনোভাব সম্পূর্ণভাবে বিপরীত।' অর্থাৎ ফ্রয়েড সাহেব বলিতে চাহিয়াছেন যে, পুরুষ এ বিষয়ে এখনও সেই প্রাচীন মনোবৃত্তিসম্পন্ন।

কবিবর মিলটন নর-নারীর ভালবাসার বিভিন্নতা সম্পর্কে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন : 'নারীর জীবনে ভালবাসার স্থান যত অধিক, নরের তাহা নয়।' এইচ, জি, ওয়েলস্ বলেন : 'নারী তার সারা জীবনভোরই ভালবাসেন।' প্রসিদ্ধা লেখিকা এলিন কী মহাশয়া বলিতেছেন : দাম্পত্য ক্ষেত্রে নারীর যৌনানুভূতি প্রায় দেহের সর্ব্বস্থানে পরিব্যাপ্ত ; কিন্তু নরের একই স্থানে সীমাবদ্ধ থাকায় তাহার বিবাহের পরেও কোর্টশিপের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

## দাম্পত্য জীবনে আধুনিক সমস্যা ও নারীপ্রগতি :

অধুনা নর-নারীর, সামাজিক শুভ-অশুভ ব্যাপারে দায়িত্ব-সচেতনতা খুবই কম ; আর তাহারা সব সময়েই সমাজ, সংসার ও রাষ্ট্র হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখিয়া চলিতে চান। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, অনুরাগ বা আসক্তি। আজ এই দুইটীতেই আসিয়াছে অবসাদ, শৈথিল্য এবং ভাঙ্গন। কাজেই আজ দেশে নারী নির্য্যাতন, নারীহরণ ও বিবাহ-বিচ্ছেদেরও প্রাচুর্য্য দেখা যায়। কিন্তু ইহার জন্য দোষ দেওয়া হয় বিবাহকে। কারণ বিবাহিত-জীবনের ট্র্যাজেডীই আজ ঘনীভূত হইয়া বিক্ষোভের আকারে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে ফেনিল হইয়া নানা সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু বিবাহ যে নর-নারীর জীবনকে ব্যর্থ করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই, তাহা অধুনা ভাব-দরিদ্র নর-নারীর বুঝিবার মত শক্তি নাই—তার দৃষ্টি-বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে নানা কারণে।

অনেকের ধারণা এই—বিবাহ ব্যাপারটা একটা লটারী খেলা মাত্র। খুব অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানই এই বিবাহ-লটারীতে মনের মত সঙ্গী লাভ করিয়া থাকে এবং বেশীর ভাগেরই লাভ হয় সান্ত্বনামূলক উপহার—যাহার মূল্য প্রায় নাই বলিলেই চলে।

আবার অনেকে বলিতেছেন : বিবাহ জিনিষটার মধ্যে স্বর্গীয় কিছু নাই এবং ইহা লটারীও নয়। বিবাহকে স্বর্গীয় ব্যাপার মানিয়া লইয়া ইহারই যুপকাষ্ঠে আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছে এমনি বহু নর-নারীর পাঁচ, দশ, পনেরো বছরের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াও দেখা গিয়াছে যে, তাহাদের পরবর্ত্তী জীবন মোটেই সুখের ও শান্তির হয় নাই ; আর বিবাহিত-জীবনে তাহারাই সবচেয়ে ব্যর্থতা সঞ্চয় করিয়াছে, যাহারা বিবাহের পূর্ব্বে ছিল অতিশয় নীতিবাদী ও সংযমী। তাই বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের বহু নষ্টনীড়ের কাহিনী আজ প্রকাশ্য ও উপভোগ্য আলোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই কারণেই আজ বিবাহ ব্যাপারটা একটা গুরুতর সমস্যার বিষয় হইয়া দেখা দিয়াছে।

আসলে কিন্তু বিবাহ একটা সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় নাই। বিবাহের যুপকাষ্ঠে আত্ম-বিসর্জ্জন না করিলেই কি জীবন সুখের হইয়া উঠিত? প্রকৃতপক্ষে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে দাম্পত্য জীবনে যৌন-অজ্ঞতা এবং তাহারই ফলে নর-নারীর বিবাহিত-জীবন ব্যর্থতার গ্লানিতে ভরিয়া উঠে। তাই এই কারণেও বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা, নারীহরণ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি আজ ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনকে ফেনিল করিয়া তুলিয়াছে। এইগুলিকে সহজেই এড়ানো যাইতে পারে যদি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নরনারীর যৌন-সচেতনা গভীর হয় এবং ধর্ম্মান্ধতায় এই প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না হয়। অধুনা দাম্পত্য-জীবন ব্যর্থ হইবার মূলে যে সকল কারণগুলি প্রকটিত হইয়া উঠে তাহা এই : যৌন-অজ্ঞতা, যৌন-প্রতিযোগিতা, অত্যুগ্র-যৌনক্ষুধা এবং বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সমস্যা। এইগুলিকে অতিক্রম করিতে পারিলে দাম্পত্য-জীবন সুখের হইতে বাধ্য।

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম যৌনতত্ত্ববিদ্ ডাঃ হেবলক্ এলিস্ সফল-বিবাহের যে সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, দাম্পত্য-জীবনে এইগুলির সমন্বয় ঘটিলে

বিবাহিত-জীবন কখনো সমস্যাবিহীন ও সুখের না হইয়া পারে না। তিনি বলিয়াছেন: The happiest marriages are those which are entered into with a full knowledge of the art of love and the technique of contraception, the marriages in which artistry and understanding are props to instinct, the marriages in which the natural joy and pagan playfulness of sex have been preserved.

প্রেম ও বিবাহের ব্যাপারে যৌনঅজ্ঞতার মত মারাত্মক আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা ব্যাপারে অনেক পশুদেরও যতখানি সাধারণ জ্ঞান আছে, অনেকানেক শিক্ষিত নর-নারীর মধ্যেও তাহা থাকিতে দেখা যায় না। প্রাণীজগতে পরস্পর মিলনের ব্যাপারটা খুবই সহজ, সরল ও সঙ্কোচবিহীন। অত্যুগ্রতার আমল তাহারা দেয় না বলিলেই চলে। যৌনমিলনের উপযুক্ত মরসুম সময়েই কেবল পুরুষপশু নারীপশুকে পাইতে ব্যাকুল হয়। আর এই মিলন-সাপেক্ষ-মরসুম পশুবিশেষে বছরে একবার হইতে ছয়বার পর্য্যন্ত আসে……তখন পুরুষপশু চায় নারীপশুকে, নারী-পশুও পুরুষপশুকে গ্রহণ করে অঙ্গ-সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া। যৌনতার কোন প্রতিযোগিতা তাহাদের মধ্যে নাই। কেবল প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হইয়াই তাহারা এইপথে অগ্রসরমান হয়। ইহাই তাহাদের যৌন-মিলনের সাদাসিধা প্রণালী—যৌনমিলনে সফলতা বা ব্যর্থতার কোন প্রশ্নই এখানে উঠে না।

যৌন-আবেদনের পূর্ণ চরিতার্থতাই দাম্পত্যজীবনের পরিপূর্ণ সুখ-শান্তির একমাত্র উপায়। অথচ প্রাণীজগতে যাহা সহজ সুন্দর ও সঙ্কোচ-বিহীন ব্যাপার, মানুষের জীবনে তাহা ঠিক বিপরীত। যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন: "Human female has no definite rutting period, and will accept her male at any time অর্থাৎ, মানবজীবনে নারীর যৌনপ্রকৃতি এইরূপ যে, যৌনক্ষুধা উপভোগের

তাহার কোন ধবাবাধা সময় নাই—সকল সময়েই সে তাহার পুরুষসঙ্গীকে গ্রহণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না।" ইহা ছাড়াও লক্ষ্যণীয় এই যে, মানুষের ক্ষেত্রে বহুকাল হইতেই যৌনমিলন ব্যাপারটা নিছক প্রজনন উদ্দেশ্যেই ঘটেনা—অধুনা আনন্দলাভের প্রাধান্যই সবচেয়ে প্রবল।

পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া অনেকগুলি সামাজিক প্রতিবন্ধকতার জন্যও যৌনতৃপ্তি প্রকৃতই তৃপ্তিব হইয়া উঠিতে পারে না অর্থাৎ সামাজিক, নৈতিক, সাংসারিক ও অর্থনৈতিক দায় স্বীকার করিয়া তবেই যৌনদায় আমাদের নর-নারীর বর্ত্তমান জীবন-যাত্রায় স্বীকার করিতে হয়—তখনই তাহারা যৌনমিলনের অবকাশ পাইয়া থাকে। আজ আমাদের মিলনকে মধুময় করিয়া তুলিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে একটা রফা করিয়া লওয়াও প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজন প্রেমকলা তথা যৌনকলা শিক্ষা করা।

আমাদের দেশের মেয়েদের কথাই ধরা যাউক। বিবাহকালীন তাহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সকল বিষয়েই সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থাকে। দেহগত, সমাজগত, মনোগত কিংবা অর্থনৈতিক—কোন বিষয়েই তাহারা শিক্ষালাভ করে না। জীবনের দায়িত্ব বিশেষ করিয়া যৌন-মিলনের দায়িত্ব সম্পর্কে তাহাদের আত্মসচেতনতা থাকে না বলিলেই চলে এই অবস্থার মুলে সমাজের গোড়ামীও আছে অনেকখানি। কিন্তু আজ সমাজকে প্রশস্ত মন লইয়া নরনারীর দাম্পত্য-সমস্যার সমাধান-পথের প্রতিবন্ধকতা দুর করিবার সুযোগ দিতে হইবে এবং সেইসঙ্গে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের তথা বয়স্ক ছেলেদেরও যৌনশিক্ষা দিবার ভার লইতে হইবে। এ বিষয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইলে অথবা বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই অন্যান্য শিক্ষনীয় বিষয়ের সহিত এ বিষয়েও শিক্ষা দিবার ভার লইলে সমাজ বাস্তবিকই উপকৃত হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে নর-নারীর দাম্পত্য-জীবনও ক্রমে ক্রমে সমস্যাবিহীন হইয়া উঠিবে।

মেয়েদের সম্পর্কে যে কথা বলা হইয়াছে, ছেলেদের সম্পর্কেও সেই একই কথা। যৌন-অজ্ঞতা মেয়েদের জীবনেও যেমন, ছেলেদেরও প্রায় ততখানিই। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, কোন কোন যুবক বিবাহের পূর্ব্বে যেটুকু যৌন-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তাহা অনেক সময় অজ্ঞতা অপেক্ষাও মারাত্মক হইতে দেখা যায়; অর্থাৎ অনেকে যৌন-অভিজ্ঞতা লাভ করে বারাঙ্গনা সহবাসে অথবা কোন কামাভিজ্ঞা রমণীর সংস্পর্শে আসিয়া। ফলে প্রথম মিলন রজনীতেই যখন 'অভিজ্ঞ' পুরুষ অনভিজ্ঞ নববধূতে নিছক পাশবিক লালসা চরিতার্থ করিতে অগ্রসর হয়, তাহাতে নববধূ অনেক সময়ই দেহ-মনে আহতা হন। তাহা ছাড়া উভয়ের পক্ষেই আসল যে বস্তু লাভ করা এই দাম্পত্য-মিলনের উদ্দেশ্য, তাহারই ঘটে অপমৃত্যু! উভয়ের সখ্যভাবে যৌন-সম্মিলনের দ্বারা যে প্রেম-কুসুম বিকশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা কুঁড়িতেই বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম মিলন-রজনীতেই যে বিক্ষোভ ও বেদনার সঞ্চার হয়, পরবর্ত্তী জীবনভোর তাহারই জের চলে। তখন দাম্পত্য-জীবন হইয়া উঠে নিছক ইন্দ্রিয়চরিতার্থ ব্যাপার—সুতৃপ্ত মিলনের মধ্য দিয়া হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত হইবার কোন্ অবকাশ পায় না। কাজেই দাম্পত্য জীবনকে যদি প্রকৃত সুখ ও শান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিতে হয় তবে প্রত্যেক বিবাহ-যোগ্য নর-নারীর প্রয়োজন যৌনবিজ্ঞান, যৌনসখ্যতার মনোস্তত্ত্ব, প্রেম-কলা ও জন্ম-নিয়ন্ত্রণ বিধি সম্পর্কে ভালরূপ জানা। এই সম্পর্কে বিশেষ রূপে জ্ঞানার্জ্জন না করিয়া অজ্ঞতাবশে কিংবা কুজ্ঞান লাভে যে দাম্পত্য মিলন ঘটে তাহা সুখের হইতে দেখা যায়না। শতকরা প্রায় আশীটী ক্ষেত্রে সেই কারণেই আজ দাম্পত্য-জীবনে নানারূপ সমস্যার উদয় হইয়াছে।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি সমযৌনপ্রাণতা না থাকে, তাহার ফলে স্বামী যেমন স্ত্রীর দায়িত্বের অংশ লইতে চায় না, ঠিক তেমনি স্ত্রীও

স্বামীর সুখ-দুঃখের অংশ লইতে অস্বীকার করে। তখন স্ত্রীর উপর স্বামী যৌনপ্রভুত্ব স্থাপন করিতে যাইয়া যে অশান্তির সৃষ্টি করে, উহার আর নিবৃত্তি হইতে চায় না। অধুনা দাম্পত্যজীবনে এই যৌনপ্রতিযোগিতা যাহা প্রাণীজগতেও দেখা যায়না—ইহাও দাম্পত্য সমস্যার অন্যতম কারণ। স্ত্রী আমারই যৌনতৃপ্তির জন্য, স্বামীর এই বোধজ্ঞানকে মন হইতে দূর করিতে হইবে। স্ত্রী যেমন আমার যৌনতৃপ্তির জন্য, তেমনি আমিও স্ত্রীর যৌনতৃপ্তির জন্য সম্মিলিত হইয়াছি, এই বোধ সক্রিয়ভাবে জাগ্রত করিতে হইবে। যতদিন উভয়ের মধ্যে সখ্যভাব না জাগিবে, যতদিন না পরস্পর পরস্পরকে সহচর-সহচরী ভাবিতে শিখিবে ও যৌনপ্রতিযোগিতার দুর্দ্দমনীয় পাশবিকতার অবসান না ঘটিবে, ততদিন যৌনজীবনের যত কিছু মাধুর্য্য ধ্বংস হইতে বাধ্য এবং দাম্পত্য-জীবনে অশান্তির ঝড় বহিবে। আমাদের সামাজিক অব্যবস্থার জন্যও স্ত্রীকে পুরুষের তাবেদার হিসাবে গণ্য করা হয়; কিন্তু আজিকার সংগ্রামবহুল জীবনযাত্রায় ইহা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নহে ও সামাজিক কল্যাণেরও ঘোর পরিপন্থী। হিন্দুর আর্য্য বিবাহের মন্ত্রে বরের মুখ দিয়া যে কথা উচ্চারিত হয়:

'হে বধু! তোমার হৃদয় আমার হৃদয় হউক, আর আমার এ হৃদয় তোমার হৃদয় হউক।'

'হে সপ্তপদগমনকারিণী কন্যে! তুমি আমার সহচারিণী হইলে, আমি তোমার সখ্যপ্রাপ্ত হইলাম।'

এই সকলের অর্থ কি এবং ইহার আদর্শই বা অধুনা দাম্পত্য-জীবনে কোথায়? অধুনা দাম্পত্য সমস্যার জন্য আমাদের অজ্ঞতাই দায়ী নহে কি—ইহার জন্য বিবাহাদর্শকে দোষারূপ করা চলেনা।

নর-নারীর দাম্পত্য জীবনে তথা যৌনজীবনের প্রধান অবলম্বন হইল প্রেম। কামনার মধ্য দিয়া যদি নর-নারী প্রেমের রাজ্যে উন্নীত হইতে না

পারে তবে দাম্পত্য-জীবন ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইবেই। নারীর আত্মদানকে পুরুষ যদি নিজের আত্মদানে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে, তবে দাম্পত্য-জীবন ব্যর্থ হইবে না কেন? নারীর আত্মদানকে পুরুষ যদি নিজের আত্মদানে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে না পারে তবে বিবাহিত জীবনে কিংবা অবাধ মিলনে, কোনটার মধ্যেই চিরস্থায়ী সুখ শান্তির আশা করা বাতুলতা মাত্র।

অধুনা নারী-প্রগতির ফলে দাম্পত্য-জীবনে যে আঘাত আসিয়াছে তাহার ফলেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে। অন্যান্য বিষয়ের মত দাম্পত্য-জীবনেও পুরুষের দায়িত্ব যতটুকু, নারীগণও তাহার চেয়ে বেশী কিছু দায়িত্ব লইতে রাজি নহেন। কিন্তু তাহা যে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে সেকথা উগ্রপ্রগতিশীলা নারীসমাজ ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান না। তাঁহারাও চাহেন পুরুষের ন্যায়ই দাম্পত্য-জীবনের হালকা দায়িত্ব পালন করিতে, পুরুষের সকল কার্য্যে নিজেদের নিয়োগ করিতে এবং পুরুষের সমান অধিকার প্রাপ্ত হইতে। কিন্তু দাম্পত্য-জীবনে ইহা কিছুতেই সম্ভব নয়; কারণ গর্ভ-সঞ্চার হওয়ামাত্র দেহে ও মনে নারীর কর্ত্তব্য বাড়িয়াই চলে এবং উহার বিকাশ গভীরতর ভাবে পরিণত হয়।

এ সম্পর্কে আধুনিকা উগ্র প্রগতিশীলা নারী-সমাজকে লক্ষ্য করিয়া সুপ্রসিদ্ধ মনোস্তত্ত্ববিদ ও যৌনতাত্ত্বিক ডাঃ ডব্লিউ-ম্যাগডুগাল যে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলিতেছেন: "হে নারী! যে সব ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী তোমাদের বলিয়া থাকেন যে, নারীর শারীরিক গঠনের স্থূল প্রভেদ ভিন্ন অন্য কোন প্রভেদ নাই, কদাচ তাহাদের কথায় বিশ্বাস করিও না। দাম্পত্যজীবনে নারী ও পুরুষে ঘোরতর প্রভেদ আছে এবং সেই বুঝিয়া

তোমরা পুরুষ হইবার বাসনা ত্যাগ কর। প্রকৃতির বিধানানুসারে নরের সঙ্গে তোমার প্রভেদ অনেকখানি। পুরুষ ও তোমার মাঝে প্রকৃতি যে সীমারেখা টানিয়া দিয়াছে, তাহা অতিক্রম করার সাধ্য তোমার নাই। নারীর পুরুষের সমান হইবার স্বপক্ষে অধুনা যে সকল বড় বড় কথার মিথ্যা চটকে যাহারা তোমাদের ভুলাইতে চায়, তাহাদের সেই কথার সম্মোহনে ভুলিও না; কদাচ ভাবিও না যে তোমার পদচ্যুতি ও স্বামীর পদচ্যুতি একই জাতীয় অপরাধ। ইহা মনে রাখিও, পুরুষের ব্যভিচার অপেক্ষা তোমার কৃত ব্যভিচার অনেক বেশী মারাত্মক।" "নর ও নারীর প্রভেদ সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও, নারী যে কেবলমাত্র নর হইতে আকারে ছোট ও কোমলস্বভাবা, শুধু তাহাই নয়; তাহার জীবনের ভারকেন্দ্র কতকগুলি সমতালে চালিত দাম্পত্য-বৃত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর নারী যে নরকে শ্রেষ্ঠ ও ভাগ্যবান মনে করার ফলেই তাহাকে অনুকরণ করে, ইহার ফল অনেক সময় হাস্যাস্পদ হইত যদি না মারাত্মক হইবার সম্ভাবনা থাকিত।"—হেবলক্ এলিস্।

কাজেই নারীর বিশিষ্ট জৈব প্রকৃতির জন্য বাহ্য জীবনে তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ কিছুতেই পুরুষের সমান হইতে পারে না। তাহার মানে এই নয় যে নারীর কর্ম্ম ও চেষ্টার পরিধি মাতৃত্বে ও পরিবারের ধাত্রীত্বেই সীমাবদ্ধ হইবে; ইহার মানে ইহাও নয় যে নারী তাহার জৈব প্রকৃতিকে জীবনে অস্বীকার করিতে পারে না। এ অস্বীকৃতিতে কোন অমর্য্যাদাও হয়ত নাই। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই একটা প্রতিক্রিয়ার উগ্রতা ও অসত্যতা আছে। নারী আজ যে পুরুষের নিকট হইতে ব্যক্তি-স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া নিজেদের বিদ্রোহিনী বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাঁহারা সেই সঙ্গে বিস্মৃত হইয়াছেন যে, ব্যক্তিকেন্দ্রগ পুরুষ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ব-সভ্যতা ও বিশ্ব-সাধনার আজ কি শোচনীয় পরিণাম!

মানব-সভ্যতার ঘোর দুর্দ্দিনে আজ যদি কোন বাণী বজ্রনির্ঘোষের মত আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইয়া উঠে: 'মানুষ, তোমার অন্তর-জীবনে তুমি স্বাধীন হইতে পার, কিন্তু বাহ্যজীবনে ব্যক্তিসর্ব্বস্ব হইবার স্পর্দ্ধা রাখিও না।' আমাদের প্রগতিশীলা নারীসমাজের আজ এই ব্যক্তিকেন্দ্রগ মানব-সাধনার শোচনীয় পরিণাম মনে রাখিলে নারীর জৈবেতর চিরন্তন মহিমাকে প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির আন্দোলনকে আজ আর এমন করিয়া প্রতিক্রিয়ার আতিশয্যে ফেনিল করিয়া উঠাইত না।

বর্ত্তমানে দাম্পত্যের বিরুদ্ধে সব চাইতে যে কঠোর আঘাত আসিয়াছে, তাহার উৎপত্তি আধুনিক নর-নারীর দুর্নিবার-আকর্ষণমূলক প্রেমের আদর্শে। ইয়োরোপের নবযুগের মন্ত্রদাতা বিদ্রোহী দার্শনিক নীট্‌শে বলিতেছেন: 'লোকে এখন যাহাকে প্রণয়-বিবাহ (love-matches) বলে, তাহার জনক হইতেছে মিথ্যা, আর জননী হইতেছে প্রয়োজনের তাড়না।' আধুনিক উগ্রপন্থিগণও সে কথা স্বীকার করিতেছেন যে, প্রেমশুদ্ধ হইয়া অতি অল্প সংখ্যক স্ত্রী-পুরুষেরই বিবাহ হইয়া থাকে। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষের আলাপ-পরিচয়ে যে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে আত্ম-তৃপ্তি ও আত্ম-বিভ্রমই থাকে বেশী—প্রেম থাকে অতি অল্প ক্ষেত্রে। কারণ আসঙ্গলিপ্সা প্রেম নয় বরং সঙ্গলিপ্সাই প্রেম। কাজেই আধুনিকগণ প্রেমের বাস্তবতা প্রচার করিয়া দাম্পত্য-আদর্শকে হীন করিতে পারেন নাই, প্রকারান্তরে আধুনিক নর-নারীর মন যে ভাব-দরিদ্র তাহারই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাই একথা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতেই হইবে যে, দাম্পত্যই প্রেম-সাধনার একমাত্র বহিরাঙ্গ সোপান। হয়ত এই পথেও বহুক্ষেত্রে সাধনা ব্যর্থ হইতে পারে, কিন্তু দোষ পথের নয়, সাধনার।—(শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ)।

## অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি ঃ

অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি সম্পর্কে বলিবার পূর্ব্বে স্বাভাবিক যৌনবৃত্তি কি তাহা বলা প্রয়োজন। স্বাভাবিক যৌনবৃত্তি বলিতে স্ত্রী-পুরুষে জননেন্দ্রিয় সম্মিলনে যে ক্রিয়া সাধিত হয় তাহাই স্বাভাবিক; এতদ্ভিন্ন অন্যবিধ উপায়ে যৌনতৃপ্তি লাভ করাকে আমরা অস্বাভাবিক মনে করিতে পারি। কিন্তু তাহাতেও অনেক প্রকার জটিল প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। সমাজবিদ্‌গণ নারী-পুরুষের বিবাহিত ক্ষেত্রে যে যৌনসম্মিলন সাধিত হয় এবং যাহার উদ্দেশ্য প্রজোৎপাদন, তাহাকেই স্বাভাবিকতার পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। বিবাহিত জীবনের বাহিরে নারী ও পুরুষে যে যৌন-ক্রিয়াদি সাধিত হয় তাহা অস্বাভাবিক আখ্যা না পাইলেও নীতিবিগর্হিত ও ব্যভিচারের পর্য্যায়ভুক্ত। কাজেই ইহাও স্বাভাবিকতার বাহিরে পড়ে।

আবার বিবাহিত-জীবনেও যেখানে যৌন-সম্মিলন প্রজোৎপাদনের পথ প্রশস্ত না করিয়া উহার সঙ্কোচসাধনে বা জন্মনিরোধ ও জন্মলোপ করিতেই যত্নবান হয়, তখনও উহা স্বাভাবিক বলিয়া অনেকে মনে করেন না। ইহা ছাড়াও অনেক বিবাহিত জীবনে কেবলমাত্র পরস্পরের যৌনেন্দ্রিয় সংযোগ ব্যতীরেকে প্রবল অনুরাগ বশতঃ আরও যে সকল যৌনসংক্রান্ত ক্রিয়াদি সাধিত হইয়া থাকে ও তাহার ফলে যৌনতৃপ্তিও লাভ করে, সেই ক্ষেত্রে উহাও অস্বাভাবিক বলা যায় কিনা তাহাও বিবেচনার বিষয়। অবশ্যই এমন কতকগুলি ক্রিয়া আছে যাহা যৌন উত্তেজনা লাভের জন্য অথবা অনুরাগ প্রকাশ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। যেমন চুম্বন, আলিঙ্গন প্রভৃতি; কিন্তু এমন দম্পতিও দেখা যায় যাহারা পরস্পর ইন্দ্রিয় সম্মিলন ছাড়াও এমন সকল ক্রিয়াদি দাম্পত্যক্ষেত্রে সাধন করিয়া থাকে যাহা বিবাহিত জীবনের বাহিরে অনুষ্ঠিত হইলে নীতি ও আইনের চক্ষে অপরাধ বলিয়াই গণ্য।

পুরুষে পুরুষে যেরূপভাবে যৌনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে এবং তাহাতে একটী পুরুষ যেরূপ নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, সেইরূপ ভূমিকা অনেক বিবাহিত স্ত্রী-ও স্বামীর প্রবল আসক্তিবশে স্বামীর মনোতুষ্টির জন্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। অনেক দম্পতি পরস্পর ইন্দ্রিয়লেহন প্রভৃতি ক্রিয়াও পছন্দ করিয়া থাকেন। এইক্ষেত্রে ইহাকেও অস্বাভাবিকতার পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে কিনা তাহাও বিচার্য্য বিষয়।

যৌনপ্রবৃত্তি এমনই অরাজক বৃত্তি যে ইহা নব নব পথে প্রধাবিত হইতে স্বতঃই উৎসারিত হইয়া থাকে। কেবল ভদ্র ও সংযত মনের প্রবল চাপে ইহা নীতিসঙ্গত পথে বিচরণ করে। কিন্তু মনের রাশ ঢিলা করিয়া দিলেই ইহা বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় ছুটিতে চায়। কাজেই যৌনবৃত্তির অস্বাভাবিকতা বণ্টন করিয়া দেখানও খুবই কঠিন। তাই বিংশ শতাব্দীর অনেক যৌন ও মনোবৈজ্ঞানিকগণ Homosexuality বা সমমিথুন প্রবৃত্তিকেও অস্বাভাবিকতার আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হইয়া থাকেন। কারণ তাঁহারা বলেন: সমমিথুন প্রবৃত্তি এমন সকল নর-নারীর মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়, যাঁহারা বুদ্ধিমান, বিদ্বান, ধীর, স্থির, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সমাজে অতি উচ্চস্তরের অধিবাসী। আমি নিজেও দুই চারিজন লোককে জানি যাঁহারা পূর্ব্বোল্লেখিত গুণসম্পন্ন ত বটেই তদুপরি ইহার মধ্যে দুই একজনের রূপলাবণ্যবতী তরুণী পত্নী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও এবং সমাজে অতি উচ্চস্তরের অধিবাসী হইয়াও সমমিথুনের ভক্ত ও বালমেহী। তবে ইহাদের উভগামী বলিতে পারি। কারণ পত্নীর অমর্য্যাদা ইহারা করেন না এবং পত্নীর-ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদনেও অমনোযোগী নহেন।

আমি এমন একজন উচ্চসম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত বৃদ্ধব্যক্তিকে জানিতাম, যিনি কর্ম্মক্ষেত্রে অতিশয় যোগ্যতার পরিচয় দিয়া বিপুল অর্থের

ও সম্মানের অধিকারী এবং পাঁচ ছয়টী উপযুক্ত সন্তানের পিতা হইয়াও বালমেহনের ভক্ত ছিলেন। পরে একবার এই ব্যাপারে তাহার যুবক ভৃত্য তাহার উপর মনিবের ইন্দ্রিয়তুষ্টির কাহিনী দুষ্টলোকের প্ররোচনা বশে প্রকাশ করিয়া দিলে তাঁহাকে রাজদরবারে পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে হইয়াছিল; কিন্তু পরে যোগ্যব্যক্তির সম্মান ও পসার চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কায় আর ব্যাপারটা অধিকদূর গড়ায় নাই।

এমন একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে জানিতাম, যিনি সমমেহন ও বালমেহন প্রবৃত্তিবশে নিজের ভালবাসারপাত্র যুবককে আপন কন্যা ও ভ্রাতৃ-কন্যাগণের সহিত ব্যাভিচার দোষদুষ্ট হইতে দেখিয়াও বিশেষ কিছু আপত্তি করিতেন না। একবার সেই যুবক এই ব্যক্তির দুইটী যুবতী কন্যা ও একটী যুবতী ভ্রাতৃকন্যাকে লইয়া দূরদেশে পলাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তি কয়েকদিন পরে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের ফিরাইয়া আনিলেন বটে কিন্তু সেই যুবকের বিরুদ্ধে 'হু' শব্দটীও উত্থাপন করেন নাই। বর্ত্তমানে এই প্রৌঢ়ব্যক্তি পরলোকগমন করিয়াছেন। লোকটী বেশ বুদ্ধিমান, ধর্ম্মভীরু এবং ধনী ছিলেন।

কোন ধনীব্যক্তির রক্ষিতা এমন একটী স্ত্রীলোকের কাহিনী আমার সংগ্রহে আছে, যিনি কোন সন্ন্যাসিনী নারীর পাল্লায় পড়িয়া প্রবল সমমিথুন প্রবৃত্তিবশে সেই ধনীব্যক্তিকে আর আমলই দিত না।

এমন দুইজন মুসলমান ভদ্রলোককে দেখিয়াছি, যাঁহারে একজন অল্প বয়সে অপর বিরাট ধনী মুসলমানের ভালবাসারপাত্র হিসাবে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিল; অথচ সেই ধনী মুসলমানের অসামান্যা সুন্দরীপত্নী বর্ত্তমান থাকিলেও সে এই প্রকার সমমেহন অতিশয় পছন্দ করিত। অথচ পত্নীর প্রতিও অমনোযোগী কিংবা পত্নীতে সন্তানোৎপাদনে অমনোযোগী ছিলেন না। তাঁহার সেই

ভালবাসার পাত্র অপর মুসলমান যুবকও যৌবনের সীমা অতিক্রম সময়ে যথেষ্ট পদপসার লাভ করিয়া তিনিও বালমেহনের ভক্ত হইয়া পড়েন। অবশ্য নারী-মিথুন প্রবৃত্তিও তাহাতে অতিমাত্রায় প্রবল আছে।

এমন একজন কৃতি ব্যবসায়ী প্রৌঢ়ব্যক্তিকে আমি জানিতাম (বর্ত্তমানে পরলোকগত হইয়াছেন), যিনি অন্য সকল বিষয়ে বিশেষ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হইয়াও প্রবল বালমেহনের ভক্ত ছিলেন। এমনকি নিজ ব্যবসায়ক্ষেত্রে তিনি একজন সুন্দর যুবককে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়া তাহার প্রতি তিনি অতিশয় আসক্ত ছিলেন। কিন্তু সেই যুবক যৌবন অতিক্রমে আবার প্রভুপত্নীতেও আসক্ত হইয়াছিলেন। এমনি ধরণের আরও দৃষ্টান্তও আমি দেখাইতে পারি, কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। যে কয়জনের কথা আমি উল্লেখ করিলাম ইহারা সকলেই সমাজের উচ্চস্তরের অধিবাসী।

যাহা হউক, অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি বলিতে আমরা এইগুলিকে সাধারণ দৃষ্টিকোণ হইতে বাছাই করিয়া লইতে পারি : (১) পানিমেহন (২) সমমিথুন (পুরুষের ক্ষেত্রে ইহা সাধারণতঃ পুংমৈথুনের পর্য্যায়ভুক্ত ও নারীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পরস্পর ভগ-সংযোগ। (৩) পশুমেহন প্রবৃত্তি (বর্ত্তমানে পুরুষের ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ক্বচিৎ কথনও শোনা যায় বটে কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বর্ত্তমানে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া খুবই কঠিন; তবে পাশ্চাত্য-নারীদের ক্ষেত্রে অতিশয় কুকুরপ্রীতি হইতে ইহা কোন কোন ক্ষেত্রে তৎপশুকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়)। (৪) ফেল্লাসিও—মুখমেহন বা ইন্দ্রিয়লেহন প্রবৃত্তি (ইহা সমমেহনকারী নর-নারীদের মধ্যে কিংবা অনেক বিবাহিত নারী-পুরুষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যদিও ইহা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য হইতেই শিক্ষাবশে অর্জ্জিত। কিন্তু বাৎসায়নের কামসূত্রেও এবিষয়ে নির্দ্দেশ আছে)। (৫) নারীদের ক্ষেত্রে লিঙ্গ

ব্যতিরেকে কোন জড় পদার্থ সাহায্যে যৌনতৃপ্তি লাভ। যদিও ইহা নারীদের ক্ষেত্রে পানিমৈথুনের পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়াই অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া যৌনইন্দ্রিয় বাদ দিয়া নারী ও পুরুষের দেহের অন্যান্য অংশের মধ্যে কামনার উদ্রেক ও যৌনতৃপ্তি লাভ করিতে দেখা যায়। যেমন নারীর কেশ, হস্ত, পদ, স্তন, মুখ প্রভৃতি এবং পুরুষের মুখ, হস্ত, পদ, সুন্দর সুঠাম দেহ, কিংবা দেহের অন্যান্য অংশ। আবার এমন সকল অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি অনেকের ক্ষেত্রে প্রবল দেখা যায়, যাহা নারী-পুরুষের দেহের কোন প্রয়োজন বোধ করে না—তাহারা প্রিয় পাত্র বা পাত্রীর ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি, চিত্র ও চিঠিপত্র লইয়াও প্রবল যৌনউত্তেজনা প্রাপ্ত হয় এবং যৌনতৃপ্তি লাভ করে।

বিপরীত লিঙ্গে সঙ্গম ব্যতিরেকে যাহারা সমলিঙ্গে যৌনতৃপ্তি লাভ করে, সেই সকল পুরুষদের ইংরাজীতে Perverts বলা হয়। পারভারট্স্ মনোবৃত্তিসম্পন্ন পুরুষদের নিকট স্ত্রীযোনির কোন আকর্ষণ নাই এবং ইহার দ্বারা তাহারা কোন উত্তেজনাও লাভ করে না; বরং অনেক সময় দেখা যায়, উহা তাহাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার করে। কেবলমাত্র সমলিঙ্গ ব্যক্তিগণের দ্বারাই যৌনউত্তেজনা তথা যৌনতৃপ্তি লাভ করে। আবার এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্না স্ত্রীলোকদের বলা হয় Inverts. অনেক সময়ই দেখা যায় এইশ্রেণীর সমকামী নর-নারীগণ কেবলমাত্র যৌনকার্য্য ব্যতীত অপর সকল বিষয়েই অতিশয় বুদ্ধিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। এই প্রকার সমমেহিগণের যৌন-জীবনও সাধারণ নর-নারীর ন্যায়ই উত্তেজনাসম্পন্ন এবং যৌনকার্য্যে ইহারা সাধারণ নারী-পুরুষের ন্যায় ভাব-বৈচিত্র্য সকলই প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রভেদ কেবল এই যে, কোন বিপরীতলিঙ্গের আবশ্যকতা ইহারা বোঝেন না এবং জন্মদানের কোন বাসনা ইহাদের মনে বর্ত্তমান থাকিতে

দেখা যায় না। এইশ্রেণীর সমমেহী পুরুষদের বেলায় দেখা যায়, ইহাদের পরস্পর নির্ব্বাচিত উভয়সঙ্গীর মধ্যে একের জননেন্দ্রিয় ও অপরের মুখবিবর বা গুহ্যদেশ এই প্রকার যৌনকার্য্যের সহায়তা করে। ইহাদের মধ্যে প্রকারভেদ এই—একশ্রেণী সক্রিয় অংশ গ্রহণেই একান্ত উন্মুখ, আবার অপর শ্রেণী নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেই ভালবাসে। আবার অনেকে সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উভয় অংশ গ্রহণ করিতেই ইচ্ছুক থাকে। নারীদের বেলায়ও পরস্পরের ইন্দ্রিয় ও মুখবিবর উভয়ই এই কার্য্যের সহায়ক হয়। এইশ্রেণীর সমমেহী নারী ও পুরুষেরা ইহাতেই প্রবল উত্তেজনা, আনন্দ ও তৃপ্তি পায়। *

আর এক প্রকার পুরুষ দেখা যায়, যাহারা স্ত্রীযোনী বা নিজ জননেন্দ্রিয় উভয়কেই বাদ দিয়া নারীর স্তন, চরণ ও কেশের মধ্যে প্রবল যৌনউত্তেজনা ও যৌনতৃপ্তি লাভ করে। সুপ্রসিদ্ধ যৌনতাত্ত্বিক ডাঃ হেবলক এলিস মহোদয় তাঁহার "সাইকোলজী অব সেক্স" গ্রন্থে এই শ্রেণীর এমন কয়েকজন অপরাধীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, যাহারা যৌনতৃপ্তিলাভের উদ্দেশ্যে প্রবল উত্তেজনাবশে জনতাপূর্ণ স্থানে ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া নারীর স্তন ও কেশ কর্ত্তন করিয়া লইয়া পলায়ন করিত। ইংল্যাণ্ডে ইহাদের কয়েকজন ধরা পড়িয়া স্যাজা পাইয়াছিল। চৌর্য্যকার্য্যের মধ্যে যৌনউত্তেজনা ও যৌনতৃপ্তি লাভ করে এমন নর-নারীরও অভাব নাই।

আবার আর একশ্রেণীর নর-নারী দেখা যায় যাহারা অভিষ্টব্যক্তির ব্যবহার্য্য জুতা, রুমাল, মোজা, পরিধেয় বসনের ছিন্নাংশ বা পরিচ্ছদাদি

---

* সমমেহন বা হোমোসেক্সুয়েলিটী সম্পর্কে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ যৌন ও মনোবৈজ্ঞানিকগণের দ্বারা আলোকিত বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে মদীয় সংগৃহীত ও সম্পাদিত ইংরাজী গ্রন্থ The Theory & History of Homosexuality পাঠ করিতে পারেন।

কিংবা তাহার ব্যবহৃত আসনে বসা প্রভৃতির দ্বারা যৌনআনন্দ লাভ করে। ইংরাজীতে ইহাদের Fetichists নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

অনেক নর-নারী পরস্পরের নগ্নইন্দ্রিয় অবলোকন, চুম্বন, আলিঙ্গন ও স্পর্শ দ্বারাও যৌনতৃপ্তি লাভে পরিতৃপ্ত হয়। কেহ কেহ অপরের সঙ্গমদৃশ্যাদি দেখিয়াই তৃপ্তি পায়, আবার অনেকে নগ্নমূর্ত্তি দর্শনেই একান্ত উন্মুখ হয় ও আনন্দলাভ করে।

এমন অনেক নর-নারী দেখা যায়, যাহারা স্বীয় যৌনইন্দ্রিয় উন্মুক্ত করিয়া অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও নিজেও অপরেরটা দেখাইবে আশায় মনে মনে প্রলুব্ধ হইয়া দারুণ তৃপ্তিলাভ করে। *

আর একশ্রেণীর নর-নারী আছে যাহারা প্রিয়জনকে সর্ব্বরকমে আঘাত ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া পরম যৌনতৃপ্তি লাভ করে এবং ইহারই বিপরীত শ্রেণীর নর-নারী প্রিয়ব্যক্তির নিকট হইতে আঘাত ও লাঞ্ছনা লাভ করিয়া যৌনতৃপ্তি পায়। ইহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত শ্রেণী Sadist ও শেষোক্ত শ্রেণী Masochists নামে অভিহিত।

হস্তমৈথুন প্রবৃত্তিটি অনেক নর-নারীর মধ্যে আজীবনকাল বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। অধুনা যদিও বাল্য বা কৈশোর কিংবা যৌবনের প্রথমাংশে অবিবাহিত অবস্থায় হস্তমৈথুন প্রবৃত্তিটি অস্বাভাবিক আখ্যালাভের যোগ্য হয়না বটে কিন্তু সুযোগ সুবিধা বা উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী লাভ করিয়াও যখন এই প্রবৃত্তিটি তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, তখন উহাকেও স্বাভাবিকতায় পর্য্যায়ভুক্ত করা চলে

* আমি নিজেও এমন দুই তিনজন নারী-পুরুষকে জানি যাহাদের মধ্যে এই প্রকার বৃত্তি বর্ত্তমান দেখিয়াছি। একটী মেয়েকে জানিতাম, সে তাহার স্তনদেশ উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে একান্ত উন্মুখ ছিল। অবশ্যই এসম্বন্ধে সে একটু ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিত—যাহাতে অপরে না ভাবেন তাহার জ্ঞাতসারেই উহা উন্মুক্ত হইয়াছে।

না। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, প্রিয়সঙ্গী বা সঙ্গিনীর দ্বারাও এইকার্য্য সাধন করিয়া অনেকে যৌনসঙ্গম হইতেও অধিক তৃপ্তিলাভ করে।

হেবলক এলিস্ অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি লইয়া নানা শ্রেণীবিভাগ করতঃ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে মানুষের দেহ-সম্পর্কিত যৌন-অস্বাভাবিকতাগুলির মধ্যে প্রথম বিভাগে দেখাইয়াছেন: হস্ত, পদ, স্তন, কেশ, গাত্রগন্ধ, কেশগন্ধ, অঙ্গগন্ধাদি প্রভৃতি একশ্রেণীর নর-নারীর যৌনতৃপ্তি লাভের সহায়ক হয়। আর একদফায় আছে: মানুষকে অঙ্গহীন করার মধ্যে কিংবা হত্যাদি করার কার্য্যে একশ্রেণীর লোক যৌনতৃপ্তি লাভ করে। প্রহার করা, নিদারুণ হৃদয়হীন কার্য্যের দ্বারা ( এসম্পর্কে পূর্ব্বেও দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছি যে, ইংল্যাণ্ডে এমন কয়েকজন অপরাধী ধরা পড়িয়া শাস্তি পাইয়াছিল, যাহারা স্ত্রীলোকের স্তন ও কেশাদি কর্ত্তন করিয়া লইয়া পলায়ন করিত ) কাহাকেও অন্ধ বা খঞ্জ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি কিংবা হত্যা করা প্রভৃতির মধ্যে ইহারা যৌনানন্দ লাভ করে। আর একশ্রেণীতে পড়ে: শিশুদের প্রতি যৌনাকর্ষণ, তিনি যাহার ইংরাজী নাম দিয়াছেন Paidophilia; বৃদ্ধত্বের প্রতি যৌনাকর্ষণ বা Presbyophilia ( ইহা দুইটী মেয়ের ও একটী ছেলের ক্ষেত্রে আমি পরিদর্শন করিয়াছি ); শবদেহ সঙ্গমের দুর্দ্দান্ত অভিলাষ বা Necrophilia এবং পশুমেহন ইচ্ছা বা Zoophilia.

দৈহিক সম্পর্ক ছাড়া যে যৌনঅস্বাভাবিকতা, এলিস সাহেব তাহার নাম দিয়াছেন Pygmalionism. ইহাও দুইটী বিভাগে বর্ণনা করিয়াছেন—(১) ব্যবহৃত জুতা, জামা, রুমাল, মোজা প্রভৃতি পরিচ্ছদাদির মধ্যে যৌনউত্তেজনা ও তৃপ্তিলাভ; ( পূর্ব্বে এ সম্পর্কে আমি বলিয়াছি ) (২) চিত্রাদির দ্বারা যৌনউত্তেজনা।

এতদ্ভিন্ন গাছে উঠা, দোলনা দোলা প্রভৃতি কার্য্যে যৌনউত্তেজনা ও তৃপ্তিলাভ করাকে Voyeurism বা Mixoscopia বলা হইয়াছে। আমি এমন কয়েকটী মেয়েকে জানিতাম যাহারা একটী যুবককে প্রত্যহ পেয়ারা গাছে উঠাইয়া পরমতৃপ্তি অনুভব করিত। অবশ্য পেয়ারা পাড়িতেই তাহাকে গাছে উঠাইত বটে, কিন্তু তাহা একটা উপলক্ষ ছিল মাত্র।

ইহার পর প্রস্রাবকার্য্যের মধ্যে যৌনানন্দ লাভ বা Urolagnia এবং মলত্যাগকালীন যৌনতৃপ্তি বা Coprolagnia. এই দুইটী কার্য্যের মধ্যে প্রবল যৌনানন্দ লাভ করিবার কথা আমি অনুসন্ধিৎসু স্পৃহাবলে কয়েকটী নর-নারীর ক্ষেত্রে নিজেও জানিয়াছি।

ইহা ছাড়া দেশাদি ভেদে এমনভাবে যৌনক্রিয়াসকল অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়, যাহা অন্যদেশের লোকের চক্ষে অস্বাভাবিক কিন্তু সেই দেশে উহা স্বাভাবিক যৌনকার্য্যের মধ্যেই গণ্য। ফ্রান্সের নর-নারীগণ ইন্দ্রিয়-লেহন প্রবৃত্তিটী স্বাভাবিক যৌনকার্য্যের মধ্যেই গণ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের দেশে অনেকের নিকটই উহা ঘৃণার উদ্রেক করিবে। তেমনি জাপানে যেভাবে যৌনক্রিয়াদি সাধিত হয় অপরদেশে তাহা অস্বাভাবিক। আবার অনেক দেশে স্ত্রী-পুরুষের যৌনমিলন মুখামুখি অবস্থায় অনুষ্ঠিত না হইয়া পশুর ন্যায় পশ্চাতদিক হইতে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের চক্ষে ইহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহাদের নিকট উহাই স্বাভাবিক রীতি। চীনদেশে এত বিভিন্ন রকমে যৌনক্রিয়া সাধিত হয় ও যৌনতৃপ্তি লাভ করে যাহা জগতের কুত্রাপি পরিদৃষ্ট হয়না। বহু রকমের অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি সেখানে অবলীলাক্রমে অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে অনেকেই কোনরূপ দোষারোপ করে না। সেখানে বালমেহন ব্যাপারটীও অস্বাভাবিক বলিয়া গণ্য নহে, তাই চীনদেশে অনেক পুরুষ-বেশ্যাও বর্ত্তমান আছে।

আরব দেশের লোকদের মধ্যে পুরুষের সমকামিতাদোষ কোন দোষ বলিয়াই গণ্য নহে। এমন অনেক আরববাসী আছে যাহারা বহুবছর যাবত এইপ্রকার যৌনজীবন অতিবাহিত করিতেছে। চীন ও আরব সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ মদীয় ইংরাজী গ্রন্থ The Theory & History ot Homosexuality পাঠে জানা যাইবে।

মানুষের অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি সম্পর্কে আমি এ কথাই বলিতে চাই যে, ইহা যাচাই বাছাই করিয়া দোষারোপ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত ও হৃদয়হীন প্রবৃত্তি যাহা এই ব্যাপারে দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই ভীষণ অকল্যাণকর ও অস্বাভাবিকতার পর্য্যায়ভুক্ত ; কিন্তু যেসকল ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতার মধ্যেও প্রজনন কার্য্যটী অব্যাহত থাকে ও যে সকল প্রক্রিয়া মানুষের কোন ক্ষতির কারণ না হয়, ততক্ষণ উহা বিশেষ অপরাধের কার্য্য বলিয়া মনে করা যায় না। কারণ প্রজনন উদ্দেশ্য ছাড়াও যৌনসহবাস করা কোন অসঙ্গত ব্যাপার নয়। কারণ নিছক আনন্দলাভের উদ্দেশ্যেই অধিকাংশ সময় যৌনকার্য্য সাধিত হইয়া থাকে।

বিশেষজ্ঞগণের বহু ভূয়োদর্শনের ফলে দেখা গিয়াছে যে, নানাপ্রকার যৌন অস্বাভাবিকতার প্রথম গোড়াপত্তন বাল্যেই হইয়া থাকে। কেবল উহা বিকাশপ্রাপ্ত হয় পরিণত বয়সে। এ সম্পর্কে পূর্ব্বেও ইঙ্গিত করিয়াছি। কিন্তু আমাদের অবিবেচনা বশতঃও আমরা অনেক সময় নর-নারীকে অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করিয়া থাকি। নদীর জল আটকাইয়া রাখিলে যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা যেরূপ উপায়েই হউক তাহার পথ করিয়া লইতে প্রয়াস পায়, ঠিক তেমনি নিরুপায় মানুষের রুদ্ধ ইন্দ্রিয়াবেগও স্বাভাবিক পথ না পাইয়া এক সময় নানাপথে প্রধাবিত হইতে প্রয়াস পায় এবং ইহারই ফলে অনেক

সময় স্বাভাবিক মানুষও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেমন জেলের কয়েদী। জাহাজের নাবিকগণও—যাহারা মাসের পর মাস স্ত্রীবিহীন অবস্থায় জলে জলে কাটাইতেই অভ্যস্ত কিংবা সৈন্যবিভাগের লোকেরা বা কার্য্যব্যপদেশে যাহারা অবস্থা প্রতিকূলে বছরের পর বছর স্ত্রীহীন অবস্থায় জীবনযাত্রা অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়, এমনিভাবে জীবন কাটাইতে যাইয়া অনেক সচ্চরিত্র সংযমী লোক কিংবা ইহাদের সাধ্বী স্ত্রীগণও কামপ্রবলতার চাপে অনেক সময় অস্বাভাবিক যৌনবৃত্তিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়েন।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রাচীন সমাজচিত্র ও যৌন-ইতিহাস ঃ

লক্ষ লক্ষ বছর আগে অনার্য্য মানুষের যুগে দৃষ্টিনিবদ্ধ করিলে আমরা দেখিতে পাই, তখন একজন পুরুষ বহু স্ত্রীলোকের অধিশ্বর হইয়া পাহাড়ের গুহায় বাস করিত। প্রথমতঃ একটী পুরুষ একজন স্ত্রীলোককে লইয়াই নীড় বাঁধিত ও তাহার সহিত যৌন-সংযোগের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ ঐ রমণীর গর্ভে যেসমস্ত পুত্রকন্যা জন্মাইত তন্মধ্যে পুরুষ সন্তানগুলিকে পিতা হয় হত্যা করিত নতুবা একটু বড় হইলেই তাহাদিগকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়া কেবলমাত্র কন্যাগুলিকে নিজের কাছে রাখিয়া দলপুষ্ট করিত এবং সেই কন্যাগুলি ক্রমে ক্রমে একটু বড় হইলে পিতাই হইত তাহাদের স্বামী, রক্ষাকর্ত্তা ও রমণকর্ত্তা। যৌনসহবাসের ফলে সেই

কন্যাগণের গর্ভেও আবার সন্তান আসিত ও তাহাদের সন্তান-সমূহ হইতেও পুনরায় স্ত্রী-শিশু রাখিয়া পুংশিশুগুলিকে হত্যা বা বিতাড়িত করিত। অতঃপর আবার সেই পুনরাবৃত্তি। এমনি করিয়া একটী পুরুষ অগণিত নারীর অধিশ্বর হইয়া বিভিন্না বয়সের বালিকা, কিশোরী, তরুণী, যুবতী, প্রৌঢ়া ভার্য্যাগণের সঙ্গে প্রয়োজন মত সহবাসরত হইত। ঐ একটীমাত্র পুরুষকে বিভিন্ন বয়স্কা অসংখ্য নারীর যৌনক্ষুধা মিটাইতে হইত। তখনকার দিনে নারীগণ ঋতুস্নাতা হইলে পর অতিমাত্রায় কামার্ত্তা হইয়া পড়িতেন। ঐদলে অনেক নারী হয়ত একই সময়ে ঋতুস্নাতা হইত, আবার অনেকে হয়ত বিভিন্ন সময়ের পরিবর্ত্তনে পর পরও ঋতুমতী হইত। কাজেই সেই পুরুষের বিভিন্ন রমণীকে প্রত্যহই যৌনসঙ্গ দান করিতে হইত অনেকবার করিয়া। সেই দলে প্রৌঢ়া, যুবতী, তরুণী, কিশোরী প্রভৃতি নানা বয়সের অনেক স্ত্রীলোকই থাকিত এবং তাহাদের সকলের যৌনক্ষুধাও সমান হইত না। প্রৌঢ়া ও অল্পবয়স্কাদের যৌনক্ষুধার পরিতৃপ্তি সেই এককপুরুষ সহজে আনিয়া দিতে পারিলেও যৌবনপীড়িতা যুবতীদের সকলের কামপরিতৃপ্তি দান করা তাহার পক্ষে বড় সহজ হইয়া উঠিত না, অথচ যে কোন সময়েই তাহাকে প্রস্তুত না থাকিয়া উপায় ছিল না। অতি কামার্ত্তা নারীরা বার বার যৌনসঙ্গ লাভ করিতে চাহিলেও সেই দলপতিপুরুষকে তাহা দান করিতেই হইত। এমনি করিয়া পুরুষ সেই আদিমপ্রভাতেই তাহার স্বাভাবিক জৈবধর্ম্ম বিসর্জ্জন দেয়। প্রকৃতির প্রেরণাবশে নির্দ্দিষ্ট সময়ে যৌনকার্য্যে রত হওয়ার পশুসুলভ প্রবৃত্তিটী সেইখানেই সে হারাইয়া ফেলে। কিন্তু সেই একটীমাত্র পুরুষ অসংখ্য নারীকে যৌনসঙ্গ দান করার ফলে সেই পুরুষের যৌনযন্ত্র ক্রমেই দুর্ব্বল ও অক্ষম হইয়া আসিত এবং শুক্রতারল্য প্রভৃতি রোগবশতঃ ইন্দ্রিয় দুর্ব্বল ও শিথিল হইয়া গেলে দলের অল্প বয়স্কারা

যৌবনসমাগমে অতিমাত্রায় কামার্ত্তা হইয়া দিনরাত সহবাসাকাঙ্ক্ষায় আকুল হইত, তখন তাহাদিগকে তৃপ্ত করিবার ক্ষমতা সেই বৃদ্ধ বা প্রৌঢ়ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হইত না। কাজেই দলের মাঝে অপর কোন পুরুষ না থাকায় সেই কামার্ত্তা নারীগণ নানারূপ অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনতৃপ্তি খুঁজিয়া বেড়াইত। যদিও দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় লইয়াও সেই দলপতি কোনক্রমে কোন কামার্ত্তা যুবতীর সঙ্গে বিহার করিত বটে, কিন্তু তাহা হইত নিতান্তই নিয়মরক্ষা ব্যাপার। তাহাতে যৌবনমত্তা কোন যুবতীই পরিতৃপ্তা হইতে পারিত না। ফলে সেই অতৃপ্তকামা নারীরা উত্তেজনাবশে সমমিথুনে লিপ্তা হইত অথবা স্বমিথুনের দ্বারা যৌনক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিত। এইভাবে নারীগণও তাহাদের নির্দ্দিষ্ট সময়ে যৌনক্ষুধা-বোধশক্তি হারাইয়া স্বভাবজাত ধর্ম্মটী চিরদিনের মত হারাইয়া ফেলে। কারণ নারীরা নির্দ্দিষ্ট সময়েই যৌনক্ষুধা অনুভব করিত। কেবলমাত্র ঋতুসমাগমেই কামোত্তপ্তা হইয়া পুরুষকে আহ্বান করিত ও সেই আদিমযুগের পশুভাবাপন্ন শক্তিশালী পুরুষ অমিতবিক্রমে সেই নারীর সঙ্গে সঙ্গম করিয়া তাহার যৌন ক্ষুধার তৃপ্তি আনিত; তাহার ফলে সেই নারীর মাসিক ঋতুর পুনরাগমন না হওয়া পর্য্যন্ত সে আর কোনরকমে যৌনক্ষুধা বোধ করিত না।

এইবার দেখা প্রয়োজন, দলপতি কর্ত্তৃক যে সকল পুংশিশু বিতাড়িত হইত, তাহারা কিরূপে যৌন-জীবন যাপন করিত। একে একে পিতৃ-পরিত্যক্ত সন্তানগণ ক্রমে ক্রমে সকলে মিলিত হইয়া একটা দল বাঁধিত এবং যৌবনাগমনে তাহারা যখন যৌনক্ষুধা বোধ করিত তখন সকলে মিলিয়া সমমিথুনে লিপ্ত হইত, অথবা পানিমিথুন প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপায়ে যৌনক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করিত। ইহাদের মধ্যে যদি কখনও দৈবাৎ কোন নারী আসিয়া পড়িত, তখন ইহারা সকলে মিলিয়া একে

একে তাহার সহিত বিহার করিত। কখনও কখনও এই সকল বিতাড়িত ছেলেরা কোন কোন হারেমে যাইয়াও হানা দিত। তৎপর তাহাদের পিতা যখন দুর্ব্বল ও বৃদ্ধ হইয়া আসিত তখন সেই বিতাড়িত দলের সবচেয়ে বলিষ্ঠ যুবা হঠাৎ একদিন পিতার হারেমে হানা দিয়া সেই প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ পিতার জীবন-সংহার করতঃ সে দলপতির আসন অধিকার করিয়া তাহার মাতা, ভগিনী প্রভৃতির সহিত অমিতবিক্রমে বিহার করিয়া নূতন নূতন জন্মদান করিত।

পরে আবার একব্যক্তি ক্রমান্বয়ে অনেককাল যাবত বহু স্ত্রীলোকের ভর্ত্তা হইয়া থাকিতে পারিত না, কারণ পূর্ব্বোক্ত বিতাড়িত দলের মধ্যে যে যুবক পুনরায় শক্তিমান হইয়া উঠিত সে আবার তাহার ভাইকে হত্যা করিয়া সেস্থান অধিকার করিত। এরূপ হানাহানি তখনকার দিনের নিত্য ঘটনা। সেই পাষাণ-যুগের যবনিকা এইখানেই টানিয়া দিলাম।

* * * *

আদিম বন্য-জীবনের অবসানের অনেককাল পরে আবার যবনিকা উত্তোলিত করিতেছি। মানবসভ্যতা যখন দ্রুতগতিতে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—মানুষের সমাজজীবন গড়িয়া উঠিয়াছে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে ও নবনব আবিষ্কারে বন, জঙ্গল, পাহাড়, পর্ব্বত কাটিয়া মানুষ নগর বানাইয়াছে, ধর্ম্ম, রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐশ্বর্য্যের সম্ভারে সহর ঝল্‌মল্ করিতেছে—সেই সময় অর্থাৎ মাত্র খৃষ্টপূর্ব্ব পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানুষের সমাজ-জীবন ও যৌন-ইতিহাসের কয়েকটী পাতা দেশবিভেদ করিয়া এখানে মেলিয়া ধরিতেছি।

### প্যালেষ্টাইন:

প্রাচীন ইস্‌রাইলদের দেশ। প্যালেষ্টাইনের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের কথা এই যে, এই প্রাচীন ইহুদীজাতির মধ্যেই ধর্ম্মাবতার মুশা,

খৃষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা যীশুখৃষ্ট প্রভৃতি মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্যালেষ্টাইনের রাজা সলোমান, যাঁহার নাম ইতিহাসে অমর হইয়া আছে, আজিও কেহ বিজ্ঞ হইলে এই রাজা সলোমানের সহিতই লোকে যাহার তুলনা করিয়া থাকে, এহেন বিজ্ঞরাজা সলোমান সহস্র নারীর স্বামী-সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

খৃষ্টজন্মের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইনের ইহুদী জাতি অতিথিবৎসল হিসাবে জগতে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অতিথি সেবাপরায়ণতা প্রত্যেক ইহুদী পরিবারের মধ্যে এতটা মাত্রা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল যে, অতিথি সেবার জন্য তাঁহারা আপন আপন বধূ-কন্যাদের সতীত্বও নির্ব্বিচারে অতিথির নিকট তুলিয়া ধরিতে কুণ্ঠিত হইত না। তাঁহাদের মধ্যে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে, স্বর্গের দেবতা ও দেবদূতগণই মানবরূপে গৃহস্থের কুটিরে আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা আপন বধূ-কন্যাদের অতিথির শয্যাসঙ্গিনী করিয়া দেওয়াটা দেব-সেবারই তুল্য মনে করিতেন। তাহাছাড়া ইহাও মনে মনে পোষণ করিতেন, অতিথিরূপ দেবতা বা দেবদূতগণের এই মিলনের ফলে তাঁহাদের বধূ-কন্যাদের গর্ভে যে সকল সন্তানাদি জন্মগ্রহণ করিবে তাহারা দেবতাসদৃশ রূপবান, গুণবান, বলবান ও চরিত্রবান হইয়া জন্মলাভ করিবে। কিন্তু অতিথিসেবার এই সুযোগ গ্রহণ করিবার ছলে ক্রমান্বয়ে দিনের পর দিন অতিথির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিল এবং এইরূপে অতিথির সহিত অবৈধ সংযোগের ফলস্বরূপ ইহুদী যুবতীদের গর্ভে যে সকল সন্তান-সন্ততি আসিয়া জন্মলাভ করিল, তাহারা দেবতাসদৃশ না হইয়া পুরোপুরি মানুষরূপেই জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নয়, সেই সকল অবৈধ-সংসর্গের সন্তানগণ এত দুষ্ট ও দুর্দ্দান্ত

প্রকৃতির হইয়া উঠিতে লাগিল যে, ইহাদের জ্বালায় অতিষ্ঠ হইয়া ভগবান একদিন ধ্বংসের বন্যায় সমস্ত ইহুদী জাতিটাকেই সলিল-সমাধি প্রদান করিলেন। কেবলমাত্র বাঁচিয়া রহিল একটী ধার্ম্মিক ইহুদী পরিবার।

ধ্বংসের মধ্যেই হয়ত অনন্ত সম্ভাবনার বীজও লুকায়িত ছিল, তাই সেই বিরাট ধ্বংসের পরে পুনর্ব্বার নবতর ইহুদীজাতির জন্ম হইল। যে পাপ ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া দিতে ভগবান ধ্বংসের বন্যায় সমস্ত জাতিটাকেই শেষ করিয়াছিলেন, পুনরায় নবতর ইহুদীজাতির মধ্যেও সেই পুরাতন পাপ যৌনঅনাচার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল—নব নবতর রূপে। এখানে দৃষ্টান্ত দেখাইতে গেলে তখনকার ইহুদী সমাজের একজন দলপতি জুদার কাহিনী বিস্তৃত করিতে হয়।

জুদা ছিলেন ইহুদীজাতির সর্দ্দার। তাঁহার তিন পুত্র :—এ্যার, ওন্যান ও শেলা। এ্যার ছিল সকলের বড়, তারপর ওন্যান ও সর্ব্বকনিষ্ঠ শেলা। সর্দ্দার জুদা তামার নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর সহিত এ্যারের বিবাহ দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের সামান্য কিছুদিন পরেই তাহার মৃত্যু হয়। জুদা বিধবা তামারকে ওন্যানের সহিত পুনর্ব্বার বিবাহ দিলেন। কিন্তু ওন্যান স্ত্রী-সহবাস আদৌ পছন্দ করিত না; সে ছিল অস্বাভাবিক রতিক্রিয়াশক্ত। পানিমৈথুন, সমমেহন প্রভৃতি ক্রিয়ায় ওন্যান চিরঅভ্যস্ত হইয়াছিলেন এবং ঐ অস্বাভাবিক রতিপাপে সর্ব্বদা লিপ্ত থাকার ফলে অচিরেই তিনি ধরাধাম ত্যাগ করেন। ভরা যৌবনে অতৃপ্তবাসনা লইয়া সুন্দরী তামার আবার বিধবা হইল। কিন্তু ভাদ্রের ভরানদীর মত তামারের সারাদেহতটে তখন ভরা যৌবন, তদুপরি কামনা-বাসনা ও মাতৃত্বের ক্ষুধা তামারের মনে-প্রাণে পঞ্চ-প্রদীপ জ্বালিয়া দিয়াছে। যৌবনের দুরন্তনেশা তামারকে আকুল করিয়া তুলিল—যেমন করিয়া কস্তুরীর গন্ধে মৃগ আকুল হয়।

জুদার সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র শেলা তখনও কৌমার্য্যব্রত ভঙ্গ করেন নাই। তামার সতৃষ্ণ নয়নে তাহার পানে তাকায়, কিন্তু জুদা কনিষ্ঠপুত্রের বিবাহ তামারের সহিত দিতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না এই বলিয়া যে, তামারের গর্ভকোষ সন্তানধারণের উপযুক্ত নহে—সে স্বভাবতঃ বন্ধ্যা। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ ও অন্যান্য যুক্তিকে যুবতী তামার কিছুতেই মানিয়া লইতে পারিলেন না।

তখনকার দিনে প্যালেষ্টাইনে সবেমাত্র একপ্রকার সাধারণ বেশ্যাবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে। দেশে রীতি ছিল যে, কোন নারী চৌরাস্তার মোড়ে অবগুণ্ঠনাবতী অবস্থায় বসিয়া থাকিলেই সাধারণে বুঝিতে পারিত, ঐ নারী বারবণিতাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে।

একদা সর্দ্দার জুদা মেষপালের লোম ছাটাই করিতে অদূরবর্ত্তী এক পাহাড়ে গিয়াছিলেন।

এদিকে তামার বৈধব্যের বেশ পরিত্যাগ করিয়া সাজগোজপূর্ব্বক ওড়নায় মুখ ঢাকিয়া চৌরাস্তার পারে যাইয়া বসিলেন। জুদা বাড়ী ফিরিবার পথে পুত্রবধূ তামারকে চৌরাস্তার মোড়ে বসিয়া থাকিতে দেখিলেন, কিন্তু মুখ ওড়নায় ঢাকা থাকায় চিনিতে পারিলেন না। জুদার যৌনচেতনা উদ্বুদ্ধ হইল এবং সে তাহার নিকটে যাইয়া আপন মনোবাসনা ব্যক্ত করিলেন।

তামার শ্বশুরকে চিনিতে পারিয়াও সম্মতি জ্ঞাপন করিল। কিন্তু তাহার জন্য তাহাকে কি পারিতোষিক দেওয়া হইবে সে বিষয়ে প্রশ্ন করিলে জুদা বলিল, "একটা ভেড়ার ছানা বাড়ী থেকে এনে তোমায় দান করে যাব।"

তামার উত্তর দিল, "তোমার যা খুসী তাই দিও, কিন্তু তার পূর্ব্বে জামীনস্বরূপ এখন তোমার নামাঙ্কিত ঐ হাতের আংটী, বালাজোড়া ও

পাচনদণ্ড আমার কাছে রেখে যেতে হবে। পরে ভেড়ার ছানা পাঠিয়ে ওগুলো ফেরৎ নিয়ে যেও।”

তারপর সম্মুখের অন্ধকার ঝোঁপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে শ্বশুর-জুদা পুত্রবধূ তামারের দেহগ্রহণ করিলেন। দৈব বিড়ম্বনায় তাহারই ফলে তামারের গর্ভ-সঞ্চার হইল।

এদিকে বাড়ী আসিয়া জুদা প্রতিশ্রুত ভেড়ার ছানা পাঠাইয়া আপন জিনিষগুলি ফেরৎ আনিতে পাঠাইলেন। কিন্তু রতিপাপের অব্যবহিত পরেই তামার বারবণিতার বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্বশুরের অজ্ঞাতে অন্য পথ দিয়া শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং জুদার প্রেরিত লোক আর সেই বারবণিতার সন্ধান পাইলেন না।

জুদা একদা জানিতে পারিলেন, পুত্রবধূ তামারের গর্ভ হইয়াছে। কিন্তু বিধবার গর্ভ হওয়া ( তখনকার দিনেও ) যে মস্তবড় অপরাধ, তাহা ধর্ম্মপ্রাণ জুদার অজ্ঞাত ছিলনা। তাই সে তামারকে আগুনে পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা করিলেন; কিন্তু তামার শ্বশুরের নামাঙ্কিত অঙ্গুরী, যষ্টি ও বালা বাহির করিয়া শ্বশুরকে প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, অনাগত শিশুর পিতা সে-ই -- অন্য কেহ নহে।

* *

আজ হইতে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বের কথা, প্যালেষ্টাইনের ইহুদীজাতির মধ্যে তখন মহাপুরুষ মুশা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সেই সময় ইহুদীদের দেশ প্যালেষ্টাইনের সোডাম ও গোমরা সহর সমমিথুনে ভীষণভাবে লিপ্ত হইয়াছিল। এমনকি ঐ দুই সহরে তখন পুরুষ-বেশ্যাবৃত্তি পর্য্যন্ত ব্যাপকভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে এই কুপ্রথা সমস্ত ইহুদীজাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। সারা জগতে তখন এই দেশটী সমমিথুনের জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

বর্ত্তমান জগতের বহু পুরাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে জানিতে পারিয়াছেন যে, সেই যুগে একসময় ইহুদীসমাজের নারীগণ ভীষণ কামজব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তদুপরি পুরুষেরা তাহাদের এড়াইয়া চলিত বলিয়া স্ত্রীলোকেরা পুরুষদিগকে কাছে পাইলেই রতিবাসনা যাচ্ঞা করিতেন। কাজেই অনেক ইহুদী যুবক তখন রোগাক্রমণ হইতে নিজ নিজ স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখিতে নারীর সংস্পর্শ এড়াইয়া বালমেহনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বহু ইহুদীযুবক সে সময় গৃহপালিত পশুর সহিতও ঘৃণ্যতম যৌনপাপে লিপ্ত হইতে কোনরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হইতেন না। এই সকল অদ্ভুত ও অসঙ্গত যৌনপাপের প্রতি লক্ষ্য করিয়া মহাপুরুষ মুশা বজ্রনির্ঘোষকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন: Thou shalt not lie with mankind as with a woman, for it is an abomination; thou shalt not cohabit with any beast, and thou shalt not lie down with it, for it is a crime.

ধর্ম্মমন্দিরগুলি তখন অবৈধ যৌনচর্চ্চার জন্যই যেন উন্মুক্ত ছিল। ধর্ম্মমন্দিরগুলি ছিল যেন নর-নারীর যথেচ্ছা কেলি করিবার একটা আশ্রয়স্থল। তদুপরি বয়াল দেবতার মন্দিরে একদল তরুণ রূপবান পুরোহিত থাকিত। তাহারা সারাদেহ কেশহীন করিয়া (কামাইয়া) সুগন্ধিতৈল অনুলেপনপূর্ব্বক নারী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে নিজ নিজ দেহ ভাড়া খাটাইত। যে সকল পুরুষ সমকামিতা পছন্দ করিত তাহারা ইহাদের সহিত অবৈধ যৌনপাপে লিপ্ত হইতেন। মন্দিরের নিয়মানুসারে প্রত্যেক পুরোহিতকেই দেহবিক্রিত অর্থের অর্দ্ধেক মন্দিরে দান করিতে হইত।

ইহা ছাড়া মন্দিরের একদল শিক্ষিত কুকুর-কুকুরীর দ্বারাও বেশ্যাবৃত্তি করানো হইত। জঘন্য নারকীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন একদল নর ও নারীর

জন্য ঐ সকল জীবগণ আত্মদান করিত। এই ঘৃণ্যতম পাপাচার লক্ষ্য করিয়াই মহাপুরুষ মুশা বলিয়াছিলেন: Thou shalt bring hire of a whore or the price of a dog unto the house of the Lord of God.

একবার প্যালেষ্টাইনের এ-ফ্রায়াম গোষ্ঠের নেতা লেভাইট্ তাঁহার এক স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়ী হইতে লইয়া আসিবার পথে, গিবিয়ানগরে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিলে এক বৃদ্ধভদ্রলোকের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তাহার স্ত্রী, দুইটী গর্দ্দভ ও একটী চাকর ছিল। আহারাদি সমাপন করিয়া তাহারা নিদ্রা গিয়াছেন। এমন সময় দ্বিপ্রহর রাত্রিতে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে—

গিবিয়ানগর তখন বেঞ্জামিনীয় উপজাতিদের প্রধান কেন্দ্রস্থল। এই বেঞ্জামিনীয় জাতির পুরুষগণ পাশবপ্রবৃত্তিতে তখন শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল। বালক-বালিকা স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সুবিধামত তাহারা যাহাকে কাছে পাইত তাহার সহিতই আপনাপন পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। সমমিথুন পাপেও ইহারা তখন বিশেষ পরিপক্কতা লাভ করিয়াছে। লেভাইট যখন তাহার স্ত্রী, ভৃত্য প্রভৃতিকে লইয়া সেই বৃদ্ধের বাড়ী আশ্রয় লয়, তখন কয়েকজন বেঞ্জামিনীয় পুরুষ ইহাদের দেখিতে পায় এবং যুবাবয়স্ক লেভাইটের সুন্দর নধরকান্তি দেহ দেখিয়া তাহাদের মনে অদ্ভুত পাপবাসনার সঞ্চার হয়। তাই তাহারা দ্বিপ্রহর রজনীতে সেই বৃদ্ধের বাড়ী আসিয়া দরজা খুলিবার জন্য ভীষণ গোলযোগ সুরু করে। বৃদ্ধ আসিয়া দরজা খুলিলে তাহারা বলে: "তোমার ঐ সুন্দর পুরুষ অতিথিটীকে এখনই আমাদের হাতে দাও, তাহার দ্বারা আমরা ( Utabutamur eo বা ) ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিব।"

বৃদ্ধ বিশেষ মিনতিকাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিলঃ "ভাইসব, আমার অতিথিটীর উপর এমন পাপকার্য্য করিও না। ঘরে আমার একটী কুমারী কন্যা আছে এবং অতিথিটীর সঙ্গে একজন সুন্দরী নারী আছেন; ইহাদের উভয়কেই তোমাদের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তাহাদের দ্বারাই তোমাদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ কর।" বেঞ্জামিনীয়গণ সেকথা কিছুতেই শুনিল না। জোর করিয়াই তাহারা ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

এই গোলযোগে লেভাইটের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল। সে একপ্রকার জোর করিয়াই তাহার সদ্যনিদ্রাউত্থিতা উপপত্নীকে এই দুর্ব্বৃত্তদের কবলে দিয়া অনেক করিয়া নিজের মুক্তি ক্রয় করিল।

বেঞ্জামিনীয়গণ সম্মুখেই একটা স্থানে স্ত্রীলোকটীকে লইয়া যাইয়া সমস্তরাত্রি সেই অভাগিনীর উপর যে অকথ্য ও বীভৎস অত্যাচার করিল, সেই ঘৃণ্যতম পাপকাহিনী শুনিলে ভীষণ বদমাইসেরও চক্ষু সজল হইয়া উঠে।

সকালবেলা সেই হতভাগিনী নারী কোনমতে নিজের রক্তাক্ত ও অবসন্ন দেহখানি টানিয়া আনিয়া সেই বৃদ্ধের দরজার সম্মুখে উপস্থিত করিল। লেভাইট দেখিলেন, তাহার সেই প্রিয়তমা নারী তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে বসিয়া পড়িতেই তাহার অন্তরাত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

লেভাইটের চক্ষের সম্মুখে তাহার প্রণয়িনীর এই শোচনীয় মৃত্যু তাহার অন্তরে আগুন জ্বালাইয়া দিল। প্রতিশোধ লইবার মানসে লেভাইট্ সমস্ত ইস্রাইল সমাজকে বেঞ্জামিনীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিল এবং এই বর্ব্বরদের গোষ্ঠিশুদ্ধ নিপাত করিয়া সমুচিত দণ্ড প্রদান করিলেন।

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার প্রায় চারিশত বৎসর পরে মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া ইহুদীজাতির চরিত্র আরও দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া পড়িল। অবশ্যই

জাতির ভিতর তখন মহাপুরুষ মুশা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহিতা নারীর সতীত্ব তখন লোকচক্ষে মূল্যবান সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও অবিবাহিতা কুমারী কন্যাগণ পরপুরুষ গমন করিলে তেমন কোন দোষাবহ ছিল না। এমনকি বহু পিতা কুমারী কন্যাকে বেশ্যারূপে কামবিলাসীদের নিকট বিক্রয় কিম্বা ভাড়া খাটাইতেন। এই সমস্ত পাপকার্য্যে অধীর হইয়া মহাপুরুষ মুশা ঘোষণা করিলেন: Do not prostitute thy daughters, lest the band falleth to whoredom……there shall be no whore of the daughters of Israel. কিন্তু অনেক কিছু করিয়াও তিনি দেশের ঘোরতর দুর্নীতির বন্যাকে, এই জঘন্যতম পাপকে দূরীভূত করিতে পারিতেছিলেন না। নিত্য নবতররূপে ধর্ম্মের নামে ও অন্যান্যভাবে বহুতর অস্বাভাবিক নারকীয় কামলীলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তাহাছাড়া বেশ্যাবৃত্তিও দেশের সর্ব্বত্র পাখা বিস্তার করিল।

ক্রমে এই হতভাগ্যদেশ মাতৃগমন দোষেও দুষ্ট হইয়াছিল; কারণ 'Levitieus' গ্রন্থের একস্থানে মহাপুরুষ মুশা বলিতেছেন: Let no one go unto his mother to lie her.

কন্যাগমন বা পিতৃগমন পাপেও এদেশ অভ্যস্ত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী ঘটনার উল্লেখ করা যাইতেছে।

গোমরা সহরের মহাসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লট্, অতিথিপরায়ণ ও নানা সদগুণে বিভূষিত ছিলেন কিন্তু তাহার অতিরিক্ত পানদোষ ছিল। তাহার গৃহে ছিল দুইটী মাতৃহারা আইবুড়ো কন্যা। কন্যা দুইটী পিতার এই মাতাল হওয়ার সুযোগ লইয়া পিতার দ্বারা নিজদের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া লইত। কিন্তু পরে ব্যাপারটা আর পিতারও অগোচর রহিল না। তখন

স্বাভাবিক জ্ঞানাবস্থায়ই ঐ অবৈধ পাপকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল এবং এই জঘন্যতম পাপ সহবাসের ফলে কয়েকটী সন্তান-সন্ততিও জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

সেই সময়ে এককালে প্যালেষ্টাইনের কোন রমণীই সত্যিকারের সতীত্বের গর্ব্ব করিতে পারিতেন না। তাহার উপর নানারূপ অস্বাভাবিক যৌনপাপে সারাদেশ ছাইয়া গিয়াছিল। ফলে সমস্ত দেশ উপদংশ ও প্রমেহ রোগের প্রাদুর্ভাবে জর্জ্জরিত হইয়া লোকের পারিবারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লুপ্ত হইয়াছিল।

মহাপুরুষ মুশা অবশেষে বজ্রকঠোর হস্তে নানারূপ কঠিনতম ও নির্ম্মম দণ্ডের বিধান করিয়াও আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। মহাত্মা যীশুখৃষ্টের জন্মের পর ক্রমে প্যালেষ্টাইনের জঘন্যতম পাপবৃত্তি কমিতে থাকে।

## মিশর ঃ

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের মিশরের ইতিহাসের দিকে একবার দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, এদেশ তখন দেবতার নামে বহুপ্রকার অসঙ্গত যৌনলীলার প্রশ্রয় দিয়াছিল। কৌমার্য্য অথবা বিবাহিত জীবনেও নারী-পুরুষ যেমন খুসী বা যাহার সহিত ইচ্ছা যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করতঃ আপন আপন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত।

মিশরীয়দের প্রধানদেবতা আইশিশ ও অশিরিশ ইঁহারা পরস্পরে সহোদর ভ্রাতা-ভগ্নী হইলেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইতে তাঁহাদের কোনই বাধা হয় নাই।

আপন কন্যা অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রীর দেহ-বিক্রয়ের অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করাটা তখনকার মিশরীয় সমাজে বিশেষ কোন অন্যায় বলিয়াই গণ্য হইত না।

মিশরের কোন রাজা একবার কোন চোর ধরিবার জন্য আপনার রূপবতী কুমারী কন্যাকে দিয়া গণিকাবৃত্তি করাইয়াছিলেন। ঘটনাটী এইরূপ: খৃষ্ট জন্মাইবার ২২শত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের রাজা প্রথম রামেশিশের রাজত্বকালে একবার তাঁহার কোষাকার হইতে বহু জহরৎ অপসারিত হয়। রাজপুরুষগণের সমবেত চেষ্টায় যখন চোর কিছুতেই ধরা পড়িল না তখন রাজা এক চমৎকার ফন্দী বাহির করিলেন। হঠাৎ কয়েকদিন পর রাজ্যময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল: বাপের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া রাজার যুবতী কন্যা কুলের বাহির হইয়াছে। সামান্যমাত্র অর্থের বিনিময়ে যে কেহ তাহার ফুলের মত কোমল ও লাবণ্যপুঞ্জদেহ উপভোগ করিতে পারে। কোন বাধা নাই—কিন্তু নিজ নিজ জীবনের একটীমাত্র দুঃসাহসিক কার্য্যের কাহিনী রাজকন্যাকে শুনাইতে হইবে। এমনিভাবে শত শত কামবিলাসী ও দুশ্চরিত্রের দল জীবনের কঠিনতম দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনাইয়া প্রত্যহ পরমানন্দে রাজকন্যার দেহ উপভোগ করিয়া যাইতে লাগিল। তারপর একদা সেই চোরও রাজকন্যার দুয়ারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজকন্যাকে সে আপন দুঃসাহসিকতার কাহিনী শুনাইয়া তাহার দেহপ্রার্থী হইল। রাজকন্যা চোরের হাত ধরিয়া চীৎকার করিতেই শেয়ানা চোর হাত রাখিয়াই পলাইল। পরে জানা গেল, কোন সদ্যমৃত ব্যক্তির হাত কাটিয়া চোর নিজের আলখেল্লার মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিল এবং তাহা ফেলিয়াই সে পলাইয়াছে!

চোরের এই অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া রাজ্যময় ঢোল দেওয়া হইল—যিনি এই অসাধারণ তস্কররাজ, তিনি অবিলম্বে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করুন—রাজকন্যার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইবে। পরে তস্কররাজ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলে সম্রাট্ তাহার শতভোগ্যা রাজকুমারীকে সেই তস্করের সহিত বিবাহ দিয়া নিজ প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন।

খৃষ্ট জন্মের বারোশত বৎসর পূর্ব্বে মিশরের কেওপ্সে নামক রাজা তাঁহার বিখ্যাত পিরামিড নির্ম্মাণের জন্য রাজকোষের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ করিয়া ফেলেন। কয়েক হাজার লোক ২০ বৎসর যাবৎ ক্রমান্বয়ে পরিশ্রমের পর পিরামিড্ তৈয়ার সম্পূর্ণ করিল বটে কিন্তু রাজকোষ একেবারে কপর্দ্দকশূন্য হইল। রাজমিস্ত্রীর অনেক প্রাপ্য তখনো মিটানো হয় নাই। রাজা অন্য কোন উপায় না দেখিয়া নিজের সৌন্দর্য্যের প্রতিমা অনূঢ়া কন্যাকে কিছুদিনের জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার উপদেশ দিলেন। তাবপর রাজকন্যা কয়েক বৎসর নিজের দেহপাত্রখানি বিভিন্ন প্রেমিকের নিকট তুলিয়া ধরিয়া পিতার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিল। কিন্তু রাজকন্যা নিজের জন্য ও একটী স্মৃতিসৌধ বা পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়া যাইবার মানসে এই ঘৃণ্যতম পাপব্যবসায় পরিত্যাগ করিলনা এবং প্রত্যহ প্রত্যেক প্রেমিকের নিকট হইতে একখণ্ড করিয়া পাথর নজরানা স্বরূপ আদায় করিতে লাগিলেন। শেষ জীবনে তিনি অসংখ্য প্রেমিকের প্রদত্ত ক্ষণিক-প্রেমের নজরানার অসংখ্য প্রস্তর ও অর্থরাশি দিয়া এক বিরাট পিরামিড নির্ম্মাণ করিয়া যান। রাজকন্যার ঐ পাপকার্য্যের সাক্ষ্য দিতে আজিও সেই পিরামিড অযুত পর্য্যটকের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে অস্বাভাবিক যৌনপাপ মিশরে বর্ত্তমান ছিল। দেবতার মন্দিরে পূজা নিবেদনের অজুহাতে বহু অবাধ রতিলীলা অনুষ্ঠিত হইত। তখন মিশরের মন্দিরচত্বরে ও দেওয়ালে যৌন-সংযোগের যে সমস্ত অপরূপ ও অশ্লীল চিত্রসকল অঙ্কিত থাকিত তাহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। মন্দিরের বহু দেব-দেবীর চিত্রই ভীষণভাবে উলঙ্গ, বহু দেবতার ইন্দ্রিয় উচ্ছ্রিত রহিয়াছে, কোন কোন পাথরমূর্ত্তি-দেবতা পানিমেহনে নিযুক্ত, কোন দেবতা হয়ত কোন গৃহপালিত পশুর সহিত জঘন্যতম ও চক্ষুর পীড়াদায়ক ব্যাপারে রত; এমনি অসংখ্য অসঙ্গত পাপপূর্ণ

যৌনচিত্র সকল হইতে তখনকার মিশরীয় সমাজের চরিত্রটা ভাল ভাবেই অধ্যয়ন করা যায়।

প্রাচীন মিশর আরও একপ্রকার জঘন্যতম যৌনসম্বন্ধ স্থাপনের নজির রাখিয়া গিয়াছে, যাহা শুনিলে ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইতে হয়।

মিশরের মামী বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগেরও পরম বিস্ময়! প্রাচীন মিশরীয়গণ মৃতদেহে গন্ধাদি অনুলেপনপূর্ব্বক কাপড়াদি জড়াইয়া মামীতে পরিণত করিয়া কবরস্থ করিতেন। অবস্থাপন্ন লোকদের শবাদি বাড়ীতেই গন্ধানুলেপনপূর্ব্বক 'মামী'তে পরিণত করিয়া তাহার উপর পিরামিড-সৌধ-সমাধি নির্ম্মাণ করা হইত। কিন্তু মধ্যবিত্ত লোকদের শবাদি গন্ধদ্রব্যলেপকদের দোকানেই পাঠাইয়া দিলে, উপযুক্ত পারিশ্রমিক গ্রহণ করতঃ দুই-একদিনের মধ্যেই তাহারা উক্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিতেন। কিন্তু কোন কোন পাপপরায়ণ নরপিশাচগণ অল্প বা যুবতী বয়স্কা কোন সুন্দরী তরুণীর শবদেহ পাইলেই তাহার উপর আপন আপন পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মৃতদেহের অবমাননা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। ইহার পর হইতে নিয়ম হইয়াছিল, কোন অল্প বয়স্কা সুন্দরী নারীদিগের শবই যেন গন্ধলেপকের দোকানে প্রেরণ করা না হয়।

মিশরসম্রাজ্ঞী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা ক্লিওপেট্রার কলঙ্কিত কাম-পঙ্কিলতার কথা কে না জানেন? তাঁহার স্তন্যহীন পীনবক্ষে কোনদিন মাতৃক্ষুধা জাগে নাই—তার লজ্জাহীন ভ্রূভঙ্গীর তলায় নতনেত্রপাতে কোনদিন ঘরের কল্যাণ-দীপশিখা জ্বলে নাই। দিগ্বিজয়ী রোমানবীর সীজার ও তাঁহার প্রধান অনুচর মার্ক এণ্টনীর প্রতি ক্লিওপেট্রার নির্লজ্জ প্রেম নিবেদনের কথা ঐতিহাসিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। তাহা ছাড়া সমগ্র মিশর সাম্রাজ্য ছিল তাঁহারই জন্যে, শুধু তাঁহারই বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্যে। রাজ্যের মধ্যে যে সকল পুরুষ ছিল সুন্দরতম, বলিষ্ঠতম, মিশরের

রাণী ক্লিওপেট্রার জীবনের সঙ্গে তাহাদের দুই এক রাত্রির যৌনসম্পর্ক গড়িয়া উঠিতই। যদিও ক্লিওপেট্রা তাঁর ভাই রাজা দ্বাদশ টলেমীকে বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু বিবাহিত ও অবিবাহিত প্রেমের কোনরূপ পার্থক্য তাঁহার কাছে ছিলনা। সীজারের সঙ্গে যৌনব্যভিচারে লিপ্ত হইবার ও ছাড়াছাড়ি হইবার পর তিনি তাহার আর এক ভাইকেও বিবাহ করিয়াছিলেন; যদিও এ বিবাহ শুধু রাজনৈতিক কারণেই ঘটিয়াছিল। কারণ নিত্য নব পুরুষদেহ উপভোগ করিবার জন্য ক্লিওপেট্রার কোন অভাব হইত না, কিন্তু সে কাহিনী বাহিরে ব্যক্ত হইবার আশঙ্কা ছিল খুবই কম। প্রাসাদ-অভ্যন্তরে গুপ্তপরীখায় থাকিত অসংখ্য নরখাদক কুম্ভীর। পূর্ব্বরাত্রিতে যে পুরুষের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার যৌনসঙ্গ হইত, পরের দিন সেই পুরুষ হইত তাহার পালিত কুম্ভীরের খোরাক। দিনের পর দিন অসংখ্য নরদেহ ক্লিওপেট্রার কামবহ্নিতে ইন্ধন যোগাইবার সঙ্গে সঙ্গে কুমীরের খাদ্য হইয়াছে।

বিলাসপ্রিয়তা হিসাবেও ক্লিওপেট্রার ন্যায় বিলাসিনী নারী জগতের ইতিহাসে আর খুঁজিয়া মেলে না।

## ব্যাবিলোন:

ব্যাবিলোন দেশে সেইযুগে ধর্ম্মের নামে ধর্ম্মমন্দিরে একপ্রকার অবৈধ যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হইত। অর্থাৎ 'মাইলিত্তা' নামক দেবীমন্দিরে প্রত্যেক বিবাহিতা বা অবিবাহিতা রমণীকেই দেবীর তৃপ্তিসাধনের নিমিত্ত অন্ততঃ একবার অবৈধ রতিপাপে লিপ্তা হইতে হইত। রমণীগণ জীবনে অন্ততঃ একবার দেবমন্দিরের মাঝে পরপুরুষোপভোগ্যা হইলেই মন্দির হইতে ছুটি হইত অর্থাৎ দেবী তাহার প্রতি প্রসন্না হইতেন।

ব্যাবিলোনের অন্তর্গত চ্যালডিয়া রাজ্যে তখন অতিথি সৎকারের নামে সতীত্ববিসর্জ্জন প্রথা প্রচলিত ছিল। গৃহে অতিথি আসিলে কন্যা ও বধূগণ তাহার সর্ব্বপ্রকার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সৎকারের জন্য সর্ব্বদা নিয়োজিত থাকিতেন। অতিথিও যদৃচ্ছা দেহ-মনের ও সর্ব্বপ্রকার সুখ-সুবিধার সুযোগ গ্রহণে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ব্যাবিলোনের সিংহাসনে তখন সম্রাট্ নেবুসাড্ নেজার। তাঁহার রাণী ছিলেন ব্যাবিলোনের শ্রেষ্ঠা সুন্দরী। কিন্তু কি কারণে নেবুসাড্ নেজার হঠাৎ উন্মাদ হইয়া যান। উন্মাদ হইয়াও তিনি প্রাসাদ সংলগ্ন বিরাট উপবনে ছাগলের মত চরিয়া বেড়াইতেন এবং মানুষের খাদ্য পরিত্যাগ করিয়া ঘাস চিবাইয়া খাইতেন। প্রাসাদে রাজত্ব করিতেন রাণী—ব্যাবিলোনের সেই শ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

প্রত্যহ সন্ধ্যায় সেনাপতি নামানের সহিত কুঞ্জভবনে রাণীর অভিসার রাত্রি অতিবাহিত হইত। উন্মাদ সম্রাট্ নেবুসাড্ নেজার উপবন হইতে রাণীর অভিসারযাত্রা লক্ষ্য করিয়া বিরাট চিৎকার করিয়া উঠিতেন। তারপর একদা হঠাৎ সেই উন্মাদ সম্রাট্ সোজাপায়ে দাঁড়াইয়া রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করেন। অবসরকক্ষের সম্মুখে সেনাপতি নামান সেই দীর্ঘ বলিষ্ঠদেহ সুস্থমূর্ত্তিকে সম্মুখে দেখিয়া বিমূঢ় হইয়া যান। নেবুসাড্ নেজার গর্জ্জিয়া উঠেন : 'নামান' !

সেই আহ্বানে ভুলিয়া-যাওয়া-ভঙ্গী আপনা হইতে ফিরিয়া আসে। নামান নতমস্তকে প্রভুকে অভিবাদন করে।

তারপর নেবুসাড্ নেজার রাণীর গুপ্ত-অভিসারের জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেন ও বলেন,……'প্রতিদিন সন্ধ্যায় তুমি রাণীকে নিয়ে ঐ উপবনে কুঞ্জভবনে ঢুকতে; তোমাদের চুম্বনশব্দে তৃণফুল রক্তিম হয়ে

উঠ্‌তো। আমি সেইখানে ঘুরে বেড়াতাম। একটা মাছি এলে যতটুকু বাধা হয়, আমার উপস্থিতিতে ততটুকু বাধা তোমরা বোধ করতে না। রাত্রির শেষদিকে দেখতাম, তুমি আর সে, শেষ অন্ধকারে প্রাসাদের দিকে চলেছ। শেষরাত্রির সেই পাণ্ডুর অন্ধকারে তার নগ্ন-শুভ্রতার জ্যোতিঃ দেখে মনে হোত, যেন উপবন থেকে ঊষা চলেছে দিবসের দিব্যজ্যোতিঃ অঙ্গে বহন করে। পিছু পিছু গিয়ে দেখতাম, শত শত ক্রীতদাস রাত্রি জেগে দাঁড়িয়ে আছে—শুধু সেই নগ্ন-মুহূর্ত্তটুকু, অন্ততঃ তোমার মত না হোক, কিছু উপভোগ করবার জন্যে। আমি জানি ক্রীতদাসদেরও কামনা আছে। তুমি, আমি যেমনভাবে রাণীকে চাই, কি বল নামান, তারাও কি মনে মনে, ঠিক সেই কামনাই করে না? শোন নামান! তোমারই উপর আমার আদেশ, কাল রাত্রিতে তুমি নিজে রাণীকে ক্রীতদাসদের মহলে পৌঁছে দেবে।”

পরের দিন সন্ধ্যায়। রাণীর দাসীরা সব প্রসাধন লইয়া ব্যস্ত। কুঞ্জভবনে অভিসারের লগ্ন আসিয়াছে। মরুভূর রক্তকুসুম নিষ্পেষণে অধর রক্তিম হইয়াছে, সারা অঙ্গে চন্দনের সুরভি, অঙ্গে ক্ষীণ অকারণ বস্ত্র! রাণী ডাকিলেন, নামান!

সেই উপবনের পথ। সন্ধ্যার সদ্যফোঁটা ফুলের গন্ধে মধুমান্ সেই অভিসার-রজনীর অন্ধকার।

হঠাৎ কুঞ্জভবনের পথে আসিয়া রাণীর খেয়াল হয়, আজ ত তাঁহার উন্মাদ স্বামীর চীৎকার শোনা গেলনা! এমনি সময় তাঁহাকে আসিতে দেখিলেই সে চীৎকার করিয়া উঠিত। আজ সে কোথায়? ক্রীতদাসীরা অনুসন্ধানে যাইয়া কেহই আর ফিরিয়া আসিল না।

সম্মুখে নামানও প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান।

শঙ্কিতকণ্ঠে রাণী ডাকিলেন, নামান!

রাজ উপবনে তখন সবেমাত্র নিশিগন্ধারা দল মেলিয়া চাহিতেছিল। এমন সময় সহসা রাজপ্রাসাদের ভিতর হইত শত শত ক্রীতদাস আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। রাণী বিস্ময়বিমূঢ় নেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা তাঁহারই দিকে ছুটিয়া আসিতেছে......রাণী ফিরিয়া দেখেন নামানও সেই অন্ধকারের বুকে অদৃশ্য হইয়াছে!......তারপর বহুকাল পর্য্যন্ত সেই কাহিনী মরুবাসিনীদের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, কেমন করিয়া একদা শত শত ক্রীতদাসের চুম্বনে ব্যাবিলোনের রাণীর দেহ চূর্ণিত হইয়া গিয়াছিল।

## সিরিয়া:

পৃথিবী-দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডার যখন সিরিয়া ও ব্যাবিলোনিয়া রাজ্য জয় করেন, তখন ঐ দেশগুলি দুর্নীতির প্রবল বন্যায় ভাসিতেছিল। বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারের নর-নারীগণ উৎসবাদিতে অবাধে মদ্যপান করিত এবং ভোজসভাদিতে আহারের সময় যুবতীকন্যা ও বধূগণ মাতা-পিতা, শ্বশুর-শ্বাশুরী কিংবা স্বামীকে কিছুটা সমীহ করিয়া চলিতেন। কিন্তু শেষটায় মদ্যপান করিতে করিতে যখন নেশা বেশ জমিয়া উঠিত তখন ঐ নারীগণ নিজেদের পোষাকগুলি একটার পর একটা ক্রমান্বয়ে খুলিয়া ফেলিয়া নগ্ন হইয়া যাইত। বধূ-কন্যাদের গুরুজনগণ তখন আলগোছে একদিক দিয়া সরিয়া পড়িতেন। তারপর অন্যান্য অতিথি অভ্যাগতদের সহিত বধূ-কন্যাদের যে জঘন্য রতিমজলিস্ জমিয়া যাইত তাহা বর্ণনা করাও অসম্ভব।

## ফিনিসিয়া ঃ

ফিনিসিয়া, সিরিয়া, অক্কাদিয়া প্রভৃতি দেশেও ধর্ম্মের নামে একপ্রকার অবৈধ যৌনানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইত—ইহাও প্রায় ব্যাবিলোনিয়ার মতই। ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন 'মাইলিত্তা' দেবীর মন্দিরে যে কোন বিবাহিতা বা কুমারী মেয়েকেই জীবনে অন্ততঃ একবার অবৈধ যৌনপাপে লিপ্ত হইতে হইত, তেমনি ফিনিসিয়া, আর্মেনিয়া, অক্কাদিয়া, সিরিয়া প্রভৃতি দেশেও 'আস্তারতে' দেবীর মন্দিরে যে রমণী যত বেশী পরপুরুষ সংসর্গিণী হইত, তিনি নাকি ততবেশী দেবীর আশীর্ব্বাদ লাভ করিত।

তাহা ছাড়া ঐ সকল দেশেও গৃহে অতিথি আসিলে নারীগণই তাহার পরিচর্য্যা করিত এবং ঘরের কুমারীকন্যাগণকে রাত্রিতে অতিথির সহিত সারানিশি যাপন ও অবৈধ সংসর্গে মাতিতে হইত। ফিনিসিয়া দেশে এই প্রথাটি প্রথম বিদেশাগত রাজপুরুষ ও ব্যবসাদারগণকে হাত করিবার জন্য আপনাপন গৃহকন্যাদের দ্বারা তাহাদেব যৌনাভিলাষ পূরণ করতঃ কার্য্য হাসিল করিত, কিন্তু পরে এই পাপ প্রথাটি সহজ সাধারণ অতিথির জন্যও দাঁড়াইয়া গেল। তাহা ছাড়া কুমারী কন্যাগণ দেবীমন্দিরে পরপুরুষগণের নিকট নিজেদের সতীত্ব-বিসর্জ্জন দিয়া যে সকল অর্থ উপার্জ্জন করিতেন তাহা তাহাদের নিজ নিজ বিবাহের যৌতুকরূপে ব্যবহার করা হইত।

## পারস্য ঃ

আদিম পারসী জাতিও দেবতার নামে অবৈধ যৌনোৎসবের প্রশ্রয় দিয়াছিল। তাহা ছাড়া পূজাপার্ব্বন ও উৎসবাদি উপলক্ষে গৃহে আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইত। সকলে মিলিয়া পানোৎসব, নৃত্য ও ভোজনে উন্মত্ত হইয়া উঠিতেন। দেবতার প্রসাদী-করা সুরা বালক

বালিকা নির্ব্বিশেষে সকল বয়সের নারী-পুরুষগণ মিলিয়া পান করিতেন। কোন কোন দিন সুরার মাত্রা অসম্ভবরূপে বাড়িয়া গেলে ছোট ছোট বালক-বালিকাগণ অজ্ঞান হইয়া পড়িত। তারপর গীতবাদ্যের উৎসবে বয়স্ক নর-নারীগণ গা ভাসাইয়া দিয়া ক্রমে দেহে অবসন্নতা আসিলে লাজ-লজ্জা, মান-সম্ভ্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার রক্তের সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া অবাধ রতি-সংগ্রামে মাতিয়া উঠিতেন। সারানিশি এমনি কুৎসিৎ ও পৈশাচিক মদনযজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিয়া উষার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা আবার প্রাচীন সম্বন্ধে ফিরিয়া আসিত।

তখন ইয়োরোপ ও পশ্চিম এশিয়াস্থ দেশসমূহে হাটেবাজারে নর-নারী ছাগল-ভেড়ার ন্যায় বিক্রয় হইত। বহুকাল ধরিয়া এই পাপ-ব্যবসায় চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু পারস্যে ইহার মাত্রাধিক্য পরিলক্ষিত হইত। দাস-ব্যবসায়িগণ বিভিন্ন দেশের দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে অল্পমূল্যে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ ক্রয় করিয়া, কোন কোন ক্ষেত্রে চুরি করিয়া, হাটে-বাজারে তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। প্রায় নগ্নাবস্থায় ঐ সকল স্ত্রী-পুরুষকে সারি সারি দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। তারপর ধনী ক্রেতার দল দাস খরিদ করিতে শুধু খুঁজিতেন তাহার বলিষ্ঠ ও সুন্দর দেহ; কিন্তু দাসী খরিদের বেলা বাছিয়া বাছিয়া বাহির করিতেন অল্পবয়স্কা ও সুন্দরী। অবশ্যই অল্পবয়স্ক নর-নারীর মূল্যও ছিল এজন্য বেশী। তদুপরি সুন্দরী নারী বা সুন্দর দাস হইলে বিক্রেতাগণ দাম আরও বেশী হাঁকিতেন।

নারী খরিদের বেলা ক্রেতাগণ জঘন্য নির্লজ্জতার পরিচয় দিতেন। অনেক সময়ই ক্রেতাগণ ঐ সকল নারীদের লজ্জাস্থানগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া যাচাই করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কারণ ক্রেতাগণ এইসব দাসীবাঁদীদের দ্বারা কেবলমাত্র চাকরাণীবৃত্তিই করাইত না—প্রথমতঃ

ধনীপ্রভু ক্রীতদাসীর রূপ যৌবন নিঃশেষে উপভোগ করিয়া যখন মধু ফুরাইয়া যাইত, তখন ইহাদিগকে সাধারণ দাসী শ্রেণীতেই ফেলিতেন অর্থাৎ ইহার পর বাকী জীবন তাহাদের দাসীবৃত্তি করিয়াই কাটিত। তাহাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সুখ-দুঃখের কোন মূল্যই থাকিত না—তাহাদের ছিল মাত্র সারা দিনরাত্র হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম। এমনিভাবে একের পর আর নূতন দাসী ধনীপ্রভুর আটপৌড়ে মদন পিপাসা মিটাইত কিন্তু সুন্দর ক্রীতদাসগণ অনেক সময় ইহার সুন্দর ঋণ পরিশোধ করিত ধনী প্রভুর গৃহকর্ত্রী বা তাঁহার কন্যাদের শয্যাসাথী হইয়া।

আপন বিবাহিত পত্নীকে অপরকে ধার দেওয়ার পাপপ্রথাটি তখনকার পারস্যে বহুকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। দরিদ্র স্বামীর কিছু টাকা লইয়া স্ত্রীকে কিছুকালের জন্য অন্যের উপভোগের জন্য ছাড়িয়া দিত। এই সময়ের মধ্যে স্বামীর সেই স্ত্রীর উপর কোন দাবীদাওয়া থাকিত না। যে প্রভু ইজারা লইত, সে তাহার উপর নিজের ইচ্ছামত গমন ও বিহার করিত—ইহাতে ঐ নারীর কোনরূপ প্রতিবাদ বা অনিচ্ছা প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা থাকিত না। পারস্যে তখন বহু ব্যাপকভাবে এই পাপ-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। ঠিক এই কারণেই প্রাচীনকালে পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্ত্রীকে একটা বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া মনে করা হইত এবং প্রয়োজন হইলে সোনা-রূপার জিনিষের মত স্ত্রীকে অপরের নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য গচ্ছিত বা বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার লওয়া হইত। মেয়াদ ফুরাইলে আবার স্ত্রীকে ফিরাইয়া লইত। ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি স্ত্রীর গর্ভে সন্তান আসিত, ঐ সন্তানও ইজারাদারেরই হইত এবং মেয়াদ ফুরাইবার সময় যদি কোন স্ত্রীর গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে গর্ভ খালাসের পর সেই সন্তানের পিতা হইত সেই ইজারা-গৃহিতাই। সন্তানের ভরণপোষণের জন্য সে-ই আইনতঃ বাধ্য থাকিত।

হজরৎ মুহাম্মদের উত্তরাধিকারী হজরৎ ওমর এই পত্নীঋণদান পাপপ্রথার উচ্ছেদ করেন।

পারস্যের ইতিহাসে একটা বিরাট সার্ব্বজনীন বিবাহ অনুষ্ঠান জগতের ইতিহাসে একমাত্র দৃষ্টান্ত হইয়া আছে। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার পারস্য বিজয়ের পর তাঁহার ৮০ হাজার সৈন্যকে বিজিত জাতির এক একটী মেয়েকে রীতিমত বিবাহের মধ্য দিয়া গ্রহণ করিতে বলেন। তাঁহার সৈন্তেরা নতমস্তকে তাঁহার এ আদেশ পালন করিয়াছিল এবং আলেকজাণ্ডার স্বয়ং রাজা দায়ুসের কন্যাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতের ইতিহাসে একসঙ্গে একমুহূর্ত্তে এত লোকের বিবাহের কোন নজির নাই। তবে এ বিবাহের মধ্যে যে নারীদের হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল বহে নাই, অনায়াসে তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে। যেভাবে সেদিন তাহাদের বিবাহসভায় উপস্থিত হইতে হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের সেদিন আনন্দ করিবার মত মন ছিল কিনা সন্দেহ। কারণ হয়ত কাহারো চক্ষের সম্মুখে পিতা নিহত হইয়াছে, কাহারো স্বামী নিহত হইয়াছেন এবং কাহারো গৃহের অগ্নিশিখা হয়ত তখনও নিভে নাই—এই শোকোচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয় লইয়া তাহাদিগকে স্বামী-বরণ করিতে হইয়াছিল।

## গ্রীস ঃ

প্রাচীন গ্রীসে "ভিনাস্ পেরিবেসিয়া" মন্দিরে বৎসরে একদিন বিভিন্ন সহরের ও মফঃস্বলের সঙ্গীতানুরাগী ও বংশীবাদিনী নারীগণ উৎসবে মত্ত হইত। সেইদিন নারীদের মধ্যে সুর, সঙ্গীত ও রূপের প্রতিযোগিতা চলিত এবং যে সকল নারী শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করিত তাহারা পুরস্কৃতা হইতেন। এই উৎসবে সারানিশি অতিবাহিত হইত; কোন

পুরুষেরই সেখানে প্রবেশাধিকার থাকিত না। কিন্তু সূর্য্যাস্ত হইতে আরম্ভ করিয়া পরের দিন সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত এই উৎসবে যে সমস্ত নির্লজ্জ কদর্য্যতার অভিনয় চলিত, তাহা সে যুগের পুরুষগণও সহ্য করিতে পারেন নাই। সুর, সুরা, বিবিধ প্রসাধন ও বিলাসখাদ্যে, পুষ্পরাজি ও গন্ধদ্রব্যাদির প্রাচুর্য্যে মন্দিরপ্রাঙ্গন পূর্ণ থাকিত। নারীগণ গীতবাদ্যের প্রতিযোগিতার পর সুরাপানে মত্ত হইতেন। অবশেষে লজ্জা-সরম বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা বিপক্ষদলের সহিত রূপ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মাতিয়া উঠিত। প্রতিদ্বন্দ্বিনী যুবতীগণ পরস্পর নিজ নিজ সৌন্দর্য্যস্থানের বিশিষ্টতা জঘন্যতম অশ্লীল ভাষায় ছড়া কাটিয়া বর্ণনা করিত ও পরে তাহারা একে অপরের সহিত সমরতিলীলায় মাতিতেন এবং বাকী রাত্রিটুকু এমনিভাবেই অতিবাহিত হইত।

এককালে গ্রীসদেশে Homosexuality বা সমমিথুনের প্রাধান্যতা সর্ব্বস্তরের নর-নারীর মধ্যেই বহু ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। গ্রীসের জনকয়েক জগৎপূজ্য দার্শনিক, কবি ও সাহিত্যিকগণ সমমিথুনের ভক্ত ছিলেন। সেই সকল কাহিনী বলিবার পূর্ব্বে প্রথমতঃ সমকাম বা Homosexualityর জন্মেতিহাস সম্পর্কে একটু আলোচনার প্রয়োজন। নারীর প্রতি নারীর এবং পুরুষের প্রতি পুরুষের অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি সাধনের নাম ব্যাপক অর্থে Homosexuality বলা হইয়াছে কিন্তু নারীর প্রতি নারীর ও পুরুষের প্রতি পুরুষের সমপ্রেমের স্বতন্ত্রভাবে দুইটী বৈজ্ঞানিক নাম আছে। পুরুষের প্রতি পুরুষের সমমিথুনের নাম Sodomy ও নারীর প্রতি নারীর সমরতির নাম Lesbianism.

বিশেষ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, সভ্যতা-বিস্তারের পর পুরুষের প্রতি পুরুষের মিথুনানুরাগের প্রথম উৎপত্তি প্রায় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে—প্যালেষ্টাইনের সোডাম প্রদেশে এবং Lesbianism

বা নারীর প্রতি নারীর সমমিথুনানুরাগের উৎপত্তি গ্রীসের Lesbos দ্বীপে।

নারীর প্রতি নারীর সমমিথুনানুরাগের সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ যেভাবে সাধারণকে আলোকিত করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, গ্রীসের Lesbos দ্বীপ এই প্রকার অদ্ভুত রতিকলার প্রথম উৎপত্তিস্থান। লেস্‌বস দ্বীপের স্যাফো নাম্নী এক সম্ভ্রান্ত বংশীয়া যুবতীর এ্যাণ্ড্র‌স্ দ্বীপ নিবাসী এক ধনী ব্যবসাদারের পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয়। স্যাফোর বিবাহিত-জীবন খুব সুখের ছিল না বলিয়া ঐতিহাসিকগণের ধারণা। সে একটী অল্প-বয়স্ক পুত্র কোলে করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই বিধবা হন।······খৃঃ পূর্ব্ব ৬০০ শতকে এই নারী জীবিতা ছিলেন।

পৃথিবীর খ্যাতনামা দার্শনিক প্লেটো এই নারীকে সুন্দরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। স্যাফো যে সুন্দরী ছিলেন তাহার অন্যান্য প্রমাণও পাওয়া যায়। যাহা হউক যৌবনে বিধবা হইয়া শিশুপুত্র ক্রোড়ে স্যাফো পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসেন। মনে-প্রাণে তখনও তাহার ভোগের দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে। ইহাকে নির্ব্বাপিত করিতে স্যাফো কাব্যচর্চ্চায় মন দিলেন; কিন্তু মিথুনরাগ তিনি মন হইতে দূর করিতে পারিলেন না।

গীতি-কবিতাই তিনি বেশী লিখিতেন এবং কতক কবিতা তাঁহার গভীর দার্শনিক তথ্যে পূর্ণ থাকিত। এতদ্ভিন্ন তিনি অনেক প্রেমের কবিতাও রচনা করিতেন; কিন্তু সেই সকল কবিতা সমজাতীয় প্রেমের অর্থাৎ নারীর প্রতি নারীর ভালবাসার। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি যৌনাকাঙ্ক্ষা দমনে সমর্থ না হইয়া ইন্দ্রিয়তৃপ্তির এক অদ্ভুত পন্থা আবিষ্কার করেন। অপর পৃষ্ঠায় স্যাফো রচিত দুই একটী কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ইহা হইতে স্যাফোর সমজাতীয় প্রেমের ও উহার জন্য আক্ষেপের কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যাইবে।

স্যাফো রচিত একটী গানের অংশ বিশেষ এই :

Thcu who rulest all, upon flowers enthroned, Daughters of Zeus, born of foam, thou artful one Hark to my call.

Not in anguish and bilters suffering,
O goddess, let me Perish !......

কোন প্রতিবেশিনী যুবতীকে সম্বোধন করিয়া রচিত তাঁহার একটী বিখ্যাত কবিতার বঙ্গানুবাদ ঠিক এইরূপ দাঁড়ায় :

তোমার বদন হেরিয়া গো সখি
অথির পরাণ মোর ;
পাগল-রক্ত ছুটে চলে যেন
শিরা উপশিরা বুকে—
সারা দেহবাসে জ্বলিয়া উঠিছে
কামের-বহ্নি ঘোর—
বিবস তনু অসার রসনা
ভাষা নাহি ফুটে মুখে !......

ক্রমে ক্রমে স্যাফো এই অস্বাভাবিক প্রেম শিক্ষা দিবার জন্য একটী Boarding School অবধি খুলিয়াছিলেন এবং সেখানে যুবতী মেয়েদের এই বিজাতীয় প্রেমে দীক্ষিত করিতেন অর্থাৎ The young girl early learned to make an unnatural employment of their nascent charms. অবশ্যই এই সমমিথুন ব্যাপারে পুরুষ-নারীর মতই—এক নারী সক্রিয় ও অপরা নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত। এই শ্রেণীর সমমিথুন ব্যাপারে উভয় নারীরই যৌনাবেগ অত্যন্ত প্রবল ও গভীরতর হইয়া উঠিত। স্যাফো এই প্রেমে বহুনারীকেই দীক্ষিতা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যবহারিকভাবে তাঁহার শিষ্যাদের সহিত এই ব্যাপারে নিযুক্তা হইতেন।

গ্রীসের বংশীবাদিনী সমাজের এ্যানাগোড়া, মেগেরা, শীর্ণা, ইউনীকা, ঘ্যাণ্ড্রোমেডা, এনাক্থোরিয়া প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত গণিকা নারীগণ কবি স্যাফোর প্রধানা শিষ্যা ও প্রণয়িনী শ্রেণীভুক্তা হইয়াছিলেন। ওলেব্রাইদিক্ সমাজের বহুনারী এবম্বিধ সমকামের নেশায় ভীষণভাবে মত্ত হইয়াছিল। বহু বহু সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারী মেয়ে স্যাফোর নিকট সমপ্রেমে দীক্ষিত হইয়া আজীবন বিবাহ করেন নাই।

কোন কোন রমণী এইরূপ সমপ্রেমের নেশায় সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক বেশ্যা শ্রেণীভুক্তা হইয়া সমপ্রেমে মত্ত থাকিতেন।

মনোবিজ্ঞানবিদ্গণ স্যাফোর সমমিথুন প্রবৃত্তির মূল অনুসন্ধান করিতে যাইয়া যে সকল তথ্য বাহির করিয়াছেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইল।

স্যাফো আজন্মকাল হইতেই বিলাসিতা ও ঐশ্বর্য্যের মাঝে লালিতা-পালিতা হইয়া বাল্য হইতেই তাহার প্রকৃতিটী হইয়াছিল অনেকটা খামখেয়ালী গোছের। তদুপরি স্যাফো কিছুটা ভাবপ্রবণ ও আবেগময়ী হওয়ার দরুণ তিনি নিজ ইচ্ছাটাকেই অত্যন্ত বলবতী করিয়া ভাবিতেন।

ক্যারাক্সাস্ নামে স্যাফোর এক ভাই ছিল। বালিকা বয়স হইতেই স্যাফো সেই ভ্রাতাকে মন-প্রাণ-দেহ সমাপনান্তর ভালবাসিয়া বসেন। তাহাকেই সে প্রিয়তমের আসনে অধিষ্ঠিত করিয়া দেহদান করিয়া আসিতেছিল। এমন কি বিবাহের পরও তিনি ক্যারাক্সাসকে শ্বশুরালয়ে মাঝে মাঝে ডাকাইয়া পাঠাইয়া ভ্রাতা-ভগিনীর পবিত্র সম্বন্ধকে বিস্মৃতির অতলজলে ডুবাইয়া উভয়ে অবৈধ পাপে নিমগ্ন হইতেন। বিবাহে স্যাফোর আদৌ ইচ্ছা ছিলনা এবং তাহার বিবাহিত-জীবন এই কারণে মোটেই সুখপ্রদ হয় নাই।

তাহার উপর ভালবাসার-জগতে রমণীজাতি চিরদিন ভয়ানক সঙ্কীর্ণমনা, অভিমানিনী ও প্রতিহিংসা-পরায়ণা। জনৈক রহোদোপিস্ জাতীয় বেশ্যার প্রেমে যখন ক্যারাক্সাস্ আত্মহারা, তখন সেই খবর পাইয়া স্যাফো রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে পাগলপারা হইল। তারপর স্যাফো তাহার প্রেমাস্পদের নিকট হইতে প্রত্যাখানের আঘাত পাইয়া তিনি সমগ্র পুরুষজাতির উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিলেন এবং ইহার প্রতিশোধ লইবার মানসে পুরুষের প্রেমকে তিনি হৃদয় হইতে উৎপাটিত করিয়া আবিষ্কার করিলেন—নারীর প্রতি নারীর প্রেমের এক অভিনব পথ। তিনি তাহার কাব্যপ্রতিভাকেও এই সমজাতীয় প্রেমের উৎকর্ষতা সাধনেই নিয়োজিত করিয়াছিলেন। নারীর প্রতি নারীর সমপ্রেম বা সমমিথুনের নাম Lesbian Love ; কিন্তু ইহা স্যাফোর প্রবর্ত্তিত বলিয়া ইহার অপর এক নাম Saphism.

কবি স্যাফো কর্ত্তৃক নারীর রতিপিপাসা মিটাইবার এই অভিনব পন্থাবিষ্কারে ও উহার ব্যবহারিক পরিণতিতে তাঁহার নিজ দেহেরও ক্ষুধা কথঞ্চিৎ তৃপ্ত হইল বটে ; কিন্তু ইহাতে তাহার মনের তৃপ্তি হইল না। স্যাফোর শিষ্যা-প্রশিষ্যার দল এই অভিনব পথের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই নিমগ্ন রহিলেন সত্য, কিন্তু নবপথের জন্মদাত্রী স্যাফোই রহিলেন ইহাতে অতৃপ্তকামা। ফলে যৌবনের শেষ সীমায় পদার্পণ করিয়া স্যাফো ফাওন নামক এক যুবাপুরুষের জন্য প্রাণ ভরিয়া কাঁদিলেন। তিনি গাহিলেন :

'আবার ভালবাসা কাঁদায় মোরে
অমৃত এনেছে সে চিত্ত ভরে!'

তারপর তাহাকে পাইবার জন্য, তাহার এক কণিকা প্রেম লাভের জন্য তিনি কত সাধ্য-সাধনা, কাব্যের ভিতর দিয়া কত আরাধনা,

কত অনুনয় বিনয় করিলেন কিন্তু সেই যুবাপুরুষ তাহার পানে ফিরিয়াও চাহিল না। এই আঘাত সহ্য করিতে না পারিয়া একদা স্যাফো ফাওনকে "Lover's Leap" নামক পাহাড়ের চূড়ায় উপস্থিত করিল ও তাহার চক্ষের সম্মুখে সেখান হইতে পূর্ণিমার চন্দ্রালোকিত সফেন তরঙ্গায়িত নীল সমুদ্রে ঝাপ দিয়া অতৃপ্তকামা অভিগিনী স্যাফো সকল জ্বালা জুড়াইলেন।

স্যাফো মরিলেও তাহার প্রবর্ত্তিত এই অদ্ভুত প্রেম মরিল না। গ্রীসের আলেত্রাইদিস্ বংশীবাদিনী সমাজে অতি বাল্যকাল হইতেই এই আলে-ত্রাইদিস্ সমাজের রমণীগণ স্যাফোর প্রবর্ত্তিত 'লেস্‌বিয়ন লাভ'-এ পরিপক্ক হইয়া কেবলমাত্র যৌবনের কয়েকটী বছরমাত্র পুরুষদিগের সহিত মিথুন-যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিত। কিন্তু কদাচ ইহারা কোন পুরুষকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত না; এমনকি কোন পুরুষের ধরাবাধা রক্ষিতা হইতেও ইহারা অনিচ্ছুক হইত। এই সমাজের নারীগণের পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য থাকিত। পরস্পরে এই অত্যধিক অনুরাগও ইহাদের সমমিথুনের ভক্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। ইহা ছাড়া অল্পবয়স হইতেই ইহারা সমপ্রেমের পথে কিছুকাল বিচরণ করার ফলে তাহাদের ইন্দ্রিয়ক্ষুধা ভীষণ তীব্র হইয়া উঠিত। যৌবনে যে সমস্ত প্রেমিকগণ দেহ-কামনায় তাহাদের নিকট আসিত, তাহারা মিথুনযজ্ঞে নিজেদের অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে আহুতি দিয়া বিদায় লইতেন। কিন্তু এই সমস্ত নারীগণ বাধ্য হইয়াই সমমিথুনের আশ্রয় লইত। ইহাও এই শ্রেণীর রমণীদের সমমিথুনানুরাগের আর একটী কারণ। বহুকাল যাবত এইশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের ভিতর 'লেসবিয়ন লাভ' প্রচলিত ছিল। লুসিয়ানের Dialogues of Courtezans নামক প্রাচীন প্রামাণ্য গ্রন্থেও এই বিজাতীয় প্রেম বা Lesbian Love-এর অনেক উদাহরণ আছে। এখানে প্রসঙ্গতঃ দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ফাইলেমেটাম নামে এক আধা বয়সী প্রৌঢ়া বেশ্যার সহিত চার্মাইড নামে ভদ্রঘরের এক সুন্দরী যুবতী ক্রমান্বয়ে সাত বছরকাল লেসবিয়ন লাভে একান্ত রত ছিলেন। প্রকারন্তরে ঐ প্রৌঢ়া বেশ্যা যুবতী চার্মাইডকে একপ্রকার রক্ষিতার মত রাখিয়াছিল। সে তাহার খাওয়া-পরার যাবতীয় খরচ জোগাইত। কিন্তু যুবতী হঠাৎ একটী সুন্দর যুবককে ভালবাসিয়া বেশ্যাটির নিকট হইতে সরিয়া পড়ে। তাহার জন্য যে কান্না সে কাঁদিল, কোন রমণীর স্বামী বিয়োগেই কেবল সে রকম কান্না কাঁদিতে পারে। কিছুকাল অতিবাহিত হইলে শোকোচ্ছ্বাস যখন একটু মন্দীভূত হইল তখন ফাইলেমেটাম তাহার অতৃপ্ত অদ্ভুত রতিক্ষুধা মিটাইতে ত্রাইফিণী নামে এক যুবতীকে তাহার ঘরে আনিল ও প্রথম নিশি যাপনের পর পর-দিন ভোরে তাহাকে পাঁচ দ্রাকামা ( গ্রীস মুদ্রা ) উপহার দিল। এইভাবে কিছুকাল তাহাদের সমমিথুনলীলা চলিবার পর যখন ফাইলেমেটাম জানিতে পারিল যে, তাহার নবাগতা শয্যাসঙ্গিনী তাহার দিদিমার বয়সী—কেবলমাত্র প্রসাধন চাতুর্য্যে এতদিন তাহার চক্ষুকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, তখন সে নবাগতা সঙ্গিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে, 'বল কি সখী, তুমি আমায় চেয়েও বড় ? তবে ত আমাতে তোমাতে প্রভেদ নাই। এসো, এসো। আমার গণ্ডদেশে চুম্বন দাও, তোমার বাহুবেষ্টনে আমায় বুকে চেপে ধর ; এসো আমরা সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী ভিনাস দেবীর পাদমূলে নিজেদের সঁপে দেই।'

* * * *

মেগিল্লা ও ডিমন্যাস্বী নামক দুইজন আলেত্রাদিস্ নারী তাহাদের প্রতিবেশিনী লীনা নাম্নী এক কিশোরীকে লেসবিয়ন প্রেমে দীক্ষিতা করিয়া কিছুদিন সমমিথুনের ব্যবসা চালাইতেছিল। কিন্তু এই কিশোরীর সহিত এক যুবকের প্রণয় ছিল। যুবক একদা সন্দেহ করিয়া লীনাকে

খুব জেরা করায়, সে সলজ্জ কুণ্ঠায় স্বীকার করিল যে, মেগিল্লা নামে এক প্রতিবেশিনী নারীকে সে গভীরভাবে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে। যুবক লীনাকে সমকামিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে লীনা তাহার প্রথম সমরতির বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিতেছে: I gave myself to her transports and she embraced me like a man; she believed that she was such, as she kissed me, agitated and swooning under the stress pleasure.

ইহা শুনিয়া সেই যুবক লীনাকে আরো জেরা করায় লীনা উত্তর দিতেছে: Do not ask me the rest. It is too disgraceful !...In heaven's name ! I shall not reveal it...

যাহা হউক আর বেশী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লাভ নাই। মোটের উপর স্যাফো প্রবর্ত্তিত এই সমরতির পাল্লায় পড়িয়া বহু বহু আলেত্রাইদিস্ রমণী তাহাদের ব্যবসায়, ধনরত্ন ও সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়াছে; কোন কোন প্রেমাস্পদার জন্য দুই রমণীর মধ্যে খুনোখুনি কাণ্ড পর্য্যন্ত হইয়াছে। অপর-দিকে এই সমকামিতা দোষে ভদ্রপরিবারের অনেক রমণী, সন্ন্যাসিনী এবং ব্রহ্মচারিণীগণও দুষ্টা হইয়াছিলেন।

*　　*　　*

গ্রীসের ক্রীট (ক্যাণ্ডিয়া) দ্বীপে খৃষ্টজন্মের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্ব হইতে পুরুষের প্রতি পুরুষের সমমিথুনরাগ বা Homosexuality প্রচলিত ছিল। যদিও ক্রীটের অধিবাসীবৃন্দ প্যালেষ্টাইন ও এসিয়া মাইনরের কোন কোন দেশ হইতেই ইহা প্রথম শিখিয়া আসে; কিন্তু একমাত্র স্পার্টারাজ্য বাদে গ্রীসের সর্ব্বস্তরের লোকের মধ্যেই ইহা বহু ব্যাপকভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল। বহু শতাব্দী যাবৎ এই প্রকার অস্বাভাবিক মিথুন বহু বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া এককালে ইহা গ্রীসের পূজ্য মনীষীবৃন্দের মধ্যেও

বিস্তারলাভ করে। প্রবলপরাক্রান্ত বহু যুদ্ধজয়ী সেনাপতি, দার্শনিক, কবি, রাষ্ট্রনেতা প্রভৃতিও বালমেহনে দারুণভাবে লিপ্ত ছিলেন।

সম্রাট সোলান্ এই প্রকার প্রকৃতিবিরুদ্ধ যৌনপাপের দ্রুতপ্রসারতা লক্ষ্য করিয়া তিনি বহু সরকারী বেশ্যালয় গঠন করেন ও বারবণিতাদের একটু অধিকরূপে প্রশ্রয় দেন। কিন্তু বিশেষভাবে সম্মানিত ও মহৎ-ব্যক্তিগণ বেশ্যা ও পরদারগমন বিশেষ পাপজ্ঞান করিতেন ও তাহার পরিবর্তে তাহারা বালমেহন বা সমমেহনে লিপ্ত হওয়াটা বিশেষভাবে নির্দোষ আমোদ হিসাবে গণ্য করিলেন। এমনিভাবে সমমিথুনে দেশ বেশ মজিয়া উঠিল। অনেকে ইহাতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়া নারীদের ঘৃণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে গ্রীসের আলেত্রাইদিস্ ও হোতাইরী নামে দুই শ্রেণীর বারবণিতা সমকামীদের এই যৌনবিকৃতিকে স্বাভাবিক পথে প্রধাবিত করিতে বিশেষভাবে যত্নবান হয়েন। কিন্তু গ্রীসের দার্শনিক সমাজ ও অন্যান্য কতকগুলি· লোক কিছুতেই ইহা হইতে বিচ্যুত হইলেন না। অনেকে উভয়বিধ উপায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করিতে অভ্যস্ত রহিলেন।

সেই সময় এথেন্স ও কোরিন্থে বহু বহু দাসব্যবসায়িগণ এসিয়া মাইনর এবং ইজিয়ান প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ হইতে বহু বিভিন্ন বয়সের সুন্দর সুন্দর বালক চুরি করিয়া আনিয়া বা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া আনিয়া গ্রীসের বাজারে অতিশয় উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিত। সমকামের ভক্তগণ এইসব বালক ক্রয় করিতে এক একটা ধনভাণ্ডার ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

নিম্নে দুই একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ দার্শনিকের সমমিথুনপ্রিয়তার ক্ষুদ্র উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে ইহারা কিরূপ সমমিথুনের ভক্ত ছিলেন।

একবার দ্রোসী নামে একজন বংশীবাদিনী সমাজের বারবণিতার ক্লিনিয়াস নামে তাহার এক সুদর্শন নূতন প্রেমিক হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় ঐ নারী তাহার সমব্যবসায়ী কোন বান্ধবীকে দুঃখ করিয়া বলিতেছে: 'দার্শনিক এরিস্তেনেতাস্ আমার নূতন কিশোর-প্রেমিককে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে।' উত্তরে তাহার বান্ধবী বলিতেছে: 'কী আশ্চর্য্য! সেই দাঁড়ি-ওয়ালা দার্শনিকটা পোরেসাইলের বাগানে একপাল ছেলের সঙ্গে ঘৃণ্যতম পাপে লিপ্ত থেকেও কি বুড়োটার জঘন্য বাসনা পরিতৃপ্ত হয়না? তোর প্রেমিকাটীকেও সে তার পাপ পথের সহচর করেছে? তুই সবুর কর, আমি এই ছাগতান্ত্রিক দার্শনিককে আচ্ছা মজা দেখাচ্চি। সেরামিকাশের প্রতি দেয়ালে দেয়ালে লিখে আমি তার এই বিকৃতরুচির কথা প্রচার করে দোব।' ...

এরিস্তেনেতাস্ ছাড়া গ্রীসের অনেক জগতপ্রসিদ্ধ দার্শনিকই নিজ নিজ শিষ্যদের চরিত্রনষ্ট করিয়াছেন। তাহাদের এই অস্বাভাবিক যৌনপাপের সহচর করিয়া নিজেদের ও শিষ্যদের চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল দার্শনিক সাধারণতঃ সমমিথুনের নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেই পছন্দ করিতেন।

থাইয়াস নামে কোন ভদ্রবেশ্যা, দার্শনিক এ্যারিষ্টটলের কোন শিষ্যের নিকট বলিতেছে: Do you think there is so much difference between a sophist and a courtezan?...The one and the other have the same object: to receive....

য়্যালসিবিয়াদিস্ নামে এক সুন্দর যুবকের সহিত দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিসের সমপ্রেম বিদ্যমান ছিল। এই সমকামিতা ব্যাপারে ক্রমান্বয়ে ত্রিশ বছরকাল তাঁহারা লিপ্ত ছিলেন। পেরিক্লিসের প্রথিতযশা প্রণয়িনী

য়্যাসপেসিয়ার সহিত গুরু-শিষ্য উভয়েরই প্রণয় ছিল। য়্যাসপেসিয়া, সক্রেটিস ও তাঁহার শিষ্য য়্যালসিবিয়াদিস্ উভয়কেই খুব ভালবাসিত ও সুবিধামত উভয়কেই দেহদানে তৃপ্ত করিতে কুণ্ঠিতা হইতেন না। কিন্তু ইহাদের গুরু শিষ্যের সমমিথুনের কথা য়্যাসপেসিয়ার অজ্ঞাত ছিল না; ইহাতে তিনি কৌতুক অনুভব করিতেন মাত্র। কখন কখন য়্যাসপেসিয়া এ সম্বন্ধে সক্রেটিসের সহিত খোলাখুলিভাবে আলোচনা করিত। কিন্তু পরে সক্রেটিসের সহিত য়্যালসিবিয়াদিসের ছাড়াছাড়ি হইলে প্রৌঢ় দার্শনিক প্রিয় শিষ্যের বিরহে এতখানি কাতর হন যে, য়্যাসপেসিয়া তাঁহাকে অনেকভাবে সান্ত্বনা দিয়াও শান্ত করিতে পারেন না। এই সময় দার্শনিক সক্রেটিস্ ও য়্যাসপেসিয়ার মধ্যে যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, উহার কতকাংশ জগৎপূজ্য দার্শনিক মহামতি প্লেটো লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। য়্যাসপেসিয়া সক্রেটিসকে বলিতেছে: Listen to me, if you would that the handsome Alcibiadis should return your affection, listen to my wellmeant advice……cease to sigh; become filled with a sacred enthusiasm; elevate your mind to the devine heights of poetry, and that enchanting art shall open to you the gates of the soul. Gentle poesy is the charm of the intelligence; and the ear is a road to the heart, and the heart is a road to everything else.

দার্শনিক সক্রেটিসের সারাদেহ শিহরিত হয়। তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে থাকেন। য়্যাসপেসিয়া তাহাতে বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন ও মিষ্টকথায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন: Why do you weep, my dear Socrates? Will your

heart always be troubled by the love whiep the eyes of that insensible youngman dart foith like lightning ? I promise to bend him for you……

তারপর সুন্দরীশ্রেষ্ঠা য়্যাসপেসিয়া বহুচেষ্টায় য়্যালসিবিয়াদিগের প্রতি সক্রেটিসের আসক্তিকে মুছিয়া দিয়া তাঁহার বিপথগামী প্রবৃত্তিকে স্বাভাবিক পথে তাঁহার দিকে একান্তভাবে ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু য়্যালসিবিয়াদিস ছাড়া ক্রিন্তিয়াস, কবি-নাট্যকার য়্যারিস্টোফ্যানিস্ প্রভৃতি শিষ্যদের প্রতিও নাকি সক্রেটিসের দুর্ব্বলতা ছিল। তাহা ছাড়া সমমিথুন পাপে ভদ্রযুবকদের চরিত্র নষ্ট করার অপরাধে মেলিতাস, য়্যাসাইতাস ও লাইকান নামক তিনজন গ্রীক নাগরিক সক্রেটিসের বিরুদ্ধে রাজদ্বারে অভিযোগ আনেন। ফলে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই দার্শনিকশ্রেষ্ঠ সক্রেটিস বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

সক্রেটিস্ ছাড়া গ্রীসের আরও বহু মনীষীতুল্য ব্যক্তি সমমিথুনে লিপ্ত ছিলেন—গ্রীসের ইতিহাসে উহার বহু নজির আছে।

* * * * *

আইনসঙ্গত বেশ্যাবৃত্তির প্রথম গোড়াপত্তন হয় গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে এবং ইহার প্রবর্ত্তক গ্রীকসম্রাট্ সোলান। ইহার পূর্ব্বে গ্রীসের সর্ব্বত্র যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা—পরদারগমন, কন্যাদূষণ প্রভৃতি পাপ অনায়াসে চলিত। রোমসম্রাট্ লুকো এই দুর্নীতি দূর করিতে কঠোর আইনজারী করেন। এই সকল অবৈধ রতিপাপে যাহারা লিপ্ত হইত, তাহাদের দণ্ড হইত প্রাণদণ্ড। কিন্তু ইহাতেও অবৈধ যৌন-পাপ উচ্ছেদ করা সম্ভব হয় নাই।

প্রাচীন গ্রীসে দুইটী প্রধান রাজ্য ছিল—এথেন্স ও স্পার্টা এবং কোরিন্থ নামে একটা বিরাট সমুদ্রবন্দর ছিল। এই কোরিন্থে এককালে রূপের ব্যবসায় এতদূর প্রসারলাভ করিয়াছিল যে, সকল ব্যবসায়ের উপর ইহা টেক্কা দিয়াছিল।

সমগ্র গ্রীকদেশেই বহু প্রকারের বেশ্যাবৃত্তি চলিত কিন্তু তৎসত্ত্বেও দেশে অবৈধ যৌনপাপ বিদ্যমান ছিল।

স্পার্টারাজ্যের আইন প্রণেতা নেতা লাইকারগাস স্পার্টার প্রত্যেক নর-নারীকে দৈহিক শক্তিসঞ্চয়ের জন্য ব্যায়াম প্রথা বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নারী-পুরুষে কোনই ভেদাভেদ রাখিলেন না। নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীগণ রাস্তা-ঘাট, সভা-সমিতি ও ব্যায়ামাগারে দৌড়-ঝাপ, কুস্তি প্রভৃতি বিবিধশ্রেণীর ব্যায়াম একত্রে করিত। নারীদিগের পোষাক ছিল অত্যন্ত সাদাসিধা ও উহ রা ঘাগরার মত করিয়া উহা পরিত এবং কোমরের নিম্নের দিকে পোষাকটীর দুইধার দ্বিখণ্ডিত থাকায় নারীগণের লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলাফেরা করিতে কোন অসুবিধা হইত না। কিন্তু পোষাকের এই সুবিধাটুকু লইয়া তাহারা তাহাদের গোপনঅঙ্গ অতি সহজেই উন্মুক্ত করিয়া পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ইহাতে নারী-পুরুষেব অবাধ মেলামেশার যে ফল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভদ্রঘরের মেয়েরা রাষ্ট্রীয় এই ঔদাসিন্যের ফলে প্রকাশ্য ব্যাভিচারে একান্তভাবে লিপ্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন—নারীগণ লজ্জা-সরম হারাইয়া ফেলেন। তাহা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে স্পার্টানের স্বামীগণ স্ত্রীকে যে কোন সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুরুষের সহিত বিহার করিতে দিতে কোনপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতেন না। রাষ্ট্রেরও অনুমতি ছিল সুসন্তানের জন্ম দেওয়া। এই নিমিত্ত অসুন্দর, রুগ্ন ও ক্ষীণাঙ্গ সন্তানের জন্ম হইলে সেই

সন্তানকে পর্ব্বতের উপর হইতে ফেলিয়া দিয়া মারিয়া ফেলিবার পাপপ্রথাও লাইকারগাসের শাসন সময়ে প্রচলিত ছিল।

গ্রীসের ইতিহাসে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের কথা কে না জানেন। পরিপূর্ণ যৌবনে তিনি অর্দ্ধ পৃথিবী জয় করিয়া সুরার পাত্রে জীবন-বিসর্জ্জন দেন। নারী ও মদ্যবিলাসী হিসাবে তিনি ইতিহাসে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন।

গ্রীসে যাহারা ধাত্রী ছিল, সেইসকল নারীগণ তুক্‌তাক্‌, প্রেমের ও বশীকরণ ঔষধপত্রের ব্যবসায়ের সঙ্গে গোপনে বেশ্যাবৃত্তি করিত। গ্রীসে হাতেকলমে বেশ্যাবৃত্তি শিক্ষা দিবারও বহু স্কুল ছিল।

মন্দিরের সেবাদাসী বলিয়া গ্রীসে একশ্রেণীর নারী ছিল, যাহারা সামান্য দুই তিন পয়সা পাইলেই পুরুষের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিত। কতপ্রকার বেশ্যাবৃত্তি যে গ্রীসে প্রচলিত ছিল তাহার সংখ্যা নিরূপণ করাও শক্ত। কোরিন্থ বন্দরে দুর্নীতি এতদূর প্রসারতা লাভ করিয়াছিল যে, প্রতি লোকের বাড়ীকে গণিকালয় বলিলে বিশেষ অতিশয়োক্তি করা হয় না।

## রোম :

অমর ফরাসীকবি থিওফিল গ্যতিয়ের কথাই মনে হয় : সেই অতীতের পৃথিবীর সঙ্গে তুলনা করিলে আমাদের আজিকার এই পৃথিবীকে কত দীন নগণ্য বলিয়া মনে হয়। সেদিন রোমের অধীশ্বরেরা বা প্রাচ্যদেশের এক একজন রাজা যে সকল ভোজের আয়োজন করিতেন, আজ জগতের সকল ধনী একত্রিত হইয়াও তাহার কল্পনা করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রতিদিন যাহা খাইতেন, আজ তাহা আমাদের কাছে বিরাট রাজসূয়যজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। লুকুল্লাস তাহার কয়েকজন বন্ধুকে একরাত্রিতে যে ভোজ দিয়াছিলেন, আজ তাহা একটা সহরের সকল

লোককে খাওয়ান যাইতে পারে। আজিকার এই অতি সুসভ্য যুগের শীর্ণ বিবর্ণ দরিদ্র সমালোচকেরা সেই বিশালভাবে থাকার বিস্ময়কর অস্তিত্বের কল্পনাই করিতে পারিবেন না। আজিকার যুগের প্রাসাদতুল্য ভবনে কালিগুলাসের ঘোড়ার আস্তাবলও হইত না। রোমের কোন উচ্চশ্রেণীর রক্ষিতা বারাঙ্গনার বছরে যে সাবান লাগিত তাহার মূল্য ছিল ২০ লক্ষ টাকারও উপর।

অতীতের ঐশ্বর্য্য-গৌরবে গরীয়ান বিলাসিতার লীলাভূমি…তিলে তিলে গড়িয়া তোলা তিলোত্তমা…রূপগর্ব্বে ডগমগ প্রাচীন রোম-নগরী, যাহার সম্বন্ধে প্রবাদ আজিও আকাশে বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়: Rome was not build in a day—উৎকট যৌনব্যাভিচার আর প্রবল বিলাসবন্যায় সেই রোম নগরীও একদিন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছিল।

রোমের সমাজ-জীবন ও যৌনেতিহাসের সামান্য কয়েকটী ছিন্নপত্র নিম্নে তুলিয়া ধরিতেছি। প্রথমেই তার সম্রাট্গণের চরিত্র কাহিনী দুইএক কথায় বর্ণনার প্রয়াস পাইব।

প্রথমেই আসিয়া পরে দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সীজারের কথা। তখনকার গৌরবময় রোমীয় সমাজে দিগ্বিজয়ী বীর জুলিয়াস সীজারকে Husband of all men's wives বা সকল লোকের পত্নীগণের স্বামী নামে অভিহিত করা হইত। জুলিয়াস সীজার তাঁহার সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত বংশীয় রাজকর্ম্মচারিদের অধিকাংশের কন্যা ও বধূগণের সতীত্ব ছলে, বলে বা কৌশলে অপহরণ করিয়াছিলেন। ব্রুটাস নামে তাহার এক প্রিয় সহচরের মায়ের প্রতি সীজার আকৃষ্ট হন ও তাহাকে নাকি তিনি প্রকৃত ভালবাসা প্রদান করিয়াছিলেন। এই নারীর নাম ছিল সার্ভিলিয়া। জুলিয়াস সীজার রোমের প্রথম কনসাল হইয়াই

সার্ভিলিয়াকে একটী বহুমূল্য মুক্তা উপহার দেন।... সার্ভিলিয়া তাঁহার গর্ভজাতা কন্যাকেও সীজারের কামানলে আহুতি প্রদান করেন।

সীজার মিশর-সম্রাজ্ঞী ক্লিওপেট্রারও গর্ভ উৎপাদন করিয়াছিলেন ও ক্লিওপেট্রার স্বামীকে মিশরের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া ক্লিওপেট্রাকে মিশরের একেশ্বরী করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহাতে ক্লিওপেট্রার নিজের দোষই ছিল বেশী। সীজারের আরও একটী গোপন আসক্তি ছিল সমমিথুনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ প্রবৃত্তি। তাহার এই আস্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি ধরা পরে সীজারের বিথোনিয়া বিজয়ের পর। বিজিত বিথোনিয়ার রাজা নিকোমিদিস্ সিজারের শিবিরে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হন। নিকোমিদিস্ অত্যন্ত সুপুরুষ ছিলেন। ভোজশেষে শিবিরের মাঝে সীজার ও নিকোমিদিস্ এক শয্যায় শয়ন করিলে সীজারের সেই গোপন গণিকাবৃত্তি প্রকাশ পায় এবং তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নিকোমিদিসকে আহ্বান করেন। একথা পরে তাহার সৈন্যেরাও জানিয়াছিল এবং তাহারও ইহা লইয়া হাসি তামাসা করিত। তাহা ছাড়া সীজারের নামের সহিত Husband of all men's wives যেমন যুক্ত হইয়াছিল তেমনি অনেকে ইহার সহিত আরো খানিকটা যুক্ত করিয়াছিলেন : and the wife of all the husbands. ইহার অর্থ কি ছিল তাহা উক্ত ঘটনা হইতেই পাওয়া যায়।

• অগাষ্টাস্ সীজার—পূর্ব্বনাম অগাষ্টাস্ অক্টোভিয়াস। ইনিই রোমের প্রথম সম্রাট্। যৌবনে অগাষ্টাস্ সীজার অসংখ্য সুন্দরী বারবণিতার সহিত তাঁহার যৌনক্ষুধা মিটাইয়া শেষে তিনি ভদ্রনারীদের প্রতি মন দেন এবং নগর ও পল্লীর বহু বহু সুন্দরী কুমারী ও বিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করেন। যে সব কর্ম্মচারিগণ তাহাকে রূপসী নারী জুটাইয়া দিতে লাগিল, তাহাদের

সমাদর ও পদপসার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং তাহারা যথেষ্ট পুরস্কৃতও হইত। এইভাবে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত তিনি তিন সহস্র বিবাহিতা ও কুমারী নারীর সতীত্ব অপহরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন সীজারের ন্যায় সমমিথুনের নিষ্ক্রয় ভূমিকা গ্রহণ করিবার দুষ্প্রবৃত্তি ইঁহারও ছিল।

রাজকুমারী জুলিয়া—সম্রাট্ অগাষ্টাস্ সীজারের একমাত্র রূপসী কন্যা জুলিয়ার চরিত্র ছিল ভয়ানক রকমে কদর্য্যতাপূর্ণ। একবার ইনি দেবমন্দিরে দেবতার পিছনে দাঁড়াইয়াই পর পুরুষের সঙ্গে সহবাসরতা হইয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজকুমারী জুলিয়া বহু প্রেমিকের নিকট নিজের দেহ দান করিয়া অবশেষে পিসিমার ছেলে মার্সেলাসের সহিত চৌদ্দবছর বয়সে তাঁহার বিবাহ হয়। সম্রাট্ অগাষ্টাস্ বিবাহ করিয়াছিলেন তিনটী। জুলিয়া ছিলেন সম্রাটের দ্বিতীয়া পত্নী স্কাইকেনিয়ার গর্ভজাতা। মার্সেলাসের সঙ্গে জুলিয়ার বিবাহ হওয়ার দুই বৎসরের মধ্যে মার্সেলাসের মৃত্যু হয়। সম্রাট্ অগাষ্টাস্ পুনরায় তাঁহার প্রধান সেনাপতি এগ্রিপ্পাকের সঙ্গে জুলিয়ার বিবাহ ঠিক করিলেন। সম্রাটের আদেশে বিবাহিত সেনাপতি এ্যাগ্রিপ্পাক তাহার পূর্ব্ব বিবাহিতা পত্নী মার্শেলকে পরিত্যাগপূর্ব্বক জুলিয়াকে বিবাহ করিল। এই বিবাহ হয় জুলিয়া বিধবা হওয়ার দুই বৎসর পরে অর্থাৎ জুলিয়ার অষ্টাদশ বর্ষ বয়সের সময়। মাঝের এই দুই বৎসরে জুলিয়া বহু প্রেমিককে আত্মদান করিয়া অনেকের সঙ্গেই গোপন অভিসার করিয়াছেন।

এদিকে সম্রাট্ অগাষ্টাস তাহার দ্বিতীয়া পত্নীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক লিভিয়াক্রুশীলা নামে তাঁহার এক কর্ম্মচারির মধ্যবয়স্কা সুন্দরী স্ত্রীকে জোর করিয়া বিবাহ করিলেন। লিভিয়াক্রুশীলার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত দুইটী পুত্র ছিল। বড় পুত্রটী ছিল প্রায় জুলিয়ার সমবয়স্ক। তাহার নাম ছিল টাইবেরিয়াস ক্লডিয়াস। টাইবেরিয়াসের বুদ্ধি চাতুর্য্যের

অভাব ছিল না। দুই একবার সে যুদ্ধে সেনাপতির পদ গ্রহণ করতঃ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়া সম্রাট্ অগাষ্টাস অর্থাৎ তাহার সৎপিতাকে মুগ্ধ করিয়া উচ্চপদ লাভ করেন।

এদিকে ২৮ বছর বয়সে অর্থাৎ খঃ পূঃ ১২ সালে রাজকুমারী জুলিয়া দুইটী পুত্র ও সাত মাসের গর্ভ লইয়া পুনরায় বিধবা হইলেন। টাইবেরিয়াস তখন রোমের সিংহাসন লাভের আশায় বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময় সে বৃদ্ধ সম্রাট্ অগাষ্টাসের সম্মতি লইয়া বহু উপভোগ্যা রাজকুমারী জুলিয়া অর্থাৎ বৈমাত্রেয় ভগ্নিকে বিবাহ করিল। কিন্তু তাঁহাদের এ বিবাহ মোটেই সুখের হইল না। কয়েক বছর পরে সম্রাট্ অগাষ্টাস তাঁহার সৎপুত্র এবং জুলিয়ার তৃতীয় জামাতা টাইবেরিয়াসকে বিশেষভাবে ঘোষণাপূর্ব্বক পোষ্য গ্রহণ করতঃ রাজপ্রতিনিধিরূপে তাহাকে রোডাসে প্রেরণ করিলেন। স্বামীর প্রবাসকালে জুলিয়া তাহার ইচ্ছামত পরপুরুষের সহিত রতিপাপে নিমগ্না হইয়া তাহার রাক্ষুসী ক্ষুধার তৃপ্তি-সাধন করিতে লাগিল। জুলিয়ার বয়ঃক্রম তখন সাঁইত্রিশ অতিক্রম করিয়াছে। সেই বয়সেও তাহার ইন্দ্রিয়বাসনা তৃপ্ত না হওয়ায় সে কেবলই নিত্য নূতন প্রেমিককে নিযুক্ত করিতেছিল। অবশেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে তাহার পাপকুৎসা রাস্তাঘাটে লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতেছিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অগাষ্টাস ও টাইবেরিয়াস অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ও তাহাকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন।

সম্রাট অগাষ্টাসের প্রিয়বন্ধু কবি ওভিডাসও জুলিয়ার সহিত প্রেমচর্চ্চা করিতেন। কবি ওভিডাস তাঁহার কাব্যগ্রন্থের একস্থানে যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, উহার উপর আস্থাবান হইলে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, সম্রাট্ অগাষ্টাস্ জ্ঞান-বিবেক হারাইয়া সন্তানস্নেহের পবিত্র সম্বন্ধকেও কলঙ্কিত,করিয়াছিলেন।

টাইবেরিয়াস—সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই টাইবেরিয়াস নিজেকে কামের উদ্দাম স্রোতে ভাসাইয়া দিলেন। প্রথমতঃ তিনি রাজকর্ম্মচারিদের অন্তঃপুরে দৃষ্টি দিয়া তাহাদের যুবতী কন্যা ও বধূদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইলেন। ম্যালোনীয়া নামে জনৈক সভ্রান্ত বংশীয়া রূপসী তাহার কুপ্রস্তাবে অস্বীকৃতা হওয়ায় তাহাকে বিচারকের হস্তে সমাপন করা হইল, কিন্তু বিচারের পূর্ব্বেই ঐ সতী রমণী আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। শেষ বয়সে টাইবেরিয়াস ক্যাপ্রী নামক এক ক্ষুদ্র দ্বীপে এক কাম-ভবন নির্ম্মাণ করিয়া উহার ভিতরে ও বাহিরে যে সকল জঘন্যতম রতিচিত্র ও মূর্ত্তি এবং অস্বাভাবিক কাম পরিতৃপ্তির যে সমস্ত উদাহরণ প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

একদা তাহার নবনিযুক্ত বালক ভৃত্যদ্বয়ের উপর টাইবেরিয়াস তাঁহার অস্বাভাবিক কামবৃত্তি মিটাইতে অগ্রসর হইলে উক্ত বালকদ্বয় অনুশোচনায় মৃদুভাবে প্রতিবাদ করায় নিষ্ঠুর সম্রাট্ টাইবেরিয়াস্ তৎক্ষণাৎ তাহাদের পা গুলি কর্ত্তিত করিবার আদেশ দেন! ·····এই কামপিশাচ টাইবেরিয়াসের প্রতিরাত্রিতে একটী করিয়া অক্ষতা কুমারীর সতীত্ব অপহরণ করিতে না পারিলে নাকি তাঁহার সুনিদ্রায় ব্যাঘাত হইত!! ট্যাসিটাস্ ও সুয়েটো-নিয়াসের রচনাবলীর উপর সামান্যমাত্র আস্থাবান হইলে বলিতে হয়, জগতে অদ্যাবধি এমন কোন যৌনপাপ সৃষ্ট হয় নাই যাহা রোম সম্রাট্ টাইবেরিয়াস কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত না হইয়াছে।

ক্যালিগুলাস্—প্রথম যৌবনে সম্রাট্ ক্যালিগুলাস্ ক্যাটালাস্ নেষ্টার, ভেলেরিয়াস্ প্রভৃতি রাজ্যের সভ্রান্ত বংশীয় যুবকদের সমমেহন পাপে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তৎপর তিনি বেশ্যাদের উপর আয়কর স্থাপন করেন ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে বাছাইকরা সুন্দরী বেশ্যাদের আনিয়া একটা

সরকারী বেশ্যালয় স্থাপন করেন। উচ্চদর্শনী দিয়া যে কোন লোকের রাজপ্রাসাদে প্রবেশ পূর্ব্বক ইচ্ছানুরূপ যে কোন রমণীর সহিত রমণ করা চলিত।

সম্রাট্ ক্যালিগুলাস্ কৈশোরে ও যৌবনে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার সমস্ত ছোট ও বড় ভগিনীদের সতীত্ব নষ্ট করেন। প্রৌঢ়াবস্থায় নিজ সম্মানিত ব্যক্তিগণকে সপরিবারে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি পছন্দমত যে কোন মহিলাকে হাত ধরিয়া পার্শ্বের গুপ্ত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন ও সেই প্রকোষ্ঠে তাহার দেহ উপভোগ করতঃ রাজসভায় ফিরিয়া আসিয়া অশ্লীল ভাষায় সেই রমণীর দেহ-উপভোগের বিবরণ সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচার করিতেন।

ক্লডিয়াস জার্মেনিকাস—ক্লডিয়াস সম্রাট্ ক্যালিগুলাসের খুড়া। ক্লডিয়াস্ প্রথমতঃ মেসালিনা নামক এক দুশ্চরিত্রা সুন্দরী নারীকে পাপপথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া বিবাহ করিলেন। মেসালিনা হইলেন ক্লডিয়াসেব তৃতীয়া পত্নী। হঠাৎ সম্রাট্ ক্যালিগুলাস নিহত হইলে খুড়া ক্লডিয়াস পঞ্চাশ বছর বয়সে রোমের সম্রাটের আসন অধিকার করেন এবং অতঃপর মেসালিনা সম্রাজ্ঞী হন। সম্রাজ্ঞীর আসনে বসিয়াও গতযৌবনা মেসালিনা নার্সিসাস্, পল্লাস্ প্রভৃতি ক্লডিয়াসের কয়েকজন মুক্তদাসের সহিত নির্লজ্জ প্রেমলীলা আরম্ভ করিলেন। ইহাদের সাহায্যে মেসালিনা রাজ্যের অভিজাত সম্প্রদায়কে শুধু শুধু যথেচ্ছা উৎপীড়ন করিতে লাগিলেন। বিচারের ভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন।

একদা মেসালিনা সাইলিয়াস্ নামক এক অভিজাত বংশীয় সুন্দর যুবকের বিচার করিতে যাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হন ও তাহার সহিত বেশ কিছুদিন অবৈধ রতিপাপে নিমগ্না থাকেন। ক্লডিয়াস এই ব্যাপার জানিয়া শুনিয়াও হু শব্দটী করিতেন না। কারণ মেসালিনা ক্লডিয়াসকে

হাতের পুতুলে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু তারপর একদিন যখন মেসালিনার সহিত সাইলেসিয়ার গোপন-বিবাহ হইতেছিল, তখন মুক্তদাসগণ তাহাতে বাধা দেয় এবং তাঁহাদের উভয়কেই হত্যা করে।

মেসালিনার মৃত্যুর পর বৎসর ক্লডিয়াস তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী য়্যাগ্রিপিনাকে বিবাহ করেন। য়্যাগ্রিপিনা পূর্ব্ব হইতেই ঘোরতর দুশ্চরিত্রা ছিল। সে নিজের বৃদ্ধ স্বামী ডোমিটিয়াস্‌কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে। এই ডোমিটিয়াসের ঔরসে য়্যাগ্রিপিনার গর্ভে যে ছেলের জন্ম হয়, পরবর্ত্তীকালে তিনি সম্রাট্ হন। তাঁহারই নাম সেই ইতিহাস কলঙ্কিত নিষ্ঠুর ও খেয়ালী সম্রাট্ নীরো।

নীরো—বাল্য হইতেই নীরো ছিল উচ্ছৃঙ্খল ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। কিশোর বয়সেই তিনি নারীসুলভ স্বভাববশে সর্ব্বদা মেয়েদের ন্যায় হাবভাব প্রকাশ করিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময় সমমিথুন ক্রিয়ার নিষ্ক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া নীরো নিজ ও বৈমাত্রেয় ভগিনীগণের সতীত্ব হরণ করেন। সম্রাটের আসনে আরোহণ করিয়া নীরো সর্দ্দার ওথোর পত্নী পপিয়ার প্রেমে আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাহারই প্ররোচনায় নীরো আপন মাতাকেও হত্যা করিয়াছিলেন এবং স্বীয় পত্নী অক্টেভিয়াকে পরিত্যাগ করিয়া পপিয়ার পানিপীড়ন করেন। রোম নগরীর সকল সুন্দরী রমণীগণ তাঁহার কামানলে আহুতি প্রদান করিয়াও তাঁহার দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিকে শান্ত করিতে পারে নাই। অবশেষে নীরো প্রত্যহ সন্ধ্যায় বেশ্যালয় পরিভ্রমণে বাহির হইতেন এবং যদৃচ্ছা কামক্ষুধা মিটাইতেন। স্নানে, ভোজনে, ভ্রমণে, রাজকার্য্য পরিদর্শনে, সর্ব্বদাই তিনি অসংখ্য সুন্দরী রমণী পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন। অবশেষে তিনি নেপলস্ দ্বীপে একটা গণিকা-উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপন প্রবৃত্তির তৃপ্তি খোঁজেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসের গ্রন্থ হইতে জানা যায়, একবার তিনি রোম কর্ত্তৃক বিজিত গ্রীসে ভ্রমণ করিতে যাইয়া গ্রীসের নাগরিকগণ কর্ত্তৃক আদর আপ্যায়ন ও অসংখ্য সুন্দরী যুবতীর সঙ্গলাভ করিয়া এতটা পরিতৃপ্তি লাভ করেন যে, ইহার জন্য তিনি গ্রীসের স্বাধীনতা প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন! এমনি ছিল তাহার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা। বিলাস-প্রিয়তা এমনিভাবে নীরোর চরিত্রে প্রোথিত হইয়াছিল যে—রোম নগরী পুড়িয়া ধ্বংস হইয়া যায়, তখনও নীরো বেহালা বাজাইয়া চলিয়াছে!

শুধু নারীপ্রিয়তাই নীরোর বৈশিষ্ট্য ছিল না; তিনি বালমেহনেরও একজন ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি স্পোরাস্ নামে চতুর্দ্দশ বর্ষীয় একটী বালককে বিশেষ জাক্‌জমক সহকারে লক্ষ লক্ষ টাকার অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি যৌতুক দিয়া সর্ব্বজন সমক্ষে বিবাহ করিয়া ইতিহাসে একন নূতন দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। এই বালক অতিশয় প্রিয়দর্শন ছিল। রাজ চিকিৎসক দ্বারা নীরো এই বালক স্পোরাসের পৌরুষত্ব লুপ্ত করিয়াছিলেন। ইহাকে নীরো নারীর ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া রাখিতেন। শেষ জীবনে মহাপাপিষ্ঠ সম্রাট নীরো কুৎসিৎ রতিজ রোগে আক্রান্ত হইয়া এই বালক-বধূর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়াই মারা গিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণের লেখনী হইতে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায়, মাতৃত্বের সবচেয়ে পবিত্র সম্বন্ধকেও এই মহাপাপিষ্ঠ নীরো কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

সম্রাট্ নীরোর পতনের পর ফ্ল্যাভিয়ান বংশের যে কয়জন সম্রাট্ রোমের সিংহাসন কলঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নীরোকেই আদর্শ মনে করিয়া জঘন্যতম পাপপথে, কামনার উদ্দামস্রোতে নিজেদের বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সম্রাট্ হেলিওগেবেলাস্ অনেক ক্ষেত্রে নীরোকেও ছাপাইয়া উঠিয়াছিলেন কিন্তু তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন মাত্রই ৪ বৎসর কাল। বাল্য ও কৈশোরে হেলিওগেবেলাস্ পশুযোদ্ধা, কুস্তিগীর

প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের নিকট নিজকে গণিকার ন্যায় জাহির করিয়া আপনার অস্বাভাবিক বৃত্তির তৃপ্তি খুঁজিত। সমমেহন প্রবৃত্তিবশে তিনি চৌদ্দ বছর বয়সে সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই জিরোক্লিস নামে তাঁহার এক সহিসকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং এই সহিসের নিকট মাঝে মাঝে চাবুকের আঘাত প্রাপ্তও হইতেন; তথাপি তিনি হাসিমুখে সে অত্যাচার সহ্য করিতেন! এমনিই ছিল তাঁহার এই সমকামের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দুষ্প্রবৃত্তি! অবশ্য তিনি উভকামীই ছিলেন—বিভিন্ন নারীদের প্রতিও তিনি অত্যাচার কম করেন নাই। অবশেষে মাত্র ১৮ বছর বয়সে এই পাপাচারী সম্রাট্ শৌচাগারের মাঝে অতি নির্ম্মমভাবে নিহত হন।

এইবার তৎকালীন রোমীয় সমাজের কবি, সাহিত্যিক, বক্তা ও সাধারণ নাগরিকগণের সম্পর্কে সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করা যাইতে পারে।

প্রবল বিলাস বন্যায় সারা রোমনগরী তখন ভাসমান ছিল। রোমীয় সম্রাটগণের চরিত্রই যে কেবলমাত্র দূষিত ছিল তাহাই নয়; তৎকালে রোমীয় সমাজে সম্ভ্রান্ত নাগরিক, কবি, সাহিত্যিক, বক্তা, সাধারণ নাগরিকগণ প্রভৃতি সকলেই পরকীয়া প্রেমে মজিতে বিশেষ আগ্রহান্বিত হইতেন। গৃহস্থের অন্তঃপুরেও পৌরাণিক দেব-দেবীগণের নানারূপ কামলীলার ফ্রেস্কো চিত্র সকল শোভা পাইত।

দেশের সর্ব্বত্র বেশ্যাবৃত্তি বিশালপক্ষ বিস্তার করিয়াছিল। এত রকম-বে-রকম ভাবে রকমারী নামে রূপের বেসাতি প্রচলিত ছিল তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তদুপরি গ্রীক্‌জাতির সংস্পর্শে আসিয়া রোমান জাতির চরিত্রহীনতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রকারান্তরে গ্রীক্‌দের চরিত্রহীনতা রোমানদের যেন প্রেরণা যোগাইত। তদুপরি

গ্রীক্ রূপপিয়াসীর দল রোমে হানা দেয়, ফলে দুশ্চরিত্রতা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ার ন্যায় আরো প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।

রোমীয় স্নানাগার, ক্ষৌরাগার (সেলুন), সরাইখানা এবং যত্রতত্র স্থানে নর-নারীর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের ব্যবস্থা ছিল। নানাস্থানে রূপের ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়া ভদ্রলোকেরা বেশ দু'পয়সা উপায় করিত। এমন কি অনেকেই বাড়ীতে দু'একজন বেশ্যা পুষিয়া রাখিয়া রূপের ব্যবসায় করিতেন। সরাইখানাগুলিতে দুই চারিজন করিয়া নারী থাকিত, যাহারা সামান্য দর্শনীর বিনিময়ে আগতব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিত। ক্ষৌরাগার প্রভৃতিতেও সেরূপ ব্যবস্থা ছিল। রোমান স্নানাগারগুলি ছিল আরও জঘন্যতম। এখানে ভদ্র নারী ও পুরুষের যে জঘন্যতম রতিমজলিস্ জমিয়া যাইত তাহা বর্ণনা করাও দুঃসাধ্য। এই স্নানাগারের সংস্পর্শে আসিয়া বহু বহু ভদ্রঘরের বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীদের পরকাল ঝরঝরে হইয়া যাইত। এখানে অনেক দুশ্চরিত্র লোকের কবলে পড়িয়া অনেক কিশোরী তাহাদের প্ররোচনায় অকাল যৌনপক্কতা লাভ করিত। অনেক বালক-বালিকা মুখমেহন বা fellatio শিক্ষালাভ করিত এই স্নানাগারে আসিয়া। অনেকানেক বালক-বালিকাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বেশ দু'পয়সা উপায় করা হইত। অনেক ভদ্রঘরের তরুণীরা এই উপায়ে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করিয়া সতীত্ব বজায় রহিল বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিত। অনেক পুরুষ বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরীগণের দ্বারা এই উপায়েও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ করিত।

মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের ন্যায় রোমের দেবমন্দিরেও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার চরম ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। রোমের রণদেবী 'ভিনাস' সম্পূর্ণ উলঙ্গময়ী—তিনি নর-নারীর প্রণয় ব্যাপারে উৎসাহদাত্রী। উচ্ছ্রিতাদ্রিয় উলঙ্গ

দেবতা প্রায়াপাস-এর মূর্ত্তি যেখানে সেখানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবতার নামাকরণ হইতেই প্রায়াপিজম্ বা ইন্দ্রিয়-উচ্ছ্বাস নামক যৌনব্যাধির নামাকরণ করা হইয়াছে। আবার মিউনিটাস্ দেবমন্দিরে প্রত্যেক বিবাহার্থিনী কুমারী কন্যাকেই মিউনিটাস্ দেবতার নিকট কুমারীত্ব বিসর্জ্জন দিতে হইত। এই মিউনিটাস্ দেবতা ছিল অবিকল একজন পরিণত মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট। সেই উলঙ্গ প্রস্তরমূর্ত্তি দেবতা সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন ও তাঁহার যৌনেন্দ্রিয় উচ্ছ্রিতাবস্থায় উদ্ধিত রহিত। বিবাহের দিন প্রাতে অনেক সধবা নারী একত্রিতা হইয়া বিবাহার্থিনী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া সেই দেবতার মন্দিরে উপস্থিত হইতেন মন্দিরের পুরোহিত কেবলমাত্র সেই কন্যাকে হাত ধরিয়া দেবতার সমীপে লইয়া যাইতেন— কন্যা অগ্রে ফুল চন্দন দিয়া দেবতাকে পূজা করিয়া তাহার কোলে এমনভাবে বসিত যাহাতে দেবতার উদ্ধিত ইন্দ্রিয় তাহার স্ত্রীঅঙ্গে প্রবিষ্ট হইয়া সতীচ্ছদ ( hymen ) ছিন্ন করিয়া দিত।

তৎকালে রোমীয় মহিলাগণ উপযাচিত হইয়া যাদুবিদ্যাবিশারদগণের দ্বারা যৌনসম্ভোগ করতঃ নিজেদের সম্মানিতা বোধ করিতেন। এইরূপ সম্ভোগকে তাঁহারা খুব উপভোগ্য ও আনন্দদায়ক ব্যাপার মনে করিতেন এবং এই মিলনের ফলে উৎপাদিত সন্তানগণ নাকি বেশ তেজোদৃপ্ত ও বীর্য্যবান হয় বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ছিল।

রোমের প্রসিদ্ধ লাটিন কবিগণ যথা : হোরেস, প্রর্সিয়াস্, টিবিউলাস্, ভার্জ্জিল, ওভিড্, ক্যাটালাস্, মার্সিয়াল, জুভেনাল, পেট্রোনিয়াস প্রমুখ কবিগণ সকলেই পরকীয়া প্রেমের ও বিশেষ করিয়া সমমিথুনের ভক্ত ছিলেন। রাজকবি হোরেস দুইটী ভদ্রবালককে রক্ষিতার ন্যায় রাখিয়াছিলেন। কবি মার্সিয়াল একদা একটী কিশোর বালককে লইয়া বালমেহন পাপে নিমগ্ন থাকা কালীন তাঁহার স্ত্রীর নিকট হাতে-নাতে ধরা পড়েন।

এই ব্যাপারে স্ত্রী তাহাকে তীব্র ভাষায় ভৎ'সনা করিলে মার্সিয়াস নির্লজ্জ বেহায়ার মত এবিষয়ে উল্টা তর্ক জুড়িয়া দেন। স্বামীর এই দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি শোধরাইতে না পারিয়া অবশেষে কবিপত্নী নিজেই সেইরূপ অস্বাভাবিক যৌনতৃপ্তি প্রদানে অগ্রসর হন। ইহাতে কবি মার্সিয়াল আনন্দে আটখানা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখন বালমেহন প্রভৃতি রোমে স্ত্রীসঙ্গম হইতে অনেক উচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছিল। বিদ্রোহী দার্শনিক নীট্সের নিম্ন বক্তব্য হইতে এ বিষয়ে কতকটা দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে: The erotic relations of men with boys was a necessary and unique conditions in the education of the males, to an extent which our intelligence cannct grasp. Woman had no other duty but to give birth to beautiful healthy bodies in which the spirit of the father would come to life again. It was this factor that sustained the youthfulness of Greek civilization for a relatively long period.

রোমে বালমেহন প্রিয়তার মূলে এই ভিত্তিই স্থাপিত ছিল। তৎকালে গ্রীস ও সমগ্র এসিয়া মাইনরের ন্যায় পুরুষ-বেশ্যাবৃত্তি রোমেও বহুল প্রচলিত ছিল। মুক্তদাস ও ক্রীতদাসগণের সন্তানগণ এই পুরুষ বেশ্যাবৃত্তি করিত। সাত বৎসর বয়স হইতেই ইহাদের এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইত এবং বারো বছর বয়স হইতে তাহারা এই দুর্ব্যবসায়ে নামিত এবং বাইশ বছর বয়স পর্য্যন্ত তাহাদের ব্যবসায়ের পুরা মরসুম থাকিত। অবশ্য ইহার পরেও কেহ কেহ বিশিষ্ট রূপ ও গুণের দ্বারা লোককে আকর্ষিত করিবার ক্ষমতা অর্জ্জন করিত।

এই প্রকাশ্য পুরুষ বেশ্যা ছাড়া ভদ্রপরিবারেও অনেক ভদ্রলোক আপন পুত্রকন্যা, জননী ও স্ত্রীর চক্ষের সম্মুখেই অনেক গোলাম-বালকের সেবা

গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর তৎকালে রোমীয় সমাজে ইহা কোন দোষনীয় ব্যাপার ছিলনা।

এই শ্রেণীর গোলাম-বালক বা পুরুষ বেশ্যারা অনেকেই গান-বাজনা ও নৃত্যকলা জানিত। এমন কি বড় বড় সভা মজলিসেও বাই খেম্‌টার ন্যায় ইহাদেরও মুজরা দেওয়া হইত।

তবে পুরুষ বেশ্যাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী বিভাগ ছিল – এক শ্রেণী সক্রিয় ও অপর শ্রেণী নিষ্ক্রিয়। যাহারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিত, সেই সকল পুরুষ বেশ্যাগণ সাধারণতঃ একটু বেশী বয়সেরই হইত। পনেরো হইতে পঁয়ষট্টি বছর বয়স্ক পর্য্যন্ত সকল বয়সের লোকই ইহাদের নিকট যাতায়াত করিতেন, তবে সাধারণতঃ বৃদ্ধদের আনাগোনাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

আরো যে সকল ঘৃণ্যতম যৌনপাপের নজির রোম রাখিয়া গিয়াছে তাহা ব্যভিচারের চরম নিদর্শন। অবশ্যই মিশর প্রভৃতি দেশেও এই সকল পাপের অস্তিত্ব যে একেবারে ছিলনা তাহা নহে; কিন্তু প্রকাশ্য পশু বেশ্যালয় স্থাপন একমাত্র রোমীয় ইতিহাসেই পাওয়া যায়। তিনশ্রেণীর পশু বেশ্যালয় রোমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। যথা :—Ansararus, Belluarus ও Caprarus. এই তিনশ্রেণীর পশু-বেশ্যালয়ে একশ্রেণীর নারকীয় মনোবৃত্তি সম্পন্ন নারী-পুরুষের গতায়াত ছিল। প্রথমোক্ত Ansararus পশুবেশ্যালয়ে থাকিত শিক্ষিত রাজহংস ও রাজহংসীর দল। এই শ্রেণীর রাজহংস মিথুনের মূল প্রেরণা যোগাইয়াছিল রোমীয় পরিকল্পিত দেবরাজপত্নী-ইন্দ্রানী ‘লেডা’। লেডা আসিয়া মর্ত্ত্যলোকে জন্ম লইলে দেবরাজ ইন্দ্র রাজহংসরূপে লেডার নিকট প্রেম-নিবেদন করিতে আসিতেন। এইরূপ হংসমিথুনরতা লেডার মূর্ত্তি ও চিত্র রোমে প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানেও সেই সকল চিত্রাদি দুর্লভ নহে। যাহা হউক সেই

লেডার চরিত্র হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াই এইশ্রেণীর মৈথুন পরিকল্পনা প্রকৃত রূপ পাইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ Belluarus পশুবেশ্যাভবনে থাকিত শিক্ষিত কুকুর-কুকুরী ও বানর-বানরী। তৃতীয় Caprarus পশুবেশ্যালয়ে থাকিত ছাগী। এতদ্ভিন্ন গ্রীসে প্রচলিত Lasbianism বা লেসবিয়ান লাভেও রোমান নারীগণ অনেকে পরিপক্কা ছিলেন।

ইহার পর আমরা দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিতেছি : ভূমধ্য সাগরের তীর ধরিয়া বারোজন দরিদ্র, অর্দ্ধশিক্ষিত লোক হাঁটিয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সম্মুখে কত রাজার মুকুট খসিয়া পড়িতেছে, কত বীর সৈনিক অস্ত্রত্যাগ করিয়া নতজানু হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার যত কিছু হীনতা, ক্ষুদ্রতা ভুলিয়া কত নারী তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়া যাইতেছে। তথাপি তাঁহাদের অমূল্য উপদেশের অর্থ কি সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল? তাহা বলা যায়না— কারণ বহু দুঃখ কষ্ট ও বিরোধিতা তাঁহাদের বরণ করিয়া লইতে হইয়াছিল।

কে তাঁহারা? তাঁহারা ছিলেন যীশুখৃষ্টের দ্বাদশজন অনুচর। খৃষ্টীয় ধর্ম্মবোধের দারিদ্রের পরিকল্পনা এই দ্বাদশজন অনুচরের জীবনাদর্শেই সৃষ্ট হইয়াছিল।

তখন হইতে খৃষ্টধর্ম্মের প্রচারকার্য্য দেশে দেশে চলিতেছে—স্থানে স্থানে নিদারুণ বিরোধিতা দেখা দিয়াছে। পৌত্তলিকতাবাদী রোমেও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ভীষণ বাধার সৃষ্টি হইল। রোমানগণ খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে ভীষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন।

রোমে প্রবল বিলাসবন্যা ও ব্যভিচারের স্রোত তখনও প্রবাহিত হইতেছিল। সম্রাট্ ডায়োক্লিসিয়ানের রাজত্বের সময় হইতে রোমের এই ব্যভিচারের স্রোত বাধাপ্রাপ্ত হয়। যদিও তিনি খৃষ্টানদিগকে পীড়ন করেন তথাপি স্বধর্ম্মীয়দের পাপপথ হইতে ফিরাইতে তিনি বিশেষভাবে চেষ্টিত

হন। মার্কস আবেলিয়াসের সময় খৃষ্টান কুমারীদের প্রতি অত্যাচার চরমে উঠে। খৃঃ পূর্ব্ব ৭০০ শতকে রোমে দেবদাসী প্রথা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রোমীয় দেবমন্দিরের এই দেবদাসীগণকে 'ভেসটাল ভার্জ্জিল' নামে অভিহিত করা হইত। ইহারা অতি পবিত্র কুমারী জীবন যাপন করিত। ইহাদের কাজ ছিল অগ্নি চিরপ্রজ্জ্বলিত রাখা। ইহাদের পদস্খলন হইলে শাস্তি ছিল ভীষণতর—মৃত্যুদণ্ড। ইহারা কুমারীকাল হইতেই কোনদিন ইন্দ্রিয় সম্ভোগ জানিত না এবং আজীবন দেব-মন্দিরে অতি কঠোরভাবে ব্রহ্মচারিণীর ন্যায় বাস করিত। কিন্তু আবেলিয়াসের সময় খৃষ্টান কুমারীদের জোর করিয়া ধরিয়া সৈন্য ও রাজকর্ম্মচারিগণের দ্বারা তাহাদের সতীত্ব হরণ করানো হইত ও পরে মন্দিরের দেবদাসী করিয়া পৌত্তলিক দেবতার পূজায় বাধ্য করানো হইত। যাহারা দেবপূজায় অসম্মতি প্রকাশ করিত কিংবা অমনোযোগী হইত, তাহাদের প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া উলঙ্গাবস্থায় টানিয়া লইয়া বেশ্যালয়ের সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। পথিকদের মধ্যে যদি কেহ ইহাদের উপর অত্যাচার করিত, তাহাতে কোন দোষ ছিল না। তখন হইতে 'ভেস্‌টাল ভার্জ্জিল' প্রথা লুপ্ত হয়।

তারপর ১১৭ খঃ অব্দে সম্রাট্ ট্রাজানের মৃত্যুর পর রোমের অধঃপতন পরিপূর্ণতা প্রাপ্তি হয়। কিন্তু অপর দিকে ধীরে ধীরে পৌত্তলিকবাদী রোম খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষা লইল।

ইহার পরে বহু ভাঙ্গাগড়ার ভিতর দিয়া রোমের বিস্তৃত রাজ্য খর্ব্ব হইয়া ইতালীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইল। তখন হইতে আরম্ভ হইল পোপদের একাধিপত্য।

কোন কিছুতেই যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ভাল নয়—তাহার প্রমাণ যুগ যুগ ধরিয়া আমাদের চক্ষের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রবল ব্যভিচারের বন্যায় যেমন রোমের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল, তেমনি

রোমে খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদের প্রতি কঠোরতর ইন্দ্রিয় দমননীতি চালানোর ফলে আবার একদিন ধর্ম্মগুরু পোপদের প্রাসাদে প্রবল ব্যভিচারের স্রোত বহাইয়া দিল। কারণ মানুষ স্বভাবতঃই বিলাসপ্রিয়—দেহের ক্ষুধা মানুষ কোন দিনই অস্বীকার করিতে পারে নাই। তখন রোমান ক্যাথালিক নীতিতে আচার্য্য বা পাদ্রীদের নারী ও ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। বিবাহ ও যে কোন প্রকার সম্ভোগ ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। আর এই নীতি পালনের জন্য পাদ্রী মহামণ্ডলের কঠোর পাহাড়া বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু তাহার পরিণাম কি হইল—যৌন-ব্যভিচার ও দুর্নীতি এতটা মাত্রা ছড়াইয়া উঠিল যাহা শুনিয়া কানে আঙ্গুল দিতে হয়।

পোপের আবাসস্থল ভ্যাটিকান প্রাসাদ!

যে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা একদিন বলিয়া গিয়াছিলেন: 'স্বর্গস্থ আমার পিতার প্রাসাদ ইটকাঠে তৈয়ারী নয়, মহাব্যোম তাঁর সিংহাসনের চাঁদোয়া'—সেই ধর্ম্মের গুরু পোপের প্রাসাদের দেয়ালে কামনাময় ফ্রেস্কোচিত্রের জন্য ডাক পড়িত শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোর। যে ধর্ম্ম ত্যাগের আদর্শকে সর্ব্ব উচ্চে স্থান দিয়াছিল, সেই ধর্ম্মের প্রধান অনুচারীর শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়া নগ্ন সুন্দরী তরুণীগণ করিত কামকেলি। নারী-বিবর্জ্জন প্রতিজ্ঞ পোপ পরিচালিত হইতেন কামাচারী নারীগণের দ্বারা।

হাজার বছর আগে। শার্লমেনের সাম্রাজ্যগৌরব অস্তমিত হইবার পর হইতেই পোপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য আরো বাড়িয়া গেল। ঠিক এই সময়ে আলেকজান্দ্রিয়ার সম্ভ্রান্ত কুলললনা থিওডোরা নিজের দুইটী যুবতী মেয়েকে লইয়া ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসাইয়া ঐশ্বর্য্য ও যৌনতৃপ্তি একসঙ্গে লাভ করিতে অগ্রসর হইল। তাহাদের প্রধান শিকার হইল ধর্ম্মগুরু পোপ। তারপর রাষ্ট্রনায়ক ডিউক প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়। থিয়োডোরার মেয়ে দুইটীর নাম ছিল মরোসিয়া ও থিয়োডোরা। ইহারা

যেমন রূপলাবণ্যবতী ছিল তেমনি ছিল ইহাদের বুদ্ধি-চাতুর্য্য ও অসাধারণ সম্ভোগ প্রবৃত্তি। তদুপরি সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাসম্পন্ন টুস্কানী ও ডিউকেরা ছিলেন ইহাদের আত্মীয়। কাজেই ইহারা বিজয়গর্ব্বে অভিযান সুরু করিল।

ধর্ম্মগুরু পোপের প্রাসাদে তখন ব্যভিচারের বন্যা প্রবাহিত হইতে সুরু হইয়াছে। পোপের চিত্তদৌর্ব্বল্যের সুযোগ লইয়া ইহারা ভ্যাটিকান প্রাসাদেও হানা দিল। পোপ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের নিকট দেহ বিলাইয়া দিয়া ইহারা অপরিমিত ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া উঠিল। পোপ তৃতীয় সার্জ্জিয়াসের কাম-সহচরী রূপে বড় বোন মরোসিয়া চতুর্দ্দশ বছর বয়সেই সর্ব্বত্র অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। মবোসিয়া পোপের সহচরীর ক্ষমতাবলে নিজের পছন্দ মাফিক কাম-সহচরদিগকে সুউচ্চ ধর্ম্মপীঠে উন্নীত করিয়া দিত। কিন্তু পোপ তৃতীয় সার্জ্জিয়াসের মৃত্যুর পর মরোসিয়া তাহার জনৈক প্রণয়াস্পদ আনাষ্টাসিউসকে পোপের গদীতে বসাইল এবং অতঃপর দুইটী বোনে ভাগাভাগি করিয়া এই নূতন পোপের দেহ-উপভোগ করিতে লাগিল। কিন্তু এরই মধ্যে আবার তাহাদের মা আপন প্রণয়াস্পদ লডোকে পোপের আসনে বসাইলেন; কিছুদিন গত হইতে না হইতেই মায়ের প্রেমাকাশে উদয় হইল জন্ নামে জনৈক নধরকান্তি তরুণ। ফলে ইনি হইলেন পোপ দশম জন। তারপর মায়ের মৃত্যু হইলে পর বড় বোন মরোসিয়া যখন দেখিল পোপ তাহার দিকে ততটা নজর দিতেছেন না—তখন সে পোপকে গোপনে এক রাত্রে হত্যা করিল।

এরপর পোপের আসনে দুই ভগিনীর খেয়াল-খুসী মাফিক যে-সে বসিতে লাগিল। নিজেদের জারজ সন্তানদেরও ইহারা পোপের গদীতে বসাইতে লাগিলেন। ধর্ম্মকে লইয়া এমন ছিনিমিনি খেলা কোন যুগে, কোন দেশে ঘটে নাই।

জারজ পোপ নিজ পাশব প্রবৃত্তির তাড়নায় নিত্য নব কুলবধূ ও যুবতী কুমারী নারীদের লইয়া যে যৌন-উৎসব সুরু করিয়া দিলেন তাহার শেষ মীমাংসা একদিন শাণিত কৃপাণের মুখেই হইয়া গেল।

ইহার পর রঙ্গমঞ্চে আসিয়া দেখা দিল সৌন্দর্য্যললামভূতা, নবযৌবনা, সদ্যবিধবা একটী মেয়ে। নাম ডোনা ওলিম্পীয়া। ইনিও প্রখর বুদ্ধিশালিনী, তদুপরি ইনি ছিলেন আবার স্বামীঘাতিনী। পোপের আসনে তখন দশম ইনোসেণ্ট্। সম্পর্কে পোপ ছিলেন ওলিম্পীয়ার দেবর। পোপের প্রতিপত্তি তখন পৃথিবী-জোড়া। সারা খৃষ্টান-জগৎ হইতে বিপুল ধনসম্পদ আসিয়া পোপের ধনভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। এই দেখিয়া ওলিম্পীয়ার মনে বিরাট ঐশ্বর্য্যশালিনী হইবার প্রবল বাসনা জাগিল। অর্দ্ধ-পৃথিবীময় যিনি বিরাট আধিপত্য বিস্তার করিয়া আছেন, সেই ঈশ্বরের প্রতিনিধিকে যদি নিজের হাতের মুঠায় না আনিতে পারিলাম তবে বৃথাই এই রূপ-যৌবন। হইলও তাহাই। ওলিম্পীয়ার রূপ-যৌবনেব সম্মোহন জালে পোপ ধরা দিলেন– ডোনা হইল পোপের গুপ্তসঙ্গিনী ও শয্যাবিলাসিনী। ক্যাথোলিক খৃষ্টান জগতের একাধিপতি পোপের হৃদয়াধিশ্বরী ওলিম্পীয়ার ইচ্ছায় পোপের বিপুল ধনভাণ্ডার ব্যয়িত হইত। নিজ অভিলাষ সিদ্ধির অন্তরায় হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এই কুটনীতিজ্ঞা নারী আপন সন্তান ডন্ ক্যামিলোকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই গুপ্তপ্রণয়ে প্রথমটায় কানাঘুষা চলিতে থাকিলেও পরে কিন্তু তাহা সারা ইয়োরোপে ছড়াইয়া পড়িল। এমনকি এই কলঙ্ককাহিনী লইয়া দেশে দেশে নানারূপ নাটক রচিত হইয়া অভিনীত হইতে লাগিল।

দিনের পর দিন বিভিন্ন পোপের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে পাপ ভ্যাটিকান প্রাসাদে জমা হইতেছিল, তাহাই একদিন সারা খৃষ্টান-জগতে বিক্ষোভের

বিরাট লেলিহান শিখা বিস্তার করিল। খৃষ্টান সমাজ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গেল। মার্টিন লুথার প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন।

ইহার পর নৈতিক অধোগতির চূড়ান্ত নিদর্শন পোপ আলেকজেণ্ডার বোর্জিয়ার সময়ের রোমের সম্বন্ধে দুই চারিটি ইঙ্গিত করিয়াই রোমের কলঙ্ক ইতিহাসের যবনিকা টানিয়া দিতে চাই। রোমীয় সমাজে ব্যভিচার এ সময়ে এতটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, যাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। জারজ সন্তান, গণিকা আর ব্যভিচারীর দল ছিল তখন সমাজের শিরোমণি ! অভিজাত সম্প্রদায়ে ন্যায় নীতি বলিয়া কোন কিছুই ছিল না। যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল যেন ভদ্রত্বের একমাত্র পরিচয়। নিজের স্ত্রী, ভগিনী ও মেয়েকে লম্পটের ভোগে ইন্ধন যোগাইবার প্রেরণা দেওয়া হইত। গীর্জ্জায় গীর্জ্জায় প্রকাশ্যে দেওয়া হইত নানারূপ কামোদ্দীপক বক্তৃতা ; আর পোপের ভ্যাটিকান প্রসাদ ছিল একটা বিরাট গণিকালয়— বিভৎস যৌন-উৎসব দিবারাত্রি ধর্ম্মগুরুর প্রসাদে ব্যভিচারের স্রোত বহাইত। অসংখ্য উলঙ্গ নারী পোপের শয্যা ঘিরিয়া থাকিত। শত্রুকে গোপনে বিষ প্রয়োগে হত্যা করাটা তখন রীতিমত একটা রেওয়াজ হইয়া উঠিয়াছিল। রোমের জনগণ সেদিন যৌন-ব্যভিচারে ভগবানের আসনকেও কিভাবে কলঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল, জনসমাজ ব্যভিচারের প্রবল বন্যায় কি ভাবে নিজেকে বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পোপের গদীতে তখন আলেকজেণ্ডার বোর্জিয়া। হায় ! ধর্ম্মের গুরু হইয়া ধর্ম্মের এতবড় অপমান বুঝি আর কেহ কোনদিন কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। আলেকজেণ্ডার আর তাঁহার নিজের ছেলে সিজার একই সময়ে নিজের ঔরসজাত কন্যা লুক্রেসিয়া ও সহোদরা ভগিনী লুক্রেসিয়ার উপর উপগত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিতেছে ! কামাচারিণী বোন ভাইকে

প্রেরণা যোগাইতেছে বাপকে হত্যা করার জন্য। রোমের ইতিহাসে ইহার চেয়ে কলঙ্কমলিন কাহিনী আর কি হইতে পারে!!! দুর্দান্ত যৌনপ্রবৃত্তি যে মানুষকে এতখানি উদগ্র করিয়া তুলিতে পারে, রক্ত সম্বন্ধও কাম-পরিপূরণের অন্তরায় হইতে পারে না—এ বোধশক্তি ধর্ম্মগুরুর সর্ব্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও আলেকজেণ্ডারের ছিল না! অথচ বিদেশী রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীন কর্ত্তব্য সম্পাদনের ক্ষমতা নিজহস্তে পরিচালিত করিবার জন্য তিনি তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার রাজনৈতিক বুদ্ধিচাতুর্য্য প্রয়োগ করিতেন। রোমক চার্চ্চের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিনায়ক হইবার জন্য তিনি নিজের সুন্দরী মেয়ের দেহও কার্ডিয়াল শ্রেণীর ধর্ম্মশ্রেষ্ঠীদের দ্বারা ভোগ করাইয়াছিলেন। অবশ্য তাহাতে তিনি তাঁহাদের সম্মতিও লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক বোর্জিয়াদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন: They are geniuses of amorality. They know neither good nor bad.

অবশেষ পাপের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম একদিন ঘটিলই—গোপন বিষে আলেকজেণ্ডার বোর্জ্জিয়ার পোপ-জীবনের অবসান হইল।

## ভারতবর্ষ:

প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন ও যৌন-ইতিহাসের অনুসন্ধানে আমাদের বৈদিক যুগে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ঋগ্বেদ জগতের আদি গ্রন্থ বলিয়া প্রমাণিত। প্রথমতঃ বেদগুলির সম্বন্ধে সামান্য একটু ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন।

অথর্ব্ব বেদে মারণ, বশীকরণ, উচাটন, ভোজবাজী প্রভৃতি বিষয়ের বিবিধ সূত্রাবলী পরিদৃষ্ট হয়। বেদের সমস্ত সূক্তগুলিই প্রকৃতিদত্ত জিনিষের বিকাশ ও ভগবানে আত্ম-নিবেদন। মুনিঋষিরা ছিলেন জাতির

পথ প্রদর্শক। কৃষি, বাণিজ্য, কলা, বিজ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহারাই ছিলেন অগ্রগামী এবং সমস্ত বিষয়েই তাঁহারা একটা ধর্ম্মের বাঁধুনি আঁটিয়া দিতেন। ধর্ম্মবিশ্বাস তখন সকলের একই প্রকার ছিলনা, তবে তাঁহারা সকলেই মনে করিতেন যে, আমরা সকলে একই স্থানে উপনীত হইব। বৈদিকযুগে ধর্ম্মবিশ্বাসটা লোকের মনে কি করিয়া আসিল তাহাও দেখা দরকার।

তখনকার লোকজন মন্ত্রতন্ত্র প্রচার করিয়াও যখন দেখিতে পাইল যে, অনাবৃষ্টির ফলে শস্য উৎপাদিত হইতেছে না, অতিবৃষ্টির ফলে শস্যের ক্ষতি হইতেছে; রৌদ্রাভাব, জলাভাব প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে যখন তাঁহারা বাধাপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মনে এই বিশ্বাস জন্মিল যে, প্রকৃতি ছাড়াও এমন কতকগুলি অদ্ভুতশক্তি (Super-natural powers) আছে, যাহার ফলে এইরূপ ঘটায়। কাজেই তখন সেই অদ্ভুতশক্তির প্রতি তাঁহাদের একটা ধর্ম্ম-বিশ্বাস আসিল এবং তাঁহারা মেঘের রাজা ইন্দ্র, জলের রাজা বরুণ, অগ্নি ও সূর্য্যকে ভগবান আখ্যা দিয়া তাঁহাদের তুষ্টির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে যজ্ঞই হইল দেবতা তুষ্টির শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান।

ঋষিগণ হইলেন এই যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রধান হোতা। ঋষিপ্রবর্ত্তিত পদ্ধতিতে মন্ত্রোচ্চারণ ( মন্ত্র মানে দেবতাগণকে নিবেদন ) পূর্ব্বক যজ্ঞে তাঁহারা বিসর্জ্জন দিতে শিক্ষা করিল। প্রথমতঃ ঘৃত, গরু, ঘোড়া, শূকর প্রভৃতি আহুতি দিত এবং সেই যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় তাঁহারা সকলে মিলিয়া সোমরস পান করিত ও পরে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে অবাধভাবে যৌনসম্পর্কে মত্ত হইত।

বৈদিক যুগের এই অবাধ যৌনমিশ্রণকে তেমন দোষারোপ করা চলে না; কারণ সভ্যতা তখন তেমনভাবে ঘাঁটি বাঁধিতে পারে নাই।

তখনকার যুগে কোন নির্দ্দিষ্ট বা সুসামঞ্জস্য পন্থা, স্বাস্থ্য সুস্থা বিচার করিয়া গৃহীত হয় নাই। তখনকার যুগ কেবল পরীক্ষার যুগ—সভ্যতা গড়িয়া উঠার যুগ। তখনকার সমাজে যৌন-সংমিশ্রণ কেবলমাত্র মানুষ বৃদ্ধির জন্যেই প্রচলিত ছিল। এই অবস্থা কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর দলবদ্ধভাবে বিবাহ বলিয়া একটা প্রথা প্রচলিত হইল; কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, একজন মেয়ে একদল পুরুষকে যৌনসঙ্গ দান করিতেছে এবং উহার ফলে যে সন্তান জন্মিতেছে তাহাতে কাহারো কোন অধিকার থাকিতেছে না, তখন তাঁহারা সন্তানের প্রতি মাতার দাবী বলিয়া একটা প্রথার সৃষ্টি করিলেন। নারীগণ বিভিন্ন পুরুষের সহিত যৌনসঙ্গ করিলেও সন্তানাদি জন্মিলে তাহার উপর মাতারই সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিল। এমনিভাবে বহুকাল অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বোক্ত বৈদিক যুগের অবসানের পর ঋক্ ও যজুর্ব্বেদীয় যুগের আরম্ভ।

ঋক, যজুর্ব্বেদীয় যুগে শত শত বৎসরের প্রচেষ্টায় ঋষিগণ যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতাকে সুসামঞ্জস্যতা দান করিয়া আট প্রকার বিবাহের সৃষ্টি করিলেন এবং উহাতে তাঁহারা একটী পুরুষ ও একটী নারীকেই একত্রে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টিত হইলেন; কিন্তু এই প্রথাও আবার অনেক রকমের ত্রুটি-বিচ্যুতি লইয়া দেখা দিল অর্থাৎ একটী পুরুষ ও একটী নারী দুই প্রকারে মিলিত হইত—(১) চিরদিনের জন্য ও (২) অল্প সময়ের জন্য। এই মিলিত জীবনের বাহিরেও অন্য পুরুষ বা অন্য নারীর সঙ্গে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিলে তেমন কোন দোষাবহ ব্যাপার ছিল না।

মহাভারত পাঠে জানা যায়, অতি প্রাচীনকালে ব্যাভিচার দোষ মানবসমাজে দোষ বলিয়াই গণ্য হইত না। জন্ম-প্রবাহ সংরক্ষনার্থে স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সংযোগ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। কিন্তু বেদাদি গ্রন্থে যদিও প্রজা সৃষ্টির জন্য অযোনী সম্ভোগ ও অন্যান্য অলৌকিক প্রক্রিয়ার

কথাও জানা যায়। কিন্তু মন্ত্রব্রাহ্মণে নারীর উপস্থ দেশকে (যোনি) প্রজাপতির দ্বিতীয় মুখ বলিয়া বর্ণিত করা হইয়াছে। *

মহাভারতে মহারাজ পাণ্ডু কুন্তীদেবীকে বলিতেছেন: "হে পতিব্রতে রাজপুত্রী! ধর্ম্মজ্ঞেরা ইহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানেন যে, প্রত্যেক ঋতুকালে স্ত্রী স্বামীকে অতিক্রম করিবে না, অবশিষ্ট অন্যান্য সময়ে স্ত্রী স্বচ্ছন্দচারিণী হইতে পারে, সাধুজনেরা এই প্রাচীন ধর্ম্মের কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।" ইহার দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, স্ত্রীলোকগণ প্রাচীন সময়ে কেবলমাত্র ঋতুকালে স্বামী ভিন্ন অন্য পুরুষে উপগতা হইত না, কিন্তু অন্য সময়ে তাহারা স্বচ্ছন্দে অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারিত।

পাণ্ডু আরও বলিতেছেন যে, 'স্ত্রীলোকগণ পূর্ব্বে গৃহে রুদ্ধা থাকিত না, তাহারা সকলের সহিতই আলাপ করিত, সকলেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইত। স্ত্রীগণ ছিল স্বতন্ত্রা—পরতন্ত্রা নহে। উহারা রতিসুখার্থ স্বচ্ছন্দে যে-সে পুরুষে উপগতা হইতে পারিত—যে-সে পুরুষের নিকট যাইতে পারিত। তাহারা কুমারী অবস্থা হইতেই ব্যাভিচারিণী হইত এবং উহাদের পতিরা কোন বাধা প্রদান করিত না ও উহা কোন অধর্ম্ম বলিয়াও পরিগণিত হয় নাই।' কি প্রকারে এই প্রথা লোপ পায় সেকথা মহারাজ পাণ্ডুর কথায়ই ব্যক্ত হইতেছে: পূর্ব্বকালে উদ্দালক নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। শ্বেতকেতু দ্বারাই প্রথমে স্ত্রাগণের স্বচ্ছন্দ বিহার প্রথায় বাধাদানকারী মর্য্যাদা স্থাপিত হয়। অবশ্যই শ্বেতকেতু কোপাবিষ্ট হইয়াই এই মর্য্যাদা স্থাপন করেন। একদা উদ্দালক, শ্বেতকেতু ও তাহার মাতা উপবিষ্ট আছেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ আসিয়া শ্বেতকেতু-মাতার হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, "এসো আমরা যাই" বলিয়া নির্জ্জনে লইয়া গেলেন। ঋষিপুত্র পিতাকে ইহার

* প্রজাপতের্মুখমেতদ্ দ্বিতীয়ম্।—মন্ত্রব্রাহ্মণ।

কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া যাহা অবগত হইলেন, তাহাতে শ্বেতকেতু কুপিত হইল। উদ্দালক পুত্রকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন: "বৎস কুপিত হইও না—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। জগতে সকল বর্ণের স্ত্রীই অরক্ষিতা। গাভীগণের ন্যায় মানুষেরাও স্ব স্ব বর্ণে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে পারে।" কিন্তু এ সান্ত্বনাবাক্যে শ্বেতকেতু প্রবোধ মানিলেন না। তিনি স্ত্রী-পুরুষের এই ব্যভিচার প্রথার উচ্ছেদসাধনে যত্নবান হইয়া এই নিয়ম স্থাপন করিলেন যে—"অদ্য হইতে যে নারী পতিকে অতিক্রম করিবে, তাহাকে ভ্রূণহত্যাতুল্য ভীষণ অমঙ্গলজনক পাপে পতিত হইতে হইবে এবং যে পুরুষ. বাল্যাবধি সাধুশীলা, পতিব্রতা পত্নীকে অতিক্রম করিবে তিনিও এই পাপে পতিত হইবেন।"

মহাভারতের আদি পর্ব্বের চতুষষ্টিতম অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়—ব্রাহ্মণগণ ঋতুকালে সমাগত ক্ষত্রিয় কুলকামিনীদিগের অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। কিন্তু কামতঃ বা ঋতুকালাতিক্রমে তাহাদিগের সহিত সহবাস করিতেন না। ক্ষত্রিয় রমণীগণ এইরূপে ব্রাহ্মণ সংযোগে গর্ভবতী হইয়া যথাকালে সাতিশয় বীর্য্যবান পুত্র ও কন্যা প্রসব করিতে লাগিলেন। সেই সময় এইরূপ আচরণ রমণীগণ বাধ্য হইয়াই অবলম্বন করিয়াছিলেন, কারণ পরশুরাম কর্ত্তৃক বহু ক্ষত্রিয় 'পুরুষ নিধন হওয়ায় ক্ষত্রিয় রমণীগণ এইভাবে ব্রাহ্মণ সংযোগে গর্ভবতী হইতেন।

মহাভারতের পাঠকগণ অবগত আছেন যে, কুন্তীদেবী ও তাঁহার স্বপত্নী মাদ্রীদেবী তাঁহাদের স্বামী মহারাজ পাণ্ডু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পরপুরুষ সংযোগে পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং কুন্তীদেবী কুমারী অবস্থায়ও কর্ণকে প্রসব করেন। তবে এই ব্যাপারে দেবতাকে মর্ত্ত্যে টানিয়া আনা হইয়াছে ও ইহার ধর্ম্ম-ব্যাখ্যাও আছে। মোটামুটিভাবে ব্যাপারটা এইরূপ:

একদা মহারাজ পাণ্ডু তাহার দুই পত্নী সমভিব্যবহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন এবং বনে এক মৃগ মৃগীর সহিত ক্রীড়ারসে ব্যাপৃত ছিল দেখিলেন। এমন সময় পাণ্ডু মৃগ ও মৃগীকে একেবারে প্রমত্ত দেখিয়া উপর্য্যুপরি পাঁচবার শর নিক্ষেপ করেন; ফলে মৃগ ও মৃগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু ঐ মৃগ ও মৃগী প্রকৃতপক্ষে উহাই ছিল না—মৃগ ছিল এক মহাতেজাঃ ঋষিপুত্র; ঋষিতনয় আপন ভার্য্যার সহিত মৃগরূপ পরিগ্রহ করিয়া * পরম সুখে ক্রীড়া করিতেছিলেন; এমনি সময় পাণ্ডুর বজ্রসম শরাঘাতে ব্যাকুলেন্দ্রিয় হইয়া তৎক্ষণাৎ ধরাতলে পতিত হন এবং বিলাপ সহকারে মহারাজ পাণ্ডুকে যথেষ্ট ভৎ‍র্সনা করিয়া অবশেষে এই বলিয়া শাপ দেন: "তুমি যেমন আমাকে ভার্য্যার সহিত অপবিত্র সময়ে বধ করিলে, আমিও শাপ দিতেছি, তোমারও এইরূপ অপবিত্র সময়ে মৃত্যু হইবে। আমি তপঃনিরত মুনি; আমার নাম কিন্দম, আমি লোক-লজ্জাভয়ে মৃগরূপ ধারণপূর্ব্বক গহন বনে আসিয়া মৃগরূপী ভার্য্যায় আসক্ত হইয়াছিলাম। যদিও ব্রহ্মহত্যার পাপ তোমার উপর দর্শিবে না, কারণ তুমি মৃগভ্রমেই শর নিক্ষেপ করিয়াছ; কিন্তু সঙ্গমকালে আমাকে বধ করায় তোমার যে পাপ হইয়াছে তাহা তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে। তুমি যে সময় স্ত্রী-সংসর্গ করিবে সেই সময় তোমার মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হন।

তদবধি পাণ্ডু ভয়ে আর স্ত্রীগণের সহিত সহবাস করিতেন না। অতঃপর পাণ্ডু একদিন নির্জ্জনে কুন্তীকে ডাকিয়া বলেন, "তুমি এই আপৎকালে অপত্যোৎপাদনে যত্নবতী হও। তুমি জ্ঞাত আছ যে মৃগশাপে আমার পুত্রোৎপাদন শক্তি প্রনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং অন্য উপায় দ্বারা অপত্যোৎপাদনে যত্নবান হইতে হইবে। আমি স্বয়ং পুত্রোৎপাদনে

* পূর্ব্বকালে ঋষিগণ তপঃ বলে যে কোনও রূপ পরিগ্রহ করিতে পারিতেন।

অসমর্থ; অতএব তোমাকে তুল্যজাতি বা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠজাতি দ্বারা পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা করিতেছি।" দৃষ্টান্ত স্বরূপ পাণ্ডু উল্লেখ করেন: "আপৎকাল উপস্থিত হইলে দেবর দ্বারাও পুত্রোৎপাদন করিয়া লওয়া যায়। পূর্ব্বে শরদণ্ডায়ন স্বীয় পত্নীকে পুত্র উৎপাদনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শরদণ্ডায়নের পত্নী স্নান সমাপনান্তর বিচিত্র পুষ্পমাল্যে ভূষিতা হইয়া চতুষ্পথে উপস্থিত হয় এবং তথায় এক সিদ্ধ দ্বিজবরের সহবাসে তিনটী মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র উৎপাদন করিয়া লইয়াছিলেন।"

মহারাজ পাণ্ডুর উপরোক্ত ও পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্ত সমূহ হইতে সমাজ অনুমোদিত ভাবে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া যায়। তবে সকল ক্ষেত্রেই এরূপ ব্যাপার প্রচলিত ছিলনা, কারণ কুন্তীদেবী এই সকলের বিরোধিতা করিয়া স্ত্রীগণের সতীত্ব আদর্শের প্রতি পাণ্ডুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইহাতে পাণ্ডু দৃষ্টান্ত স্বরূপ কুন্তীকে আরও বলেন, "কল্মষপাদ রাজার পত্নী মদয়ন্তী স্বামীর নির্দ্দেশানুসারে মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের ঔরসে অশ্মকনামা পুত্রোৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া পাণ্ডু নিজেদের জন্মবৃত্তান্ত কথাও উল্লেখ করেন। পাণ্ডুদের জন্মবৃত্তান্ত এইরূপ: ভীষ্মদেব স্বকীয় বলবিক্রমে কাশীশ্বররাজের তিনটী কন্যাকে তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের জন্য আহৃত করিয়া আনেন।* কন্যা তিনটীর নাম—অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকা। অম্বা শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিতে চাহিলে সেইমত ব্যবস্থা করা হয়। অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত ভীষ্মদেব আপন ভ্রাতার বিবাহ দেন। তরুণ-বয়স্ক বিচিত্রবীর্য্য সেই কামিনীযুগলের পানিগ্রহণ করিয়া এককালে কুসুমায়ুধের অধীন হইলেন। সেই নিবিড় নিতম্বিনীদ্বয়ের পীন পয়োধরযুগল

* বলবিক্রমে কন্যা হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করাটা তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল।

ক্ষীণ কটিদেশ ও নখসকল রক্তবর্ণ ছিল। তাহাদিগের ঘন কেশ-পাশের অনির্ব্বচনীয় শোভা বর্ণনাতীত। তাঁহারা আপনাদিগকে অনুরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী জানিয়া ক্রীত প্রফুল্লচিত্তে পতিসেবা করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য্য মহিষীদিগের সহিত ক্রমাগত সাতবৎসর নিরন্তর বিহার করিয়া যৌবনকালেই যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হন। বহু চিকিৎসকদ্বারা তাঁহার চিকিৎসা করা হয় কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হয়। বিচিত্রবীর্য্যের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে ভীষ্ম ভ্রাতৃশোকে নিতান্ত কাতর ও বিষণ্ন হন।

অতঃপর পুত্রশোকাতুরা জননী সত্যবতী ভীষ্মকে সান্ত্বনা দানান্তর বলেন, "তোমার প্রিয়তম ভ্রাতা পুত্রবিহীন হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরম রূপবতী ও সম্পূর্ণ যৌবনবতী মহিষীদ্বয় পুত্রার্থিণী হইয়াছেন, অতএব আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি বংশরক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগের গর্ভে সন্তান উৎপাদন কর।" কিন্তু ভীষ্মদেব তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিয়া মাতাকে এ বিষয়ে বিরত হইতে বলেন ও অপর কোন ব্রাহ্মণ দ্বারা ভ্রাতৃজায়াদের গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিবার কথা বলেন। এ সম্বন্ধে ভীষ্মদেব কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখান। প্রসঙ্গক্রমে ভীষ্ম বলেন, "পূর্ব্বে উতথ্য নামে এক মহর্ষি ছিলেন এবং তাঁহার এক সহধর্ম্মিণী ছিলেন। একদা মহর্ষি উতথ্যের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা দেব পুরোহিত বৃহস্পতি মদনাতুর হইয়া মমতার নিকট উপস্থিত হন। মমতা দেবরকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "তোমার জ্যেষ্ঠের সহযোগে আমি গর্ভবতী হইয়াছি, অতএব রমণেচ্ছা সংবরণ কর। আমার গর্ভস্থ উতথ্যকুমার কুক্ষিমধ্যেই ষড়ঙ্গবেদ অধ্যয়ন করিয়াছে—তুমিও অমোঘরেতাঃ; কাজেই একই গর্ভে দুইজনের সন্তান নিতান্ত অসম্ভব। অতএব তুমি এই দুর্ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত হও।" কিন্তু বৃহস্পতি চঞ্চলচিত্তকে দমন করিতে না পারিয়া মমতার অসম্মতি থাকিলেও বলপূর্ব্বক তাহাতে আসক্ত হইলেন। গর্ভস্থ ঋষিকুমার বৃহস্পতিকে কামক্রীড়ায় রত

দেখিয়া মদনবেগ সংবরণ করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই এই গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, অতএব আমাকে পীড়িত করা আপনার অযোগ্য কর্ম্ম হইতেছে।" বৃহস্পতি ইহাতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন! গর্ভস্থ মুনিকুমার অসহিষ্ণু হইয়া পাদদ্বারা তদীয় শুক্রের পথরোধ করিলেন। রেতঃ প্রবেশমার্গ না পাইয়া প্রতিহত হইয়া সহসা ভূতলে পতিত হইল। ইহা দেখিয়া বৃহস্পতি উতথ্যনন্দকে অভিশাপ করিলেন, "তুমি যাবজ্জীবন অন্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে।" ;

ইহার পর বৃহস্পতির শাপ প্রভাবে সেই পুত্র অন্ধ হইয়াই জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল দীর্ঘতমাঃ। এই দীর্ঘতমাঃই নারীগণের এক পতিত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম ঋষি। বেদবিৎ প্রজ্ঞা ঋষি দীর্ঘতমাঃ স্বীয় বিদ্যাবলে প্রদ্বেষী নাম্নী এক পরম রূপলাবণ্যবতী যুবতীর পানিগ্রহণ করেন। দীর্ঘতমাঃর পত্নী প্রদ্বেষী, গৌতম প্রভৃতি কয়েকজন পুত্রলাভের পর আর পতির সন্তোষ জন্মাইতেন না। দীর্ঘতমাঃ পত্নীর এরূপ আচরণ ও অভক্তি লাভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছ কেন?" উত্তরে প্রদ্বেষী বলেন, "স্বামী স্ত্রীর ভরণ পোষণ করেন তাই তিনি উক্ত নামে অভিহিত। কিন্তু তুমি জন্মান্ধ, তাহার কিছুই করিতে পারনা। বরং আমিই তোমার ও পুত্রগণের ভরণ পোষণ করিয়া নিতান্ত শ্রান্ত ও পীড়িত হইয়াছি, অতএব আমি আর ইহা পারিব না।" মহর্ষি দীর্ঘতমাঃ পত্নীবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধান্বিত হন ও বলেন, "তুমি আমাকে রাজদ্বারে লইয়া চল—অর্থলাভ হইবে।" প্রত্যুত্তরে প্রদ্বেষী বলেন, "ধনে আমার অভিলাষ নাই—তোমার যেমন খুসী করিতে পার। আমি আর তোমার ও তোমার সন্তানগণের ভরণ-পোষণ করিব না।" দীর্ঘতমাঃ পত্নীর সগর্ব্ববচন শ্রবণান্তর কহিলেন, "আমি অদ্যাবধি পৃথিবীতে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিলাম, পতিই একমাত্র

স্ত্রীলোকগণের চিরজীবনের আশ্রয় হইবে। স্বামী মরিলে বা স্বামী জীবিত থাকিলে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগতা হইতে পারিবে না, ইচ্ছানুরূপ পুরুষান্তর গমন ও বিহার করিতে পারিবে না। অন্য পুরুষে উপগত হইলে তাহাকে পতিতা হইতে হইবে। আজ অবাধি যে সকল স্ত্রী পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের সহিত সহবাস করিবে তাহার পাতক হইবে। আর পতিবিহীনা নারীগণের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি ও ধন থাকিলেও এ সকল ভোগ করিতে পারিবে না—নিয়ত তাহাদের অপযশ ও অপবাদ হইবে।" প্রদ্বেষী স্বামীর এইসকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কুপিতা হন এবং গোতম প্রভৃতি পুত্রগণকে আদেশ করিয়া দীর্ঘতমাঃকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। অন্ধ দীর্ঘতমাঃ উরুপ মাত্র অবলম্বন করিয়া স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে নানাদেশ অতিক্রম করিতে লাগিলেন।

বলিরাজ গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া দীর্ঘতমাঃকে জল হইতে তুলিয়া সকল বিবরণ শোনেন ও বাড়ী আনিয়া তাঁহাকে স্বীয় মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে পুত্রোৎপাদন করিতে বলেন। দীর্ঘতমাঃ সম্মত হন। কিন্তু সুদেষ্ণা তাঁহাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া নিজ ধাত্রেয়িকাকে তাহার নিকট প্রেরণ করেন। দীর্ঘতমাঃ সেই ধাত্রেয়িকার সহিত যৌনসঙ্গম করিয়া এগারোটী সন্তাম উৎপাদন করেন। মহারাজ বলি যখন দীর্ঘতমাঃকে জিজ্ঞাসা করেন, ইহারা তাহার পুত্র কিনা, তখন দীর্ঘতমাঃ তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন, "আপনার মহিষী আমাকে অন্ধ ও বৃদ্ধতম দেখিয়া অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার ধাত্রেয়িকাকে আমার নিকট প্রেরণ করেন এবং আমি এই শূদ্রযোনিতে একাদশ সন্তান উৎপন্ন করিয়াছি; অতএব ইহারা আমার সন্তান।" তখন রাজা মুনিকে প্রসন্ন করিয়া পুনর্ব্বার মহিষী সুদেষ্ণাকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন ও ঋষি দীর্ঘতমাঃ তাঁহার গর্ভে অঙ্গ, বঙ্গ,

কলিঙ্গ, পণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচ পুত্র উৎপাদন করেন। উক্ত পাঁচ সন্তানের নামানুসারে তাহাদের অধিকৃত দেশের ঐরূপ নাম হয়।

মহাভারতের উপরোক্ত প্রমাণানুসারে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীনকালে হিন্দুসমাজে বিবাহ বন্ধন বর্ত্তমানের ন্যায় সুদৃঢ় ছিলনা। স্ত্রীলোকগণ কৌমার কাল হইতেই কিংবা বিবাহের পরও যথেচ্ছাভাবে পরপুরুষ সহবাস করিতে পারিত। ইহাতে তাহাদের কোন বাধা ঘটিত না। সাধু সমাজেও উহা ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত।

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অতঃপর ভীষ্ম বলেন, "কোন গুণবান ব্রাহ্মণকে ধনদানদ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া গৃহে আহ্বান করতঃ তাহার দ্বারা বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ে সন্তান উৎপত্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে।" কিন্তু সত্যবতী তাহা চাহিলেন না। তিনি তাঁহার বংশজ কাহারো দ্বারাই বিধবা পুত্রবধূদের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপন্ন করিতে চাহিয়া নিজের কুমারী-জীবনের কথা উত্থাপন করেন। একদিন পিতার আদেশক্রমে সত্যবতী লোকজনদিগকে নদী পার করিতে গিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার যৌবনোদ্ভেদ হইয়াছিল। মহর্ষি পরাশর তাঁহাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হন ও তাঁহার সহিত বিহার করেন। ফলে সত্যবতী গর্ভবতী হন। সেই গর্ভ যমুনাদ্বীপে মোচন করিয়া পরাশরের কৃপায় পুনরায় কুমারীত্ব প্রাপ্ত হন। সেই গর্ভজাত পুত্রের নাম হইয়াছিল দ্বৈপায়ন ; কিন্তু পরে চতুর্ব্বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম বেদব্যাস হয়। সত্যবতীর সঙ্গে বিহারের পূর্ব্বে মহামুনি পরাশর তিনটী অলৌকিক বিদ্যা প্রদর্শন করেন—(১) তিনি সত্যবতীর গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূর করিয়া পদ্মগন্ধ উৎপন্ন করেন, (২) এক কুজ্ঝটিকার সৃষ্টি করিয়া সত্যবতীর সহিত বিহার করেন—যাহাতে সঙ্গমদৃশ্য কাহারো চক্ষে না পড়ে, (৩) সত্যবতীকে অক্ষতা কুমারীত্ব প্রদান করিয়া যান।

সত্যবতীর কুমারী কালীন প্রসূত পুত্র বেদব্যাস মাতাকে এই বলিয়া যান যে, যখন তাহার প্রয়োজন হয় স্মরণমাত্রেই সে মাতৃসমীপে উপস্থিত হইবে। এ কাহিনী বলিয়া সত্যবতী ব্যাসকে আহ্বান করিয়া মৃতপুত্র-বধূদের ক্ষেত্রে সন্তান উৎপাদন করিতে আহ্বান করিতে চান। ভীষ্মও তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন।

সত্যবতীর আহ্বানে বেদব্যাস মাতৃসমীপে উপস্থিত হইলে সত্যবতী বলেন, "ভীষ্ম যেমন পিতৃসম্বন্ধে তোমার ভ্রাতা, তুমিও তদ্রূপ মাতৃসম্বন্ধে তাহার ভ্রাতা। কিন্তু ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছে দ্বার পরিগ্রহ করিবে না, অতএব আমি তোমাকে বংশরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাই। রূপযৌবনসম্পন্না তোমার ভ্রাতৃজায়ারা সাতিশয় পুত্রার্থিনী হইয়াছেন, তুমি তাহাদের গর্ভে পুত্রোৎপাদন কর।"

বেদব্যাস সম্মত হইয়া বধূদের ব্রতোপাসনার দ্বারা পবিত্র হইতে বলিয়া সংবৎসরকাল অপেক্ষা করিতে বলেন; কিন্তু সত্যবতী অপেক্ষা করিতে না চাহিয়া অচিরকাল মধ্যেই যাহাতে পুত্রবধূগণ গর্ভবতী হয় বেদব্যাসকে সেই ব্যবস্থা করিতে বলেন। তখন বেদব্যাস বলেন, "যদি আপনার পুত্রবধূ পরমব্রত স্বরূপ আমার বিরূপতা সহ্য করিতে পারেন, তবে আমি অকালিক পুত্র উৎপাদন করিব।"

ইহার পর সত্যবতী ঋতুস্নাতা পুত্রবধূ অম্বিকাকে যথাকালে শয্যায় শয়ন করাইয়া মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, "বৎসে! তোমার এক দেবর আছেন, অদ্য নিশিথে তিনি তোমার নিকট আগমন করিবেন; অতএব তুমি অপ্রমত্তা হইয়া দেবরের আগমন কাল প্রতীক্ষা কর।"

বেদব্যাস পূর্ব্বকৃত সত্য পালন করিবার উদ্দেশ্য ভ্রাতৃবধূ অম্বিকার শয্যাগারে প্রবেশ করিলেন। অম্বিকা শ্বশ্রূর নির্দ্দেশে পরম রমণীয় শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। তদীয় বাসরকক্ষ প্রদীপ্ত দীপশিখায়

আলোকময় ছিল। অম্বিকা সেই কৃষ্ণবর্ণ মহর্ষির উজ্জ্বল নয়ন যুগল, পিঙ্গলবর্ণ জটাভার, বিশাল শ্মশ্রু প্রভৃতি ভয়ঙ্কররূপ দেখিয়া ভীত ও বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুঁজিলেন। বেদব্যাস মাতার সন্তোষার্থে তাহার সহিত সহবাস করিলেন; কিন্তু অম্বিকা ভয়ে দেবরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে পারিলেন না। বেদব্যাস বাহির হইবার সময় সত্যবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, বধূ গুণবান সন্তান প্রসব করিবে কিনা? প্রত্যুত্তরে ব্যাস বলেন, "আলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন বলবান, বীর্য্যবান, সুবিদ্বান পুত্র অবশ্যই প্রসব করিবেন এবং ইহার ঔরসে শতপুত্রও জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু মাতৃদোষে এই পুত্র জন্মান্ধ হইবে।" যথাকালে বড়বধূর ধৃতরাষ্ট্র নামে অন্ধ পুত্রের জন্ম হইল।

পুনরায় ব্যাস মাতা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া দ্বিতীয় বধূ অম্বালিকার গৃহে সেই মূর্ত্তিতে প্রবেশ করেন। অম্বালিকা সেই ভীষণমূর্ত্তি দর্শনে ভীতা ও পাণ্ডুবর্ণা হন। ব্যাসদেব অম্বালিকার সহিত বিহারান্তর বলেন, "তুমি আমার বিরূপত্ব সন্দর্শনে পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছ, অতএব তোমার পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হইবে এবং তাহার নাম হইবে পাণ্ডু।" ব্যাস বাহিরে আসিলে সত্যবতী পুত্র বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাস উপরোক্ত বিবরণ মাতাকে নিবেদন করেন। সত্যবতী ব্যাসকে আর একবার বড়বধূ অম্বিকার ক্ষেত্রে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র উৎপাদন করার কথা বলেন। ইতিমধ্যে ছোটবধূ অম্বালিকা পাণ্ডুকে প্রসব করার পর জ্যেষ্ঠবধূ অম্বিকার পুনরায় ঋতুকাল উপস্থিত হইল। দ্বৈপায়ন ব্যাসের সহিত সহযোগ করিবার জন্য সত্যবতী পুনরায় তাহাকে নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু অম্বিকা ব্যাসের সেই উগ্রমূর্ত্তি ও গন্ধের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হন এবং আপনার এক সুন্দরী দাসীকে নিজ অলঙ্কারে ভূষিতা করিয়া ঋষির নিকট প্রেরণ করেন। ব্যাস পরম পরিতোষপূর্ব্বক সেই রমণীতে বিহারান্তর বলেন,

"তুমি দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবে এবং তোমার গর্ভজাত পুত্র অসাধারণ বুদ্ধিমান ও পরম ধার্ম্মিক হইবে।" সেই দাসীগর্ভসম্ভূত পুত্র বিদুর নামে মহাভারতে বিখ্যাত।

পাণ্ডুমহিষী কুন্তী স্বামীর আজ্ঞা পাইয়া ধর্ম্ম, মারুত ও ইন্দ্র এই তিনজনের দ্বারা যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন নামক তিন পুত্র উৎপাদন করেন ও তদ্বীয় স্বপত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সংযোগে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়।

এতদ্ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রের অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণে ঈশ্বর, ঋষি, মুনি ও দেবতা আদি শ্রেষ্ঠ জীবমাত্রেরই চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া আমরা এই সত্যে উপনীত হইতে পারি যে, ইহারা সকলেই অল্লাধিক ইন্দ্রিয় ব্যভিচার দোষদুষ্ট ছিলেন। পুরাণে ব্রহ্মাকেও আপন কন্যার সহিত এবং শ্রীকৃষ্ণকেও কুব্জা, শ্রীরাধিকা ও অন্যান্য গোপাঙ্গনাদিগের সহিত ব্যভিচার দোষদুষ্ট করিয়াছে। যোগেশ্বর মহাদেব যিনি মদনকে ভস্মীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও ঋষিপত্নীগণের সহিত ব্যভিচার দোষদুষ্ট করা হইয়াছে। সেইরূপে ইন্দ্রকে মাতাপেক্ষাও গুর্ব্বিনী গুরুপত্নীর সহিত, বিষ্ণুকে জালন্ধর পত্নী ও বৃন্দার সহিত, পবনকে অঞ্জনার সহিত, বরুণকে উর্ব্বশীর সহিত, চন্দ্রকে তাহার গুরুপত্নী তারার সহিত, বিশ্বামিত্রকে উর্ব্বশীর সহিত ব্যভিচার দোষে লিপ্ত দেখা যায়।

অধিক দূরে যাইবারও প্রয়োজন নাই। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেই আমরা দেখিতে পাই, যে অহিংসা মন্ত্রের ঋষি অমিয় প্রেমের বাণী ঘোষণা করিয়া জগতের সকলকে আহ্বান করিলেন, বলিলেন, 'পঞ্চভূতে বিলীন হইবে যে দেহ, সেই দেহকে অস্বীকার করিয়া তবেই আমাদের মুক্তি' বুদ্ধদেবের এ বাণীতে সেদিন ঘরে ঘরে

মা, বোন, প্রেয়সীর বুক অজানা আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল ; ঘরে ঘরে নিশীথ রাত্রির অন্ধকার মহানির্ব্বাণের ভেরীনিনাদে রিক্তা হইয়া গেল। কিন্তু শতাব্দীও অতিবাহিত হইল না, সর্ব্বত্যাগী ভোগ বিমুখতার দৃঢ় সঙ্কল্প একদা নারীর কেশের গন্ধে হইল পরাভূত। ফলে বৌদ্ধশ্রমণ মহামণ্ডলগুলিতে যে ব্যভিচারের প্রাচুর্য্য উৎকট হইয়া উঠিয়াছিল তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন।

প্রথমতঃ সমস্ত মহাযান বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞাননিষ্ঠা, ইন্দ্রিয় সংযম ও সন্ন্যাস বৈরাগ্য দ্বারাই নির্ব্বাণপদ লাভের দিকে একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কিন্তু বুদ্ধের প্রধান শিষ্য আনন্দ নারীজাতিকেও সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়া যান। ইহার পর বহু বহু বৌদ্ধবিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় বহু বহু শ্রাবিকাও আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন। প্রথমাবস্থায় এই সমস্ত শ্রাবক-শ্রাবিকাগণের উভয়েরই লক্ষ্য ছিল নিবৃত্তি ও নির্ব্বাণমুক্তি লাভের দিকে। কিন্তু মহাপণ্ডিত চাণক্য বলিয়াছিলেন যে, 'ঘৃতকুম্ভসমা নারী ও তপ্ত অঙ্গারবৎপুরুষ' এবং উভয়ের একত্র অবস্থানের যে ফললাভ অবশ্যম্ভাবী—এই ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায় নাই। কাজেই বৌদ্ধবিহারগুলিতে যদিও জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনীকাঞ্চন ও প্রবৃত্তিমার্গ হইতে দূরে সরিয়াই রহিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট শ্রাবকগণ স্ত্রীসংসর্গের ফলে প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা নিবৃত্তি বা মোক্ষপথ লাভ করিবার উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হন। ফলে এই নব-সম্প্রদায় অতি গোপনে প্রচার করিতে লাগিলেন—'নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সাধনার দ্বারা যে সহজানন্দ লাভ হয়, তাহার দ্বারাই নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করা যাইতে পারে।' এই মত যখন প্রচারিত হয় তখন বৌদ্ধবিহারগুলিতে প্রবল ব্যভিচারের বন্যা প্রবাহিত হইতেছিল।

এই নব সম্প্রদায়ের বৌদ্ধগণ 'বজ্রযান' নামে পরিচিত হন। প্রবৃত্তি-মার্গী এই সম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানীবুদ্ধ ও বজ্রধাতেশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাহার শক্তি, ঘণ্টাপাণি নামে একটী বোধিসত্ত্ব কল্পনা করিয়া যে নূতন সাধনমার্গ প্রচার করিলেন, তাহাই 'বজ্রসত্ত্ব-যান' বা 'বজ্রযান' নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই আচার পদ্ধতির রীতি-নীতিসকল অতি গুহ্য তান্ত্রিকমত সমাচ্ছন্ন। যে সকল সম্ভোগলালসাকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মপন্থিগণ অতি হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বজ্রযান শ্রাবকেরা তাহাকেই নির্ব্বাণলাভের উপায় বলিয়া প্রচার করিলেন। তাঁহাদের এই মত সমর্থনের জন্য বহুতর তন্ত্রাদিও প্রচারিত হইয়াছিল। ফলে এইপ্রকার ধর্ম্মাচরণ সমাজের সকলের পক্ষেই আপাতমধুর মনে হওয়ায় সকলেই এই মত আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন। এইখানেই সহজিয়া তত্ত্ব বা সহজ ধর্ম্মসাধন পদ্ধতির গোড়া পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজদেহে ব্যভিচারের বীজ বপন হয়।

উক্ত সম্প্রদায়ের একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত তন্ত্রগ্রন্থ 'চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র' হইতে এই সহজতত্ত্ব সম্পর্কে যেরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, উহার 'শ্লীলতাসম্পন্ন' অংশের একটু সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতে পারে: আনন্দ চারিপ্রকার—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরামানন্দ। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায়, পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, তাদৃশ লক্ষণাবিশিষ্ট আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন, নখদংশন দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্মসংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। তারপর পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমানন্দ কহে। এই পরমানন্দে আনন্দ অপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। তাহার পর আবার যখন এই মণিমূল হইতে পদ্মদ্বয়ের অন্তর্গত বজ্রচালন কার্য্যকরী না হয়, তখন তাহাকে সহজানন্দ কহে। ইহাতে

গ্রাহ্যগ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরামানন্দ কহে। এই সম্প্রদায়ের দীপঙ্কর ও অন্যান্য শ্রাবকগণই এই গুপ্ত আনন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইয়াছিলেন, স্বয়ং ভগবান বজ্রসত্ত্ব তাঁহার শক্তির সহিত একত্রীভূত হইয়া সহজানন্দ ও সহজৈকস্বভাব তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে গৌড়বঙ্গেও এই বজ্রযান সম্প্রদায় বিশেষ প্রবল ছিল। কারণ ইন্দ্রিয় চরিতার্থতারূপ সহজসাধন যখন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন আপাতসুখপিপাসী জনসাধারণ যে অতি সহজেই এই সহজধর্ম্ম গ্রহণ করিবে তাহা বলাই বাহুল্য।

তাহার পর এক সময়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধকগণ এতদূর অধঃপাতে পৌঁছিলেন যাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়। এই তান্ত্রিকগণ এমন সব ভয়ানক কথা প্রচার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না, 'মাতৃযোনিং পরিত্যজ্য বিহরেৎ সর্ব্বযোনিষু' তাহা ছাড়া নানারূপ বেদ বহির্ভূত বাহ্য ধর্ম্ম ও সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া আপনাদিগকে বীর বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 'যাহারা ত্রিসন্ধ্যা বন্দনাদি করেন, যিনি প্রতিদিন স্নানাদি সমাপনান্তর মৌনভাব অবলম্বন করিয়া ধ্যান ধারণায় মগ্ন থাকেন, যিনি ঘৃতান্ন নিরামিষভোজী, পশু প্রভৃতির প্রতি হিংসা করেন না ও মদ্য মাংসাদি স্পর্শ করেন না, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, যিনি গৃহস্থ হইয়াও কেবল পুত্রোৎপাদন জন্য ঋতুকালে ধর্ম্মপত্নীতে উপগত হন ও অপর স্ত্রীলোকমাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করেন, তিনিই পশু! ইহাদিগের মধ্যে আবার মাতঙ্গী বিদ্যাবলম্বী তান্ত্রিকগণ পাপের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 'মাতারপি নত্যজেৎ' ইত্যাদি যতদূর নীচ ও নীতিবিরুদ্ধ মত প্রচার করেন।

এই বীরাচারী তান্ত্রিকগণ তাহাদের সাধন ও ধর্ম্মপ্রণালীকে কতদূর বেদ, নীতি ও সমাজবিরুদ্ধ রূপে জাহির করিয়াছেন, সামান্যমাত্র উদাহরণ হইতে তাহা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। ইহাদের রচিত তন্ত্র মতে :

"পাশ বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ পাশ মুক্তঃ সদা শিব।"
হলাং পিবতি দীক্ষিতস্য মন্দিরে, সুপ্তো নিশায়ং
গণিকা গৃহেষু, বিরাজতে কৌলব চক্রবর্ত্তী।
"পীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা যাবৎ পততি ভূতলে।"
"পুনরুত্থায় বৈ পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥"
"অহং ভৈরবস্ত্বং ভৈরবী হ্যাবয়োরস্তু সঙ্গম॥"
রজঃস্বলা পুষ্করং তীর্থং, চাণ্ডালিতু স্বয়ং কাশী,
চর্ম্মকারী প্রয়াগঃ স্যাদ্রজকী মথুরা মতা।
অযোধ্যা পুক্কসী প্রোক্তা।……ইত্যাদি।
মদ্যং মাংসচ মীনঞ্চ মুদ্রা মৈথুন মেবচ
এতে পঞ্চমকারাস্যুর্মোক্ষদা হি যুগে যুগে॥……ইত্যাদি

উপরোক্ত শ্লোক সমূহের সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে : লোকে যাবৎ লোকলজ্জা, কুললজ্জা ও দেশলজ্জাদি পাশরূপে বদ্ধ থাকিবে অর্থাৎ সে একেবারে বেহদ্দ বেহায়া না হইবে, তাবৎ সে পাশবদ্ধ জীব; এবং যখন সে লাজ-লজ্জার মাথা খাইয়া নির্লজ্জ বেহায়া হইয়া সকলের সমক্ষে যদিচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইবে, তখনই সে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে; অর্থাৎ যতক্ষণ তাহার অন্তরাত্মায় প্রেরণা থাকিবে যে, এ কর্ম্ম করা ভাল অথবা এরূপ অধর্ম্মাচরণ করা অকর্ত্তব্য, তাবৎ সে পশুরূপে গণ্য হইবে এবং যখন তাহার হিতাহিত বিবেচনা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে এবং কোনরূপ পাপাচরণ করিতে তাহার মনে এতটুকু কুণ্ঠা উপস্থিত হইবে না, তখনই সে শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে যিনি ক্রমাগত সুরাপান করেন ও

পরে বেশ্যালয়ে গমন করিয়া সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করেন ও অন্যান্য ( পাপাচারে ) প্রবৃত্ত হন, তিনি বীরাচারীদিগের মধ্যে চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। যে বীরাচারী মহাশয় সুরাপান করিতে করিতে নেশায় অভিভূত হইয়া অচৈতন্য অবস্থায় ভূমিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দেন, তৎপর পুনরায় উঠিয়াই আবার সুরাপানে রত হন, তাহার আর জন্ম হয় না।

ভৈরবীচক্রকালে যিনি ভগিনী আদি স্বজনবর্গের সহিতও ব্যভিচারে কুণ্ঠিত না হইয়া, আমি ভৈরব ও তুমি ভৈরবী এই মন্ত্র বলিয়া ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই মহান সাধক। যিনি রজঃস্বলা স্ত্রী গমন ( যাহা সকল শাস্ত্র বিরুদ্ধ ) করেন তিনি পুষ্কর তীর্থ গমনের ফল লাভ করেন। তেমনি যিনি চর্ম্মকারী গমন করেন তিনি প্রয়াগ, যিনি রজকিনী গমন করেন তিনি মথুরা, যিনি পুক্কসী গমন করেন তিনি অযোধ্যা গমনের ফললাভ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি মদ্য, মাংস, মীন, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চমকারে প্রবৃত্ত হন, তিনিই মুক্তির অধিকারী। এইরূপ আচরণই যুগে যুগে লোককে মুক্তি দিবে।

ইহাদের উল্লিখিত ভৈরবীচক্র এতদূর কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল অনুষ্ঠান ছিল, যাহা প্রকাশ করা কঠিন। তথাপি এ বিষয়ে সামান্য একটু ইঙ্গিত করা চলে। এই চক্রের অনুষ্ঠান কালে বিভিন্ন জাতীয় তান্ত্রিক স্ত্রীলোক ও পুরুষেরা চক্রাকারে বসিয়া এবং মধ্যস্থলে কোন একজন কৌল চক্রবর্ত্তী পাশমুক্ত অর্থাৎ বেহদ্দ বেহায়া বীরাচারী মহোদয়কে উলঙ্গ করিয়া বসাইয়া তাহার গুপ্তাঙ্গে কোন একজন সুন্দরী যুবতী নারী সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হইয়া 'পরম নিষ্ঠার সহিত' সিন্দুর, ফুল, ফল ও দুর্ব্বাদির দ্বারা পূজা করিত। এই সচেতন বীরের অঙ্গকে বীরাচারী মহাশয়েরা জীবন্ত শিবলিঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিতেন। তৎপরে চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে সুরা দেওয়া হইত এবং তিনি উহা উচ্ছিষ্ট করিয়া দিলে সেই সুরা সকলে

প্রসাদরূপে পান করিতেন। সুরার পরিমাণ খুব বেশীই থাকিত—কারণ সুরাকে ত তাঁহারা আর সুরাজ্ঞান করিতেন না, তাঁহারা ইহাকে কারণবারি বা আনন্দময় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। যাহা হউক উক্ত স্ত্রীলোকের পূজা সমাপন হইলে চক্রবর্ত্তী মহাশয় উঠিয়া পুনরায় সেই স্ত্রীলোকটীকে বিবস্ত্রা অবস্থায় বসাইয়া তাহার স্ত্রী অঙ্গকে (কারণ তান্ত্রিকগণ ইহাকে জীবন্ত যোনিপিঠ বলিয়া অভিহিত করিতেন) পূজা করিতেন ও সুরাদি প্রদান পূর্ব্বক প্রসাদ লইতেন। যে সকল সুন্দরী যুবতীকে ইহার জন্য নির্ব্বাচিত করা হইত তাহারা অধিকাংশই চণ্ডালী, চর্ম্মকারী, পুক্কসী, রজকিনী প্রভৃতি শ্রেণীভুক্তাই হইত। কারণ উচ্চবংশীয় ভদ্রকন্যারা সহজে ইহাদের ফাঁদে পা দিত না। তারপর সকলের নেশা যখন বেশ জমিয়া আসিত, তখন দীপ নির্ব্বাপিত করা হইত। ইহার পরে বিভিন্ন নারী ও পুরুষ তান্ত্রিকগণের যে বিভৎস রতিমজলিস্ জমিয়া উঠিত তাহা বর্ণনাতীত।

শঙ্করাচার্য্যের জন্মের পরও কিছুকাল এই সকল তান্ত্রিক কাপালিকগণ সমাজের বুকের উপর নারী ধর্ষণের যে তাণ্ডবলীলা চালাইয়া আসিতেছিল ও ধর্ম্মের নামে যে সমস্ত পাপাচরণ ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত, তাহা ঐতিহাসিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত 'সহজিয়া' ধর্ম্মসাধন পদ্ধতিতে জনসাধারণ এতটা পরিপক্ক হইয়া উঠিয়াছিল যে, অত সহজে উহা উৎপাটিত করার সাধ্য কাহারও ছিল না। ফলে জনসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য শৈব ও, শাক্তগণ যেমন শক্তিসাধন মত প্রচার করিলেন, তেমনি বৈষ্ণবগণ 'সহজভজন' প্রচার করিলেন। বৈষ্ণবগণের প্রচারিত সহজভজন পদ্ধতিকে পূর্ব্বোক্ত বজ্রযানের কেবল নুতন সংস্করণ ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইত না। গৌড়বঙ্গে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতন ঘটিল, তখনও সাধারণ

লোকের মন হইতে এই 'সহজ ধর্ম্মসাধন' প্রবৃত্তিকে দূর করা যায় নাই। কারণ যে বজ্রসাধন গৌড়বঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে নিত্যানুষ্ঠান বলিয়া বহুদিন গণ্য ছিল, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে তাহা যে এত সহজে উড়িয়া যাইবে, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।

চৈতন্যদেবের জন্মের অনেক পূর্ব্ব হইতেই বৈষ্ণব তান্ত্রিকেরা সহজ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের পদাবলীতেও তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। চণ্ডীদাসের উপাস্য দেবী বাশুলীর প্রত্যাদেশেই চণ্ডীদাসও সহজতত্ত্ব প্রকাশ করেন। চণ্ডীদাসও একজন সহজিয়া সাধক ছিলেন।

এইসকল বৈষ্ণব সহজপন্থিগণ জ্ঞানমার্গ চাহিতেন না, ইঁহারাও প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীনে ভেদ ছিলনা, সকলেই এই সাধনার অধিকারী ছিলেন।

সহজিয়াগণের রচিত গ্রন্থ সমূহ হইতে জানা যায় যে, পরকীয়া-সাধনই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য ছিল। গৌরীদাসের 'নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী' (সহজিয়া ধর্ম্মমতের সার সঙ্কলন—এই গ্রন্থখানি খুবই অশ্লীল, তথাপি ইহাতেই এই ধর্ম্মমতের সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে) গ্রন্থে পরকীয়া-সাধন সম্পর্কে গৌরীদাস লিখিয়াছেন :

স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া ইহা করে কেনে।
শীঘ্র সমরস হয় তরঙ্গের গুণে॥
পরকীয়া সাধন তিন তরঙ্গে হয়।
দুহুঁ ইহা সঙ্গ করে মনে রহে ভয়।
ভয় হেতু সমরস হয় শীঘ্রগতি।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ ইথে জানিবে নিশ্চিতি।

তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিতেন যে, নায়ক-নায়িকার দেহেই বৃন্দাবন ও উক্ত নায়িকাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর অনুষ্ঠান।

তাই তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন :

বৃন্দাবন বলি মাত্র সবে করে ধ্যান।
কোথা আছে বৃন্দাবন কারো নাহি জ্ঞান।।
মানুষের দেহ হয় নিত্য বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিও কারণ।।

ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মিলন ও নারীর দেহের বর্ণনা দিয়া বৃন্দাবন লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

ইহাদের মতে ভজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক। পরে রসিকভক্ত গুরুর নিকট রীতিমত উপদেশ লইয়া সেই নায়িকাতে দেহ-মন আরোপ পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে অর্থাৎ পরকীয়া নারীর সহিত তাহার দেহ-বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া উক্ত বৃন্দাবনে তাহার নিজের জীবন, যৌবন ও দেহ অর্পণ ও তাহার রতিতে নিজ রতি মিশাইয়া ভাবপ্রেম এক করিয়া সেই কামবীজ কাম গায়ত্রীর দ্বারা সেই কামিনীর কামরতি উত্তেজনা পূর্ব্বক তাহার অধরামৃত মন্ত্র লইয়া, তাহার নয়ন রূপ নিধুবনে, বক্ষস্থল রূপ ভাণ্ডারী বনে, কুচস্বরূপ কুমুদবনে…ইত্যাদি রতিলীলার সব কিছু তুলনামূলক বর্ণনা করিয়া—এইরূপ ধর্ম্ম আচরণে শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় বলা হইয়াছে। ধর্ম্মের মধ্যে দিয়াই যে তৎকালীন সমাজে ব্যভিচার প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ উল্লিখিত সাধনপদ্ধতিসমূহ হইতে জানা যায়।

পূর্ব্বোক্ত ভৈরবী-চক্রানুষ্ঠান ও সহজিয়া সাধন পদ্ধতি (কিশোরী ভজন নামে) গোপনে কিছুকাল পূর্ব্বে পর্য্যন্ত নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইত। এতদ্ভিন্ন মুসলমান সম্রাট্‌গণের আমলে বহুরূপ যৌন-ব্যভিচার সমাজের বুকে অনুষ্ঠিত হইত। ঐতিহাসিজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের রচিত গ্রন্থাদিতে সে সকলের অনেক নজির দেখাইয়াছেন।

# তৃতীয় অধ্যায়

## যৌন-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য

আমাদের শাস্ত্র-পুরাণে রেতঃ ধারণ বা ব্রহ্মচর্য্য পালন ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য পালনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে; কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনে ব্রহ্মচর্য্যের প্রকৃত অর্থ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নহে, উহার সু ও সংযত ব্যবহার। কারণ ইন্দ্রিয়শক্তিকে চিরদিন কখনও শাসনে রাখা যায় না। আর জোর করিয়া ইন্দ্রিয়াবেগ দমন করাও ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ হইতে পারে না, বরং তাহা আর এক প্রকারের অসংযম।

আমাদের প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ যেমন প্রচারিত হইয়াছিল, সেইরূপ কামশাস্ত্র সম্পর্কেও যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম কামকলাবিদ্ মহর্ষি বাৎসায়ন কাম সম্পর্কে এতখানি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি প্রবলভাবে প্রচার করিতে দ্বিধান্বিত হন নাই যে, "ধর্ম্মার্থকাম" এই ত্রিবর্গের ফল মানুষ একমাত্র কামচর্চ্চার দ্বারাই লাভ করিতে পারে। তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ 'কামসূত্রম্' গ্রন্থে উহার সুন্দর যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আছে। সেই সঙ্গে আমাদের একথা ভুলিলেও ত চলিবেনা যে, কাম সর্ব্বজয়ী, ভগবদিচ্ছা পূর্ণ করার জন্যই উহা মানুষের শরীরে সঞ্চারিত হইয়াছে। কাম এমন মহাশক্তি ধারণ করে যে, তাহাকে পরিশুদ্ধ করিয়া ঈশ্বরাভিমুখী করিতে পারিলে তখন তাহা আর বিক্ষোভ সৃষ্টি করেনা, সেই পরম পুরুষকেও জানা যাইতে পারে। কিন্তু কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যার দ্বারাও তাহা সিদ্ধ হওয়া সম্ভব নহে, বরং তাহাতে দিব্য-জীবন না হইয়া মানুষ হয় বিরক্ত, একরোখা জন্তুর মত ভীষণ, অথবা অতিমাত্রায় অহঙ্কারী—পরম শান্ত, শীতল ও মধুময় চরিত্র সে লাভ করে না।

ধর্ম্মসাধনার কথাই ধরা যাউক। সাধনার প্রথম যুগে পুরুষ অথবা নারী ইষ্টকে পায় কামক্রীড়ার সঙ্গীরূপে। কারণ সমস্ত বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলকথা এই যে, ভগবান অপ্রাকৃত মন্মথ, সম্ভোগবৃত্তিকে নিরন্তর খেলাইয়া, নাচাইয়া, ছুটাইয়া সাধক-সাধিকাকে আকুল ও নাকাল করিয়া তুলিয়া থাকেন। কামের উচ্ছ্বাসময়ী সম্ভোগপ্রবৃত্তিই ঈশ্বর-প্রাপ্তির অনুরক্তিরূপে তখন প্রকাশ পায়। ইহা নবানুরাগের কাল। কামচাঞ্চল্যই তখন এক অপার্থিব আশা ও আনন্দরূপে ইষ্টকে লইয়া নানারূপ ক্রীড়া করে। সেই কামচাঞ্চল্য বলেই বনে বনে খেলা, নদীতে ঝাঁপ দিয়া পড়া, গাছের ডালে দড়ি বাঁধিয়া দোলা, অমল জ্যোৎস্না রাতে ছুটিয়া ছুটিয়া সে যে কি প্রফুল্ল জীবনের উদ্দামলীলা—তখন মনে হয় এই ত জীবন, এই ত ভগবৎ প্রেম, এই ত আনন্দ !

তারপর সাধকজীবনে আসে কামের রূপান্তর। 'অহং'-এর নবজন্মলাভের ইহাই সন্ধিক্ষণ। এই সঙ্কটকালে যে সাধক-সাধিকার কাম-দাবানল রতিসুখলাভে শীতল না হয়, সেই হয় ব্যর্থ এবং কেহ হয় 'মরিয়া' পাগল, কেহ বিদ্রোহী, ব্যাধি কাহারো হয় জীবনের সঙ্গী, কেহ বা পঙ্গু বৃষলজীবন লইয়া হয় নিরাশ, কেহ ক্রোধী, অভিমানী, তিলে তিলে কাহারো ধমনীর রক্ত যায় শুকাইয়া; কেহ হন যোগভ্রষ্ট কিংবা কেহ আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুর সুশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় নেয়। ইহাই হইল ধর্ম্ম ও কামের এবং সাধনজীবনে তাহার প্রভাবের অতি সংক্ষিপ্ত একটু ইঙ্গিত।

অধুনা বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এ সত্য প্রকটিত হইয়াছে যে, সাধারণ মানুষের জীবনেও জোর করিয়া কামকে দমন করিতে যাইবার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ইহা হইতে নানা কুফল দেখা দেয় অর্থাৎ ব্যাধিপীড়িত হওয়াও বিচিত্র নহে। ডাঃ ফ্রয়েড প্রভৃতি মনোবৈজ্ঞানিকগণ উহার প্রমাণ দেখাইয়াছেন।

এইস্থলে আমার বক্তব্য ইহাই যে, অধুনা ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ যৌন-দমন নহে, যৌন-সংযম এবং তাহা জোর করিয়া নহে, নিতান্ত স্বাভাবিক পথে সহজ অভ্যাসের দ্বারা ইন্দ্রিয়কে বশে রাখা।

বহু প্রাচীনকাল হইতে এদেশে ছাত্র-জীবনে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হইত এবং অতঃপর গার্হস্থ্য-জীবনে ভোগ করা হইত তাহার অমৃতপ্রসূ ফল। সে যুগের এ জীবনাদর্শ বাস্তবিক সুখেরই ছিল। তবে একথাও ঠিক, উহার মধ্যে মহাপুরুষ সাধকেরা ঊর্দ্ধরেতাঃ হইবার জন্য অনেকে আজীবনকাল সংসারবিমুখ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া যাইতে কোনরূপ ত্রুটি করিতেন না। আবার অনেকে হয়ত জীবনের অধিক কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া পরে সংসারব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। যেমন অদ্বৈতাচার্য্য ৫৮ বছর কাল অবিবাহিত ব্রহ্মচারী থাকিয়া পরে বিবাহ করেন এবং ৭৫ বছর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত প্রতি চারি বছর অন্তর একটী করিয়া সন্তানের পিতা হইয়াছিলেন।

সেকালের ব্রহ্মচর্য্য পালন প্রক্রিয়াটা যেরূপ কঠোরতায় আবৃত হইয়া আছে, একালে তাহা সহজসম্ভব নহে অর্থাৎ প্রায় পনেরো আনা লোকের পক্ষে তাহা অসম্ভব। কারণ সেকালের জীবনযাত্রার আদর্শ অধুনা জীবনযাত্রা প্রণালীতে সম্পূর্ণরূপ বিপরীত।

অধুনা সুকুমারমতি বালকেরা কিশোর বয়সে পা দিয়াই উদ্দীপক গ্রন্থ, চিত্র, সিনেমা-টকির সঙ্গে পরিচিত হয়—বিলাসের সহস্র উপকরণ তাহাদিগকে হাতছানি দেয়; সংযম অভ্যাস তাহাদের আর হইয়া উঠে না। কাজেই ঐ কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত তাহারা পালন করিবে কিরূপে? কিশোরী তরুণীদের মধ্যেও তেমন ধর্ম্মশিক্ষা নাই, নাই গৃহের সংযম-ব্রত নিয়মাদির প্রভাব; তদুপরি বিলাসোপকরণগুলি তাহাদের জীবনক্ষেত্রে আনাগোনা সুরু করিয়া দেয়। কাজেই তাহাদেরও ব্রহ্মচর্য্যের সঙ্গে পরিচয়

নাই ; তাহারাও সিনেমা-টকি প্রভৃতির উত্তেজক প্রভাবদ্বারা প্রভাবান্বিতা হইয়া থাকে।

এইভাবে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়া আবার একশ্রেণীর আধুনিক তরুণ-তরুণী নানারূপ অবাঞ্ছিত পাপপথেও প্রবাহিত হইতে বাধ্য না হইয়া পারে না। ফলে অকালে তাহাদের স্বাস্থ্যভঙ্গ ও মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়ে।

অধুনা 'বার্থ-কণ্ট্রোল' নামে যে সকল জন্ম-রাক্ষস যন্ত্রাদির আমদানী হইয়াছে—নবীন যুগের তরুণ-তরুণীরা ইহার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করিয়াছে। ফলে তাহাদের অবাধ গোপন মেলামেশার অর্থাৎ অবাধ যৌনতৃপ্তি লাভের পথকে আরও প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। কাজেই অবৈধ পাপকে গোপন করিবার ক্ষমতাপ্রবণ এই সকল জন্ম-সারস কণ্ট্রেসেপটিভ্ বৈজ্ঞানিক উপাদানগুলিও সংযমের দৃঢ়তাকে প্রবল বন্যার মাঝে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা সমাজের পক্ষে ঘোর অকল্যাণকর। উপরন্তু আমরা পাশ্চাত্যের অতিরিক্ত ভক্ত হইবার দরুণ আমাদের স্বভাবটাও হইয়াছে তাহাদেরই অনুগামী। কিন্তু সেদেশের তরুণ-তরুণীরা যে যৌনমিলনে একেবারে নীতিজ্ঞান হারাইয়া বসিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্যের অন্যতম চিন্তাশীল সাহিত্যিক মিঃ এইচ. জি. ওয়েলস্-এর নিম্ন বক্তব্যেই প্রকাশ পাইয়াছে : The larger part of the younger generation of educated and semi-educated people in Europe and America seems to me to have no sexual morals at all, but only cynical observances, the plain inevitable result of an atmosphere of shame and insincerities.

কাজেই আমাদের আজ এ অকল্যাণকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। সুস্থ দেহে সুখী দাম্পত্য-জীবন লাভ করিতে হইলে আজ যৌন-সংযমের আদর্শকে গ্রহণ না করিয়া উপায় নাই।

এখানে প্রথমেই এ ইঙ্গিতটুকু দেওয়া প্রয়োজন, যৌন-সংযম বা ব্রহ্মচর্য্য পালনের সার্থকতা কি এবং কেন আমাদের প্রাচীন ভারতে ইহার এতটা প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছিল। এ সম্পর্কে আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্র গীতায় শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত বাণী বজ্রনির্ঘোষের মত ঘোষিত হইয়াছে: 'সংসারকে আবার সত্যযুগের স্বর্গ করিতে হইলে দিকে দিকে প্রচার কর 'বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যং'। হে পার্থ, আপামর সাধারণ আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের কাছে পাঞ্চজন্য নিনাদে চীৎকার করিয়া বল:

'ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্ যাস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ'।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনার ফলেও একথা সহজেই বোঝা যায় যে, সে সকল কঠোর সত্যগুলি আমাদের আর্য্য ঋষিগণ বহু বহু পূর্ব্বেই উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের সুপ্রাচীন যোগশাস্ত্রে অতি কঠোরভাবে বীর্য্যধারণের আদর্শ প্রচার করা হইয়াছিল। এই বীর্য্যধারণের ক্ষমতা যখন জন্মে অর্থাৎ—

'সিদ্ধে বিন্দৌ মহারত্নে কিং ন সিদ্ধতে ভূতলে।
বিন্দু করোতি সর্ব্বেষাং সুখদুঃখস্য সংস্থিতিম্'।

তখন পৃথিবীতে কি না সিদ্ধ হয়? জরামরণশীল মানবগণের বিন্দুই সুখ-দুঃখের কারণ।

এ সম্পর্কে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম যৌন-বৈজ্ঞানিক ডাঃ হেবলক এলিস্ বলিয়া গিয়াছেন: All through life the vigour and power of the male are maintained by the presence of the fertilising fluid (the presence of which alone in the body make love possible). It is the greatest dynamic force of all male life and is capable of conversion

into other higher channels. ইহার সারমর্ম্ম এই যে, রেতঃধারণই জীবনের তেজ ও শক্তির উৎস, তথা প্রেমেরও।

ফরাসী বৈজ্ঞানিক Le-Tournean তাঁহার 'এভলিউশন অব ম্যারেজ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন: মেরুদণ্ডহীন জীবদের মধ্যে দেখা যায়, সন্তান জন্মদানের পরই পিতামাতার মৃত্যু হইয়াছে (১)। অর্থাৎ ইহার দ্বারা তিনি বুঝাইতে চান যে, রেতঃধারণেই তাহাদের প্রাণ থাকে এবং রেতঃপাতেই মৃত্যু। তাই আমাদের যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে:

মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।
জায়তে ম্রিয়তে লোকো বিন্দুনা নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ বিন্দুপাতেই মৃত্যু হয়, বিন্দুধারণ করিলেই জীবিত থাকে। বিন্দুতেই জীবের উৎপত্তি ও ইহাতেই তাহার বিনাশ।

এ সম্পর্কে এ্যামেরিকান যৌনবৈজ্ঞানিক, যৌন-বিজ্ঞানের বহু গ্রন্থ প্রণেতা এবং "মেডিকেল ক্রিটিক্ এ্যাণ্ড গাইড্" নামক সুবিখ্যাত মার্কিনী ডাক্তারী-পত্রের সম্পাদক, ডাঃ ডব্লিউ. জে. রবিন্‌সন্ এম. ডি মহোদয় বলিয়াছেন: আমি পরীক্ষার দ্বারা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি যে, মানুষের মধ্যে যাহারা প্রায় অথবা সম্পূর্ণরূপে যৌন-সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, তাঁহারা মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট আদর্শ।......যদি সভ্যতাকে বজায় রাখিতে হয় তবে যৌন-সংযমই একমাত্র মুক্তির উপায়। মানুষের সংযমের ক্ষমতা তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তি। (২)

---

(১) Very frequently among invertebrate animals the death of the parents is a normal result of propagation. In the great class of insects the rule is that the male live only until a new generation is begotten and the female dies as soon as the eggs are deposited.

(২) I was astonished to find in course of my special study of cases, some of the finest specimens of man-hood live apartically or completely continent life......Actual repress in the greatest asset a human individual can have.

তথাপি মানুষের স্বাভাবিক গতি মরণকে স্বীকার করিয়া লইয়াও সেই সম্ভোগবৃত্তির পথেই ধাবিত। কারণ এইপথে যে আনন্দটুকু আছে, সেইটুকু জীবনক্ষেত্রে সফল করিয়া লইতে যদি মৃত্যুই তার শেষ পরিণতি হয়, তাহাতেও সে কিছুমাত্র ভীত নহে—সৃষ্টির প্রেরণাও যে উহার সঙ্গে মিশিয়া আছে! নিজেকে ক্ষয় করিয়াও সে যে আর একটা নূতন জীবন গড়িয়া তুলিতে পারিবে, সেইটা ত তাহার পক্ষে ক্ষতি নহে। প্রদীপ নিজেকে দগ্ধ করিয়াও যে আলোক-বন্যার সৃষ্টি করিতে পারিল, সেইখানেই ত তাহার বড় সার্থকতা! কিন্তু গোল সেইখানে নহে, আসল গোল হইতেছে ইহার অপরিমিত ও অযথা অপব্যয় যেইখানে।

ইয়োরোপের নবযুগের জন্মদাতা বিদ্রোহী দার্শনিক নীট্শে বলিতেছেন: ইন্দ্রিয়াবেগ সব ব্যাধি নহে—তাহারা জীবনাবেগেরই অভিব্যক্তি। খেলা, উৎসব, কুচকাওয়াজ, দৌড়, ও নৃত্যের যেমন নিয়ম আছে অর্থাৎ এই সকল হইতে যতখানি বেশী আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে তাহা যোগাইবার জন্য যেমন একটা সাজানো পদ্ধতি ও যথাযথ মাত্রানির্দ্দেশ আছে, ইন্দ্রিয়াবেগ সম্বন্ধেও সেই রকম নিয়ম আছে এবং থাকা উচিত। এই কথা খুবই ন্যায্য, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধই! তাহা বলিয়া জিনিষটা ব্যাধি নহে—ইন্দ্রিয়াবেগ স্বভাবতঃই স্বাস্থ্যবান পদার্থ। কাজেই ইন্দ্রিয়াবেগ উৎপাটিত করা নহে, এমন কি তাহাদের নির্বীর্য্য করিয়া তোলাও নহে—আদর্শ হইতেছে তাহাদের বশে রাখা।

এই বশে রাখা কার্য্যটাই কি করিয়া অধুনা আমাদের জীবনে সহজভাবে ও স্বাভাবিক পথে সফল করিয়া তোলা যাইতে পারে তাহাই আমাদের জানা প্রয়োজন।

## ব্রহ্মচর্য্য ও পানিমৈথুন ঃ

বর্ত্তমানযুগে অবিবাহিত তরুণ-তরুণীর জীবনে ব্রহ্মচর্য্য বিমুখতার প্রধান অন্তরায় পানিমৈথুন (masturbation). এই কুপ্রথাটি অত্যন্ত সহজসাধ্য বিধায় অধুনা তরুণ-তরুণী অতি অল্প বয়সেই ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতার সেইখানেই হয় সূত্রপাত। এই কুপ্রথায় একবার অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে সহজে তাহা হইতে বিরত হওয়া খুবই কঠিন হইয়া পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা নানামূর্ত্তিতে কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণী জীবনকে আন্দোলিত করিয়া প্রবল বন্যার মাঝে তাহাদের স্বাস্থ্য, যৌবন, তেজঃ, মেধা ও শক্তিকে ভাসাইয়া লইয়া একটা নিবীর্য্য অসুখী জীবনের আওতায় লইয়া আসে। তখন অসুস্থতা ও ব্যাধিই হয় জীবনের নিত্যসঙ্গী। সকল দেশের বিশেষজ্ঞদের অনুসন্ধানের ফলে এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবেই জানা গিয়াছে যে, যুবক ও কিশোর বয়স্কদের মধ্যে শতকরা ৭৫ হইতে ৯০ জন এই কার্য্যে রত হইয়া থাকে। কেহ কেহ অল্পদিন ইহা উপভোগ করে, কেহ কেহ বা বহুদিন ধরিয়া, এমনকি আজীবন এই কার্য্যে রত থাকে। কিশোরী বা যুবতীদের মধ্যেও এই কুপ্রথাটি বিস্তার লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণতঃ সহরের মেয়েদের বা স্কুল, কলেজ ও বোর্ডিংয়ের ছাত্রীদের মধ্যেই তাহা সীমাবদ্ধ দেখা যায়। গ্রাম্য মেয়েদের মধ্যে এ কুপ্রথাটী এখনও ততটা বিস্তারলাভ করিতে পারে নাই। অনেক সময় দেখা যায়, অল্পবয়স্কা বিধবারাও ইহাকে আয়ত্ব করিবার চেষ্টা পান। কিন্তু ছেলেই হউক বা মেয়েই হউক, তাহারা বুঝিতে পারে না যে, অতিরিক্ত পানিমৈথুনের কুফল নানাবিধ; এবং তাহা নারীর উপর বেশী বর্ত্তে, কি পুরুষের উপর বেশী বর্ত্তে—সে বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। ডাক্তারগণ মত প্রকাশ

করিয়াছেন, পানিমৈথুন বালকদের পক্ষেই বেশী মারাত্মক, বালিকাদের পক্ষে ততটা নহে। এ কার্য্যে বালকদের রেতঃপাত হইবার দরুণ তাহারা সত্বর স্নায়বিক রোগগ্রস্ত ও জীর্ণ হইয়া পড়ে। কিন্তু যৌন-বৈজ্ঞানিকগণ এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন: বালিকাদের স্নায়ুযন্ত্রাদি বালকদের চাইতে দুর্ব্বল ও কোমল বিধায় ইহাদিগকেই বেশী ক্ষতিগ্রস্তা হইতে হয়।

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে, অতিরিক্ত সহবাস অপেক্ষা পানিমৈথুন দ্বারা মানবশরীর অধিক ক্ষয়গ্রস্ত হইয়া থাকে। অনেক ক্ষেত্রে পানিমৈথুন স্বাভাবিক মৈথুনের কাজ সম্পন্ন করিয়া দেয় এবং অভ্যস্ত ব্যক্তিকে উহা হইতে হঠাৎ নিবৃত্ত করিলে দেখা যায়, তাহার স্বপ্নদোষের অতি প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। এ কুঅভ্যাস হইতে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে ইহা বহুক্ষেত্রেই দেখা যায়। আর ইহাও ঠিক যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অস্বাস্থ্যবান ও দুর্ব্বল ব্যক্তিরাই এই কদভ্যাসের ফলে অতি শীঘ্র ব্যাধি-জর্জ্জরিত হইয়া পড়ে; কিন্তু সে তুলনায় সুস্থ ও স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা নিতান্ত আত্মপ্রেরণা বশে সামান্যরকম ভাবে এইপ্রকার মৈথুনে রত হইলে তেমন কিছু অসুস্থ হয়ও না। যে সকল বিবাহিত ব্যক্তি অর্থানুকুল্য বশতঃ একক-জীবন যাপন করেন এবং সহবাস আকাঙ্ক্ষায় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে করিতে অবশেষে অনিদ্রাজনিত ব্যাধির কবলে পতিত হন, তাঁহারা আত্মপ্রেরণা বশে যদি কখনও এইভাবে বাসনা তৃপ্ত করেন, তাহাতে অনেক সময় তাঁহাদিগকে সুস্থ ও স্বাভাবিক থাকিতে দেখা যায়। কিন্তু কুফল ও দৈহিক ক্ষতির পরিমাণ তখনই বর্দ্ধিত হয়, যখন ঐ কার্য্যের জন্য তাহার মনে লজ্জা, ভয় ও বিবেকদংশন আরম্ভ হয়।

বাল্যজীবনে পানিমৈথুনের অপকারিতা খুবই বেশী। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিশোরেরা এই অপরিণত বয়স হইতেই এই কুঅভ্যাসের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং এই বয়সে এই কার্য্যের দ্বারা শরীর বিশেষভাবে জখম হইয়া থাকে। এ কার্য্যের আনন্দ-শিহরণের জন্য কিশোর জীবনে একবার এই রসাস্বাদন হইলে আর রক্ষা নাই, পুনঃ পুনঃ সে ইহার পিছনে প্রাণ-মন সমর্পণ করে ও ইহার জন্য বিশেষ চঞ্চল হইয়া পড়ে। ফলে অকাল বার্দ্ধক্য, হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য, হৃদ্‌স্পন্দন, শিরোপীড়া, চক্ষুরোগ, মুখব্রণ প্রভৃতির সূত্রপাত এবং অতিরিক্ত শুক্রক্ষয়জনিত কারণে জননযন্ত্রটী অনেক সময়ই বক্র ও ক্ষুদ্রাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সামান্য ঘর্ষণ ও স্পর্শনেও রেতঃক্ষয় হইতে থাকে।

যৌবনে ও তাহার পরবর্ত্তী অবস্থায় এই কুঅভ্যাসের ফল বাল্যের ন্যায় ততটা মারাত্মক হয়না বটে, কিন্তু তখন লক্ষ্য বিষয় এই যে, সে পাত্‌লা ছিপ্‌ছিপে চেহারার স্নায়বিক লোক কিনা—কারণ তাহার উপর ইহার কুফল মারাত্মক। তবে সুপুষ্ট সুস্থ দেহধারীর পক্ষে পানিমৈথুনে ততটা কুফল বিস্তার করে না। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যুবকেরা সাধারণতঃ এই কুঅভ্যাসের পরিণামটী পূর্ব্ব হইতে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ঘন ঘন ঐ কার্য্যে রত হওয়ার দরুণ অনেকে শীঘ্রই শয্যাশায়ী হন, নতুবা তাহাদের বিবাহিত-জীবন হয় দুঃখময়, অসুখী এবং তাহাদের জীবনীশক্তি ক্ষীণভাবে বিরাজ করে। ইহার দ্বারা স্নায়ুরোগ, অকালবার্দ্ধক্য, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ, মাথাধরা বা শিরোপীড়া জন্মাইবেই, তাহা ছাড়া জননযন্ত্র ক্ষুদ্র ও বক্র হইয়া একপাশে হেলিয়া যায়। এই কুপ্রথাটি এমন যে, পিতামাতার ঐ দোষ থাকা হেতু উহা সন্তানেও বর্ত্তিয়া থাকে। ইহার সহজসাধ্য প্রতিকারের কয়েকটী প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করিতেছি। এ সম্বন্ধে নবীনযুগের পিতা-মাতা একটু সক্রিয় ও সচেতন হইলে সন্তানদের যথেষ্ট উপকার করিবেন সন্দেহ নাই।

## বাল্যজীবনে পালনীয় ঃ

বিবাহিত-জীবনে কোন যুবক-যুবতীরই পানিমেহনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহার ফলে তাহাদের ভবিষ্য সন্তান-সন্ততির এই কু-অভ্যাসে রত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

(১) শিশুদের জননযন্ত্র সর্ব্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার এবং কেবল শীতল জলে ধৌত করার সময় ভিন্ন কদাচ তাহা স্পর্শ করিতে দিবেন না।

(২) শিশুদের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ একটু ঢিলা হওয়া প্রয়োজন— আটাসোটা পোষাক শিশুদের পক্ষে মারাত্মক।

(৩) শিশু সদাসর্ব্বদা জননযন্ত্রে হাত দিতে চাহিলে যৌন-বিচক্ষণ চিকিৎসকের দ্বারা পরীক্ষা করানো উচিত।

(৪) শিশুদিগকে কদাচ ঝি-চাকরাণী বা বালকের হস্তে দিবেন না।

(৫) শিশু কিশোরবয়স্ক হইলেই তাহার স্বতন্ত্র শয্যায় শয়নের ব্যবস্থা করা দরকার। এক বিছানায় শুইবার ব্যবস্থা কোনক্রমেই উচিত নহে।

(৬) কোমল শয্যা শিশু ও তরুণ বয়স্কদের পক্ষে মারাত্মক ফলদায়ক।

(৭) বালকদের খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। উগ্র দ্রব্যাদি ও অপরিমিত আহার তাহাদের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক।

(৮) শাকসব্জি এবং প্রচুর জলপান করানো শিশুর স্বাস্থ্যের পক্ষে সবচেয়ে সুফলপ্রদ।

(৯) কোষ্ঠবদ্ধতা যাহাতে না জন্মে সেইদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিতে হইবে, কারণ ইহা হইতে পানিমেহন, স্বপ্নদোষ ও অন্যান্য যৌনব্যাধি প্রভৃতি অধিক ক্ষেত্রেই দেখা দিয়া থাকে।

(১০) তলপেটে বা কোমরে খুব বেশী কাপড়-চোপড় জড়াইতে দেওয়া উচিত নহে।

(১১) তাহাদিগকে বিনা কাজে ও আলস্যে কালক্ষেপণ করিতে দেওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে।

(১২) প্রত্যহ প্রত্যুষে যাহাতে তাহাদের নিদ্রা ভাঙ্গে এবং কোনরূপ আলস্য না করিয়া যাহাতে তাহারা একলাফে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া আসে তাহা লক্ষ্যণীয়।

(১৩) বালকদিগকে দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন।

(১৪) তাহাদের খেলার সঙ্গীদের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার—যেন কু-সংসর্গে না মিশে।

## বিবাহিত-জীবনের আদর্শ :

স্ত্রী পুরুষের দাম্পত্য-জীবনের কি আদর্শ হওয়া উচিত এ বিষয়ে অনেকের অনেক রকম মতামত আছে। এ্যামেরিকার প্রসিদ্ধ উইলিয়ম থ্রাস্‌টন নামে জনৈক লেখকের গ্রন্থ "Thurston's Philosophy of Marriage" বা "থ্রাসটনের বিবাহ দর্শন" হইতে খানিক আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। মিঃ উইলিয়ম থ্রাস্‌টন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনীর মেজর ছিলেন। দশবছর কাল চাকুরী করিয়া তিনি চীন, জাপান, ইয়োরোপ প্রভৃতি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়া জীবনে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, উল্লিখিত গ্রন্থে তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন : "নারী সারাজীবন পুরুষের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া তাহার পেটের ভাতের ও মাথা গুঁজিয়া থাকিবার আশ্রয়ের জন্য কি গর্ভাবস্থায় বা অন্যাবস্থায় প্রতিরাত্রি সেই পুরুষের সহিত একই

শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে?—প্রকৃতির কখনও এ উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

"বর্ত্তমান বিবাহের আইন-কানুন ও আচার ব্যবহারের ফলে এবং পুরুষ ও নারীর অহোরাত্র একত্র বসবাসের ফলে অবাধ যৌনমিলনই প্রশয় পায়। উহার ফলে পুরুষ নারী উভয়েরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বিকৃত হইয়া যায়। পরন্তু শতকরা ৯০জন বিবাহিতা নারীকে বেশ্যার সমতুল্য করিয়া তোলে। এইরূপ হওয়া এই জন্যই সম্ভব হয় যে, বিবাহিতা নারীদিগকে বুঝান হইয়াছে যে, যেহেতু এই মিলন আইনসঙ্গত, সেই হেতু এই গণিকাবৃত্তি ন্যায়সঙ্গত ও স্বাভাবিক। তাহাদের আরও বুঝানো হইয়াছে যে, তাহাদের স্বামীর ভালবাসা সংরক্ষণের জন্য এইরূপ করার দরকার আছে।

"ইহার ফলে নারীগণ অতিমাত্রায় স্নায়ুরোগগ্রস্তা," অকালবৃদ্ধা, অল্পে কোপনস্বভাবা, অস্থিরচিত্ত ও অসন্তুষ্ট হয় এবং সন্তান-সন্ততির যত্ন লইতে পারে না। দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অবাঞ্ছিত বহু সন্তান আনয়নের পথ প্রস্তুত করে। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে অবাধ যৌনমিলন শেষে জন্মনিরোধ ও গর্ভস্রাবের পথ প্রস্তুত করে। যদি সাধারণ শ্রেণীর নারীদের মধ্যেও জন্ম-নিয়ন্ত্রণের নামে বা অপর কোন নামে জন্ম-নিরোধের প্রচার চালান যায়, তাহা হইলে জাতি রুগ্ন, নীতিহীন, আচারভ্রষ্ট হয় এবং পরিণামে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যে জীবনীশক্তির প্রয়োজন, অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগে তাহা শুষ্ক করিয়া দেয়। বর্ত্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিপত্নীক অপেক্ষা বিধবার সংখ্যা ২০লক্ষ বেশী। ইহার মধ্যে যুদ্ধের দরুণ বিধবার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

"লাভজনক কাজের অভাবেই যে অধুনা জগতে দারিদ্র্য বা অস্বস্তি দেখা দিয়াছে তাহা নহে, অতিমাত্রায় অতিরিক্ত যৌনসম্ভোগই ইহার মূল কারণ। আর উহার মূলেও রহিয়াছে আধুনিক বিবাহের

আইনকানুন। বিশেষতঃ গর্ভাবস্থায় যৌনসম্ভোগই হইতেছে সবচেয়ে সর্ব্বনাশা। ইহার প্রতিকার হইতেছে, স্বামী-স্ত্রী সর্ব্বদা স্বতন্ত্র ঘরে ও স্বতন্ত্র শয্যায় শয়ন করিবে। যখন উভয়ে ( বিশেষতঃ স্ত্রী ) সন্তান কামনা করিবে, তখনই উভয়ে একত্রিত হইবে, অন্য সময়ে নহে।"

মিঃ থ্রাসটনের এ দর্শন অনেকটা প্রাচ্য আদর্শেই প্রভাবান্বিত। আমাদের হিন্দুঋষিগণ বহু পূর্ব্বেই এইরূপ আদর্শ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আমি বিবাহিত নর-নারীর মিথুনাদর্শ সম্পর্কে প্রাচীন ভারতের গৌরব, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র, আয়ুর্ব্বেদের অন্যতম ঋষি মহর্ষি সুশ্রুতের মিথুনাদর্শ সম্পর্কে মতামতটুকু অধিক সমর্থনযোগ্য ও নর-নারীর পক্ষে সহজ পালনীয় বলিয়া মনে করি। তিনি বলিয়াছেন: অধিক স্ত্রীসঙ্গম করিবে না। গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন অন্তর এবং অন্যান্য ঋতুতে অন্ততঃ তিনদিন অন্তর মিথুন বিধেয়। পুরুষের পক্ষে রজঃস্বলা, অকামা, মলিনা, অপ্রিয়া, উচ্চবর্ণা, বয়োজ্যেষ্ঠা, হীনাঙ্গী, ব্যাধিপীড়িতা, গর্ভিনী, যোনীরোগগ্রস্তা, সগোত্রা, গুরুপত্নী, অগম্যা ও প্রব্রজিতা রমণীতে গমন নিষেধ।

প্রাতঃকালে, অর্দ্ধরাত্রে, মধ্যদিনে এবং লজ্জাবহ, অনাবৃত বা কলুষিত স্থানেও মিথুনকার্য্য নিষেধ। পুরুষের পক্ষে রমণকালে ললাটদেশ অনাবৃত রাখা অনুচিত। ঊর্দ্ধভাবে, সম্পূর্ণ চিৎ হইয়া অথবা তির্য্যকযোনিতে বা যোনি ভিন্ন অন্য যে কোন প্রকার মৈথুন বিবিধ অনিষ্টকর।

মিথুনান্তে মধুর ভক্ষ্যদ্রব্য, চিনিমিশ্রিত দুগ্ধ ও মাংস-রস প্রভৃতি দ্রব্য পান-ভোজন এবং স্নান, ব্যজন ও নিদ্রা বিশেষ হিতকর।

# পুং-জননযন্ত্রাবলী

পুরুষের দুই পায়ের মধ্যস্থল লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দেখান হইয়াছে, ইহার দ্বারা জননযন্ত্রাবলীর অবস্থান বুঝুন। ১। মুত্রস্থলী (Bladder) ২। মুখশায়ী গ্রন্থি ( Prostate gland ) ৩। ইউরিথ্রার মেম্বে্রনাস অংশ ৪। ইউরিথ্রার স্পঞ্জি অংশ ৫। কর্ত্তিত ক্রশ পেনিস্ ৬। শুক্রাধার ( Visicula seminalis ) ৭। শুক্র প্রণালীদ্বয় ( কর্ত্তিত ) ( Vas deferens ) ৮। ইউরিটর ৯। লিভেটর এনাই পেশী ( কর্ত্তিত ) ১০। রেক্টোভেসিক্যাল ১১। মলদ্বার।

# চতুর্থ অধ্যায়

## যৌনযন্ত্র ও তাহার কার্য্যাবলী

### পুং-জননেন্দ্রিয় ঃ

পুংজননযন্ত্রাবলী সমূহকে দুইভাগে বিভক্ত করা চলে ঃ—

১। শিশ্ন বা ইংরাজী নাম পেনিস ( Penis ).

২। মুষ্ক বা ইংরাজী নাম টেষ্টিস্ ( Testes ).

প্রথমতঃ শিশ্ন। বাহ্যতঃ ইহার দ্বারাই সঙ্গমকার্য্য সাধিত হয়। সহজ উত্তেজনাহীন অবস্থায় ইহা ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি লম্বা থাকে এবং প্রায় এক ইঞ্চি মোটা হয় এবং ইহা শিথিল ও ক্ষুদ্রভাবে মুষ্কের উপর দোলায়মান অবস্থায় নিম্নমুখী হইয়া অবস্থান করে। যখন ইহা উত্তেজনা প্রাপ্ত হয়, তখন ইহার আকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ৫ হইতে ৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১॥০ ইঞ্চি মোটা হয় এবং শক্ত ও অনেকটা ত্রিকোণাকৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহা উত্থানশীল কতকগুলি তন্তুময় পদার্থদ্বারা পরিপূর্ণ ও তিনটী নলাকৃতি জিনিষে গঠিত। এই নলাকৃতি পদার্থকে ইংরাজীতে Cylindrical bodies কহে। আবার এই নলাকৃতি বস্তু তিনটীর দুইটী আলাদা নাম আছে। শিশ্নার দুই পার্শ্বে যে দুইটী নল অবস্থিত, তাহাকে বাংলায় পার্শ্বকক্ষাঙ্গ বা ইংরাজীতে Corpora-Cavernosa বলে এবং অপর নলটী উক্ত নল দুইটীর মধ্যে খানিক নীচের দিকে অবস্থিত ; ইহার নাম নিম্নমধ্য কক্ষাঙ্গ বা Corpus-spongiosum. এই নলগুলি বস্তুতঃ পৃথক হইলেও পরস্পরের গায়ে লাগালাগিভাবে অবস্থিত। পার্শ্বকক্ষাঙ্গ (Corpora-Cavernosa) বস্তিকোটর হইতে আরম্ভ হইয়া শিশ্নার মধ্যভাগ পর্য্যন্ত একত্রে মিলিত হইয়া শেষ হইয়াছে। কিন্তু নিম্ন কক্ষাঙ্গ উহার সঙ্গে সঙ্গে মিলিতভাবে আসিয়াও সেইখানেই শেষ না হইয়া আরো কতকটা অগ্রসর

হইয়া একেবারে লিঙ্গমুণ্ডে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এখন আমরা আবার শিশ্নকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতে চাই। কারণ উহার চারিটী ভাগের আলাদা আলাদা নাম আছে। এইখানে আমরা বুঝিবার সুবিধার জন্য 'শিশ্নে'র সাধারণ নাম 'লিঙ্গ' বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। লিঙ্গের চারিভাগ এইরূপ—যথা : Root, Body, Neck এবং Glans Penis. ইহার বাংলা দাঁড়ায় এইরূপ : মূল, দেহ, গ্রীবা এবং মুণ্ড। এই চারি ভাগের পরিচয় এইরূপ :—

(ক) Root (লিঙ্গমূল)—অর্থাৎ লিঙ্গের যে অংশ বস্তিকোটরের মধ্যে Ligaments বা বন্ধনীজাল দ্বারা বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischio pubic rami) এবং বিটপ ('মণিপুর'—Symphysis) উপস্থি সমূহের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, উহাকেই লিঙ্গমূল কহে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে বলে লিঙ্গের গোড়ার দিক। যৌবনে প্রত্যেক পুরুষেরই লিঙ্গের গোড়া হইতে লিঙ্গপৃষ্ঠের উপরিভাগ (Pubic, বিটপ বা মণিপুর) কেশাবৃত হইয়া থাকে।

(খ) Body (লিঙ্গদেহ) :—অর্থাৎ সম্মুখের খাঁজকাটা অংশের পর হইতে লিঙ্গমূলের সেই আভ্যন্তরিণ নলসমূহের মিলিত স্থল পর্য্যন্ত অংশই লিঙ্গদেহ নামে পরিচিত।

(গ) Neck (লিঙ্গগ্রীবা) :—অর্থাৎ লিঙ্গদেহ ও লিঙ্গমুণ্ডের মধ্যের যে খাঁজকাটা শ্লৈষ্মিকঝিল্লী আবৃত স্থানটি বিদ্যমান (যাহা অগ্রত্বক দ্বারা সাধারণতঃ ঢাকা থাকে) উহাই লিঙ্গগ্রীবা বা ইংরাজী অপর একটী নাম Cervix.

(ঘ) Glans Penis (লিঙ্গমুণ্ড) :—অর্থাৎ লিঙ্গের অগ্রভাগ বা সুপারির ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট স্থানটীকেই লিঙ্গমুণ্ড বলা হয়। ইহার সম্মুখভাগে যে কতকটা স্থান ছিদ্রযুক্ত তাহাকে প্রস্রাবদ্বার (Meatus urinarious) কহে।

এতদ্ভিন্ন integnment বলিয়া একটী কোমল ও পাতলা ত্বকের দ্বারা লিঙ্গটী আবৃত। ইহার বাংলা নাম অনেকে শিশ্নবহিত্বক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। লিঙ্গমুণ্ডাবরক (Prepuce) ত্বকটুকু আবার লিঙ্গাবরক ত্বক হইতে একটু বিশেষত্বপূর্ণ অর্থাৎ উহা দ্বিভাজ করা এবং ইহা এমন আল্গাভাবে লিঙ্গমুণ্ডকে ঢাকিয়া রাখে যে লিঙ্গ উচ্ছ্রিত হইলে ইহা আপনা হইতেই কতকটা পশ্চাৎভাগে সরিয়া যায়।

শিশ্নের গঠন বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনায় দেখা যায়, ইহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা, ধমনী এবং কৈশিকজাল (Capillaries) পূর্ণ। এই সকল শিরাসমূহে বহুলভাবে রক্ত প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরাসমূহ একটা বৃহৎ শিরায় পরিণত হইয়া লিঙ্গের পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিতভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহা ছাড়া আরও একটা দেখিবার বিষয় এই যে, লিঙ্গমধ্যে তিনটী গ্রন্থিও বিদ্যমান। একটী গ্রন্থিদ্বারা লিঙ্গের মূলদেশের কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ পরিবেষ্টিত। ইহার আকৃতি অনেকটা পিয়াজের অনুরূপ এবং ইহার ইংরেজী নাম Prostate gland বা বাংলায় মুখশায়ী গ্রন্থি বলে। ইহা ঠিক শুক্রাধারের নিম্নে অবস্থিত। প্রষ্টেট বা মুখশায়ী গ্রন্থি হইতে লালাবৎ একপ্রকার রস নির্গত হইয়া থাকে। ইহার আর একটু নিম্নে অর্থাৎ লিঙ্গমূলের অল্প পশ্চাৎভাগে মূত্রমার্গের দুইদিকে মটরের ন্যায় ক্ষুদ্র দুইটী গ্রন্থি আছে। ইংরাজীতে ইহাকে Cowper's glands বা বাংলায় ইহাকে মটরগ্রন্থী বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই গ্রন্থিদ্বয় হইতেও একপ্রকার লালাবৎ রস নির্গত হইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ মুষ্ক—বাহ্যতঃ দেখা যায় যে, ইহা দুইটী অণ্ডবৎ পদার্থ বিশেষ। বাহ্যতঃ এই অণ্ডদ্বয় লিঙ্গের নিম্নদেশে একটী দোলায়মান চর্ম্মথলিকার মধ্যে অবস্থিত। এককথায় বলিতে গেলে পুংজননেন্দ্রিয়ের প্রধান যন্ত্রই হইল এই অণ্ড বা মুষ্কদ্বয়। কারণ ইহারাই শুক্র উৎপাদন

করিয়া থাকে। প্রথমতঃ দেখা যায়, পুংশিশু যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করে তখন পঞ্চম মাস সময় পর্য্যন্ত এই মুষ্ক (testes) বা অণ্ডদ্বয় উহার বস্তিকোটরে অবস্থান করে। গর্ভস্থ পুংসন্তান যখন পঞ্চমমাস অতিক্রম করে তখন উহা ক্রমেই বস্থিকোটর হইতে নামিয়া আসিতে থাকে এবং অষ্টম মাস বা কখনও কখনও শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মুষ্কদ্বয় চর্ম্মথলিকার ( অণ্ডকোষ বা Scrotum ) মধ্যে নামিয়া আসে। মূলতঃ এই চর্ম্মথলিকা (Scrotum) একটী বলিয়া পরিদৃশ্যমান হইলেও মাঝামাঝি একটা শিরার দ্বারা স্বতন্ত্র—এইরূপ বুঝা যায় এবং বাস্তবিক পক্ষে ভিতরে ইহা দুইভাগেই বিভক্ত ও প্রত্যেক কোষে একটী করিয়া অণ্ড সুরক্ষিত। ইহা বিটপদেশের নিম্নে এবং লিঙ্গমূলের সঙ্গে সংলগ্ন রহিয়া দোলায়মান অবস্থায় ঝুলিতে থাকে। এই যে অণ্ডদ্বয়, ইহার এক একটী ছয়-সাত ভাঁজ আবরকঝিল্লীতে আবৃত। এই মুষ্কদ্বয়ে দুইটী শুক্রবাহী নলী (Spermatic cord) সংযুক্ত রহিয়া প্রকৃতপক্ষে এই অণ্ডদ্বয়কে যেন ধরিয়া রাখিয়াছে। শুক্রবাহী নলীদ্বয় হইল পূর্ব্ববর্ণিত ধমনী ও কৈশিকজাল পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিরার সমষ্টিমাত্র। শুক্রবাহী নলীদ্বয়ের বামদিকেরটী প্রায় ৩"—৪"ইঞ্চি এবং ডানদিকেরটী প্রায় ৪"—৫"ইঞ্চি দীর্ঘ হইবে। মুষ্ক বা অণ্ডদ্বয় মাপিলে দেখা যায় সাধারণতঃ উহা লম্বায় ১৷৷০"—১৸০" ইঞ্চি, সম্মুখ-পশ্চাতে প্রায় ১।০" ইঞ্চি এবং পরিধি ¾"—১" পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। মুষ্কদ্বয় সূতার ন্যায় সূক্ষ্ম শিরাসমূহের দ্বারা রচিত পাতলা ঝিল্লীর দ্বারা গঠিত এবং বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটরবিশিষ্ট আধার বিশেষ৷৷ ইহার প্রত্যেকটী কোটরেই শুক্রকোষ রহিয়াছে। সাধারণতঃ দেখা যায়, এক একটী মুষ্কে প্রায় ৩০০—৪০০ শত শুক্রকোষ বিদ্যমান এবং ইহার প্রত্যেকটী কোষে আশ্চর্য্যভাবে প্রায় ২।৩ হস্ত পরিমিত অতি সূক্ষ্ম সূত্রনালী কুণ্ডলী পাকানো অবস্থায় রহিয়াছে। এই সকল সূক্ষ্ম নালীসূত্রকে

শুক্র-অণুপ্রণালী নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে; এবং এই সকল নালী-প্রণালী হইতেই যে রস নির্গত হয় তাহাইকে শুক্র বা ইংরাজীতে Semen বলা হয়। তাহা ছাড়া বাংলায় বীর্য্য বা রেতঃ প্রভৃতিও বলা হইয়া থাকে। শুক্র একপ্রকার বিচিত্র গন্ধবিশিষ্ট গাঢ় দুগ্ধবর্ণ আঠাবৎ পদার্থ বিশেষ। এই শুক্রমধ্যে ভাসমান অবস্থায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে যে সকল অসংখ্য কীটাণু পরিদৃষ্ট হয়, উহাকে শুক্রকীটাণু বা স্পার্মাটোজোয়া (Spermatozoa) বলে। শুক্রকীটাণুর আকৃতি ল্যাজবিশিষ্ট ব্যাঙাচির মত, কিন্তু উহা $\frac{১}{৫০০০}$ ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ বলিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না।

শুক্রপ্রণালীচয় নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া গেলেও উহা প্রধানতঃ একটী নালীতেই পরিণত হইয়াছে এবং ইহার ইংরাজী নাম দেওয়া হইয়াছে Vas deferens. এই মূল নালীটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২′—২।০′ ফুট হইবে। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নালী সমূহের সমন্বয় ঘটা সত্ত্বেও ইহা সূত্রবৎ আকৃতি বিশিষ্ট। এই নালীটি ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া মলদ্বারের ঊর্দ্ধভাগে এবং মুত্রাশয়ের ( Bladder ) নিম্নভাগে আসিয়া সমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই শুক্রনালীর নিম্নদেশে এবং মুষ্কদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগে প্রায় একটী ১৪ হস্ত পরিমিত নালী সম্পূর্ণ জড়ীভূত অবস্থায় বৃথাই যেন অবস্থান করিতেছে। কারণ ইহার কার্য্যাবলী মানুষের জ্ঞানানুশীলনে ধরা পড়ে নাই। যাহা হউক শুক্রনালীর (Vas deferens) তলদেশে দুইদিকে দুইটী শুক্রাধার (Vesicula seminales). স্থাপিত রহিয়াছে। শুক্রাধারের আকৃতি অনেকটা বড় হরীতকীর ন্যায় এবং ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ২।০″—২॥০″ ইঞ্চি হইবে। শুক্র তৈয়ারী হইয়া এই দুইটীতে সঞ্চিত থাকে, এবং এই দুইটী হইতেও এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া শুক্রের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। শুক্রাধার হইতে আবার দুইটী ক্ষুদ্র নালী, যাহার ইংরাজী নাম Ducts,

বাহির হইয়াই শুক্রনালীর সহিত মিশিয়াছে এবং শুক্রনালী হইতে এক ইঞ্চি পরিমিত দুইটী নালী, যাহাকে বলা হয় শুক্রপ্রক্ষেপক নালী (Ejaculatory Ducts), দুইদিক হইতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া লিঙ্গের মূলদেশে ও মূত্রমার্গে (Urethra) উন্মুক্ত রহিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত প্রষ্টেট গ্ল্যাণ্ড বা মুখশায়ী গ্রন্থী এবং কাউপার গ্ল্যাণ্ডস্ বা মটর গ্রন্থিদ্বয়ের মুখও এই মূত্রমার্গেই উন্মুক্ত। শুক্রক্ষরণের সময় উক্ত গ্রন্থিচয় হইতেও এক এক প্রকার রস নিঃসৃত হইয়া শুক্রসহ মিশ্রিত হইয়া থাকে।

## স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় :

স্ত্রীজননযন্ত্র সমূহকে আমরা তিনভাগে বিভক্ত করিতে চাই :

১। বহিরাঙ্গ—ভগ (Vulva), কামাদ্রি (Monsveneries), ভগৌষ্ঠ (Labia) প্রভৃতি।

২। ভিতরাঙ্গ—যোনী (Vagina), জরায়ু (Uterus), ডিম্বকোষ (Ovaries) প্রভৃতি।

৩। উপাঙ্গ—স্তন (Breasts বা Mammae)।

প্রথমতঃ বহিরাঙ্গগুলি লইয়া আলোচনা করিলে আমরা এই যন্ত্রগুলি দেখিতে পাই। যথা—ভগ (Vulva বা Prudendum), ভগাঙ্কুর (Clitories), বৃহৎ ভগৌষ্ঠদ্বয় (Labia majora), ক্ষুদ্র ভগৌষ্ঠদ্বয় (Labia minora), কামাদ্রি (Monsveneris), প্রস্রাবদ্বার (Female Urethra), সতীচ্ছদ (Hymen), যোনী (Vagina) প্রভৃতি।

দ্বিতীয়তঃ ভিতরাঙ্গের পরিচয় লইলে আমরা এইগুলিকে পাই :—জরায়ু (Uterus), ডিম্বকোষদ্বয় (Ovaries), ডিম্ববাহী দুইটী নল (Fallopian tubes)।

# স্ত্রী-জননযন্ত্রাবলী

স্ত্রীলোকের দুই পায়ের মধ্যস্থল লম্বালম্বিভাবে চিরিয়া দেখান হইয়াছে, ইহার দ্বারা জননযন্ত্রাবলীর অবস্থান বুঝুন ১। মূত্ররন্ধ্র ২। মূত্ররন্ধ্র মুখ ৩। জরায়ু মস্তক ৪। জরায়ু গ্রীবা ৫। জরায়ুর মুখ ৬। জরায়ু মুখের ভিতরাংশ ৭। অসের পেষ্টিরিয়ার ওষ্ঠ ৮। পেরিটোনিয়ামের সেকসন ৯। কামাদ্রি ১০। শিশ্নিকা মণি ১১। ডিম্বাশয় ১২। ছড়ানো বন্ধনীজাল ১৩। বিটপ বা মণিপুর।

তৃতীয়তঃ উপাঙ্গে আমরা পাই স্তনদ্বয় (Breasts বা Mammae) এবং তাহার বৃন্তদ্বয় বা চুঁচুক (Nipple)।

এইবার ঐ সকল যন্ত্র সমূহের কার্য্যাবলীর বিষয় দেখিতে চাই।

(ক) কামাদ্রি (Monsveneries) ভগের উর্দ্ধাংশকে বলা হয়। যৌবনকালে স্ত্রীলোকের এই স্থান কেশাবৃত হইয়া থাকে। বস্তিকোটরস্থ (Pelvic) বিটপের ঠিক সম্মুখস্থ বা উপোরস্থ যে মেদপূর্ণ অংশ, উহাই কামাদ্রি নামে অভিহিত। পুরুষের যেমন লিঙ্গ পিঠ, স্ত্রীলোকের তেমনি কামাদ্রি—উভয়ই একই প্রকৃতির।

(খ) মদনছত্র বা উর্দ্ধসন্ধির ইংরাজী নাম Anterior Commissure. ইহা কামাদ্রির নিম্নে বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয়ের উর্দ্ধ মিলনস্থল।

(গ) শিশ্নিকামণি বা মদনছত্রের ইংরাজী নাম Clitoris. উর্দ্ধসন্ধির প্রায় অর্দ্ধ-ইঞ্চি নিম্নে ইহা অবস্থিত। ইহা পুরুষের শিশ্নের ন্যায় উত্থানশীল তন্তুসমূহে গঠিত বলিয়া এবং অনেকটা পুরুষের শিশ্নের ন্যায় ক্ষুদ্রাকার বিশিষ্ট বলিয়া ইহার নাম শিশ্নিকা। স্ত্রীলোকের রতিক্ষুধা জাগাইবার ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভের ইহা একটী প্রধান যন্ত্র বিশেষ। দৈর্ঘ্যে ইহার আকার প্রায় ১॥০" ইঞ্চির কম নহে, কিন্তু ইহার অধিকাংশই উর্দ্ধসন্ধির ভিতর দেশে অবস্থান করে ও ভগপক্ষ বা ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠ (Nymphae বা Labia minora) দ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া ইহার ক্ষুদ্র মুণ্ডটুকুই মাত্র পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তেজনা প্রাপ্ত হইয়া ইহা পুরুষের শিশ্নের ন্যায় উচ্ছ্রিত হইয়া উঠে।

(ঘ) বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয় (Labia majora) যোনীর বহির্দ্দেশে দুই পার্শ্বে অবস্থিত সুকোমল স্থূল দুইটী ঠোঁটের ন্যায় পদার্থ। ইহার ভিতরাংশ শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এই বহিরোষ্ঠদ্বয় বালিকা বয়সে পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় থাকে, কিন্তু পরে দুইটী পৃথক্ হইয়া যায়। ইহারা কামাদ্রির নিম্নদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমান্বয়ে মলদ্বারের

সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ যে স্থানের নাম মুলাধার পীঠ (Perineum) সেই স্থান পর্য্যন্ত নামিয়া দুই মুখ একত্র হইয়াছে। এই মিলিত সন্ধিস্থলকে নিম্নসন্ধি (Posterior commissure) কহে। নিম্ন সন্ধি-স্থলটি উর্দ্ধসন্ধিস্থল হইতে অনেকাংশে ক্ষীণ। এই বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয়ের উপরিভাগে যৌবনকালে অল্প অল্প কেশোদগম হইতে দেখা যায়। এক একটী দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩"ইঞ্চির কম নহে।

(ঙ) মুত্ররন্ধ্র (Female Urethra)। ইহা ভগাঙ্কুরের প্রায় এক ইঞ্চি নিম্নে অবস্থিত ও দৈর্ঘ্যে ইহার গভীরতা প্রায় দেড় ইঞ্চি হইবে। মুত্ররন্ধ্র মুখ বা প্রস্রাবদ্বারের (Meatus urinaris) ব্যাস প্রায় ¼ ইঞ্চির কম নহে।

(চ) ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠদ্বয় (Labia minora)—বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয়ের ভিতরেই এই ক্ষুদ্র ভগোষ্ঠদ্বয় অবস্থিত এবং কোমল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিদ্বারা আবৃত। ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৷৷৹" ইঞ্চির মত হয়। ইহাদের পশ্চাৎভাগ বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয়ের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভগাঙ্কুরের নিকট আসিয়া ইহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহারাই ভগাঙ্কুরকে আবৃত রাখে বলিয়া ইহাদিগকে ভগপুচ্ছ বলা হয়।

(ছ) সতীচ্ছদ (Hymen)—ইহা প্রস্রাবদ্বারের নিম্নে ও যোনীদ্বারের উপরের একখানি পাতলা পর্দা বিশেষ। ইহা কুমারী মেয়েদের যোনীমুখ ঢাকিয়া রাখে—পর্দার ঠিক মাঝখানটায় একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যাহাতে কেবলমাত্র অঙ্গুলীর অগ্রভাগ প্রবেশ করানো যাইতে পারে। স্ত্রীলোক পুরুষ-সংসর্গা হইলেই ইহা ছিঁড়িয়া যায়। এতকাল ইহার দ্বারা স্ত্রীলোকের অক্ষতযোনিত্ব বা সতীত্ব প্রমাণের নজির হিসাবে ইহাকে এই নাম প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে চিকিৎসকদের গবেষণার ফলে এই সত্য প্রকটিত হইয়াছে যে, সকল ক্ষেত্রে এই নজির মানা

চলে না। কারণ অনেক সময় সঙ্গমান্তেও অনেকানেক নারীর ইহা বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়; আবার সঙ্গমহীনা অনেক বালিকার কোন শক্ত অসুখ বিসুখ কিংবা দৌড়ঝাঁপ প্রভৃতির দরুণ এই চ্ছদ আপনা হইতেই ছিঁড়িয়া যায়। কাহারো কাহারো জন্মাবধি সতীচ্ছদ থাকে না। কাহারো কাহারো এই চ্ছদ এত শক্ত হয় যে, অস্ত্র না করিলে পুরুষ সঙ্গম করিতে পারে না।

(জ) যোনীদ্বার ও যোনীরন্ধ্র (orifice of vagina ও vagina): মূত্ররন্ধ্রের পরই যোনীদ্বার অবস্থিত। যোনীদ্বার বৃহৎ ভগোষ্ঠদ্বয়ের দ্বারা কথঞ্চিৎ আবৃত থাকে। যোনী একটী বক্রগামী গহ্বর বিশেষ এবং ইহার গভীরতা ৫"—৬" ইঞ্চি দৈর্ঘ্য। ইহা ভিতরে জরায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত; পক্ষান্তরে জরায়ু হইতে আরম্ভ হইয়া ভগ পর্য্যন্ত উন্মুক্ত রহিয়াছে। যোনীর রন্ধ্রপ্রদেশ শ্লৈষ্মিক বিল্লিদ্বারা আবৃত। যোনীর ঠিক পশ্চাতে সরলান্ত্র বা মলদ্বার ও বিটপ (পেরিনিয়াম) অবস্থিত। যোনীপথ ভগোষ্ঠের নিকট সঙ্কীর্ণ, কিন্তু যতই ভিতরে অর্থাৎ জরায়ুর নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ততই বিস্তৃত। জরায়ুর নিকট ইহা অতিমাত্রায় প্রসারিত। যোনী সম্প্রসারণশীল ও উত্থানশীল তন্তু (erectile tissue) দ্বারা গঠিত। উহা এমনভাবে তৈয়ারী যে, আবশ্যক হইলে উহা আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সঙ্গমকালে সমস্ত পেনিসটী উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে এবং পেনিসের অতি দৈর্ঘ্যকার চেহারা হইলেও উহা আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র পেনিসটীকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়। যোনী গহ্বরের উর্দ্ধভাগে মূত্রস্থলি (bladder) স্থাপিত রহিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ ভিতরাঙ্গগুলির মধ্যে যোনীগহ্বরের পরই জরায়ু (uterus) অবস্থিত। ইহা কলসীর ন্যায় উপুর-করা একটী শূন্যগর্ভ থলি বিশেষ—যাহাতে সন্তান অবস্থান করে। এই জরায়ু মস্তকের দুই পার্শ্ব হইতে

দুইটী করিয়া নালী বাহির হইয়া প্রায় ৪" ইঞ্চি করিয়া দূরে অবস্থিত ও প্রায় ১॥০" দীর্ঘ দুইটী পাটলবর্ণ ডিম্বের ন্যায় পদার্থের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। এই নালী দুইটীকে ইংরাজীতে Fallopion tubes বা বাংলাতে ডিম্ববাহীনল এবং ঐ ডিম্বাকৃতি জিনিষ দুইটীকে বলে ডিম্বকোষ বা Ovaries.

(ক) জরায়ু (uterus)। আকারে একটা ক্ষুদ্র উপুর রাখা কলসীর মত এবং ইহার সম্মুখ ও পশ্চাৎ অংশ কিঞ্চিৎ চাপা বা চ্যাপ্টাকৃতি কিন্তু ফাঁপা। সাধারণ অবস্থায় কুমারী মেয়েদের জরায়ু ১॥০" ইঞ্চির মত হইয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীলোক একবার সন্তান ধারণ করিলেই ইহার দৈর্ঘ্যতা ৩" ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২" ইঞ্চির মত হইয়া থাকে। আর স্থূলতায় ১" এবং নিম্নাংশ ½" ইঞ্চির মত হয়। ইহা বস্তিকোটরের মাঝে স্থাপিত রহিয়া যোনী কর্ত্তৃক আলম্বিত হইয়া রহিয়াছে। জরায়ুর ঊর্দ্ধভাগে মূত্রস্থলি ও নিম্নভাগে মলাধার স্থাপিত ও মধ্যে জরায়ু অবস্থান করিতেছে। জরায়ুর ভিতরটা ফাঁপা হইলেও উহা ত্রিকোণাকৃতি এবং এই ত্রিকোণাকৃতি ফাঁপা স্থানটায়ই গর্ভ হইয়া থাকে। জরায়ুর প্রধান কার্য্য ভ্রূণকে ধারণ করা এবং ইহা অতিশয় সম্প্রসারণশীল। সন্তান বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা বর্দ্ধিত হয় এবং তখন ইহা বস্তিকোটর ছাড়াইয়া ঊর্দ্ধ উদরের অধিকাংশ স্থান ছাইয়া ফেলে কিন্তু পুনরায় সন্তান প্রসবান্তে ইহা স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রসবান্তে জরায়ু যখন ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হইতে থাকে তখন একটা বেদনা হয় যাহাকে চলিত কথায় 'হেতাল ব্যথা' বলিয়া অভিহীত করা হয় অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে বলে after pain. জরায়ুর ঊর্দ্ধদেশকে জরায়ু মস্তক (Fundus) আর নিম্নদেশকে বলা হয় জরায়ু দেহ (Body). যোনীর ভিতর দিয়া যে ছুচ্‌লো জিনিষটা হাতে ঠেকে উহা জরায়ুর মুখ (Os বা পুরা নাম Os-uteri externum).

তাহার পর ইহার গ্রীবদেশ বা জরায়ুর গ্রীবা (Neck বা Cervix)। জরায়ুর গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়াই যোনীপথের আরম্ভ। জরায়ুর মুখে ক্ষুদ্র রন্ধ্র আছে। সেই রন্ধ্রপথ দিয়াই পুরুষসঙ্গম সময়ে অনেক সময় শুক্রমধ্যস্থ কীটাণু জরায়ু গহ্বরে নীত হয়।

(খ) ডিম্ববাহীনল (Fallopian tubes)। জরায়ুর উর্দ্ধাংশে এই নলীদ্বয় উৎপন্ন হইয়া কিঞ্চিৎ বক্রভাবে ডিম্বকোষদ্বয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। ইহার এক একটী নল দৈর্ঘ্যে ৩"—৪" ইঞ্চি এবং ইহার ভিতরাংশ ফাঁপা ও নলের শেষাংশ অর্থাৎ যাহা ডিম্বকোষের উপরে অবস্থান করিতেছে—ঐ স্থান ঝালরের ন্যায় রূপ বিশিষ্ট

(গ) ডিম্বকোষদ্বয় (Ovaries)। জরায়ুর দুই পার্শে প্রশস্ত বন্ধনীদ্বয়ের পশ্চাৎ ভাঁজে দুইটী ডিম্বকোষ সংস্থাপিত। এই দুইটী দেখিতে ডিম্বের ন্যায় ও ঈষৎ পাটলবর্ণ। প্রত্যেক অণ্ডাধার প্রায় ২" দীর্ঘ ও ৩/৪ ইঞ্চি চওড়া ১/২ ইঞ্চি পুরু। ঋতুকালে ইহাদের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় ইহারা প্রায় দ্বিগুণ আকৃতি প্রাপ্ত হয়। ডিম্বকোষদ্বয়ের মধ্যেই স্ত্রীবীর্য্যাণু (Ovam) উৎপন্ন হইয়া থাকে। পুরুষের যেমন অণ্ডকোষ, তেমনি স্ত্রীলোকের এই ডিম্বকোষ একই বস্তু। ইহাদের অন্তর্ভাগও অসংখ্য কোটরবিশিষ্ট। যৌবন সময়ে এই সকল কোটরে স্ত্রীবীর্য্যাণু উৎপন্ন ও পরিপক্ক হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া উহা হইতে এক প্রকার রসও নির্গত হইয়া এই সকল Ova বা স্ত্রীবীর্য্যাণুর সহিত মিশ্রিত হয়। এই সকল ডিম্বাণু (Ova) পরিপক্ক হইলে ডিম্বকোষ ফাঁটিয়া যাইয়া কয়েকটী ডিম্বাণু উহা হইতে ছিটকাইয়া উঠে এবং ডিম্ববাহী নলীর সেই ঝালরবিশিষ্ট মুখে স্বতঃ আকৃষ্ট হইয়া উহাতে প্রবেশ করতঃ জরায়ু গহ্বরে নীত হয়। তখনই স্ত্রীলোকগণ ঋতুমতী (Menstruation) হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হওয়ার

পর প্রায় ১৬ দিন পর্য্যন্ত ঐ সকল পরিপক্ক ডিম্বাণু সজীব অবস্থায় বিরাজ করে। স্ত্রীবীর্য্যাণু গোলাকার আকৃতি বিশিষ্ট। ইহা অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দেখা যায় না।

ঐ সময় মধ্যে স্ত্রীলোক পুরুষ-সংসর্গা হইলে পুং-বীর্য্য জরায়ু মুখে প্রক্ষিপ্ত হয় এবং শুক্রকীট উহার ভিতরে প্রবেশ করে; অতঃপর জরায়ুর মুখে স্ত্রীবীর্য্যের সহিত মিলিত হইলেই তৎক্ষণাৎ উহা জরায়ু গহ্বরে চলিয়া আসে—সাধারণতঃ ইহাকেই গর্ভ হওয়া বলে। সুস্থ পুরুষ এক বারে যে বীর্য্য ত্যাগ করে তাহাতে ১০,০০০০ পর্য্যন্ত শুক্রকীট বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় এবং ইহার একটীমাত্র কীটাণু স্ত্রী-ডিম্বাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া সন্তান উৎপাদন করিতে সক্ষম।

তৃতীয়তঃ উপাঙ্গ বা স্তনদ্বয় ( Breasts )। যদিও স্তনযুগল জননেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত নহে তথাপি জননযন্ত্র সমূহের সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। স্তনদ্বয় অর্দ্ধ গোলাকার আকৃতি বিশিষ্ট এবং ঊর্দ্ধভাগে বর্ত্তুলাকার দুইটী পদার্থ বিদ্যমান—উহাকে চুঁচুক ( Nipple ) বা স্তনের বোঁটা বলা হয়। স্তনদ্বয় বক্ষের দুই পার্শ্বে সাধারণতঃ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ পঞ্জরাস্থি আবরণ করিয়াও উৎপন্ন হয়। এই কারণে স্ত্রীলোকের স্তনের আকার নানাপ্রকার হইয়া থাকে। ইহাদের অভ্যন্তর ভাগে অগণ্য দুগ্ধ নিঃসারক গ্রন্থি বিদ্যমান রহিয়াছে। যৌবনের প্রারম্ভে স্তনদ্বয় কঠিন ও ক্ষুদ্র থাকে ও চুঁচুকদ্বয় ক্ষুদ্র গাঢ়লাল রংযুক্ত দেখা যায় ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উহাদের আকৃতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গর্ভাবস্থায় উহা অতিশয় উন্নত ও স্থূল হয় এবং পরিমণ্ডলের (areola) আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। চলিত কথায় ইহাকে ভেলাপড়া বলে। প্রসবের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রসবান্তে প্রায় শতকরা ৯৬ ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের স্তনদ্বয় শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়া কাহারো অনধিক, কাহারো বা অল্প নত হইয়া পড়ে।

## প্রজনন রীতি ঃ

এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায় অন্তর্গত 'সৃষ্টিকার্য্যে নর ও নারী' অণুঅধ্যায়ে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া খানিক আগে স্ত্রী-জননেন্দ্রিয় পরিচয়ের মধ্যেও গর্ভপ্রকরণ সম্পর্কে কিছু বলা হইয়াছে। তথাপি এইখানে একটু বিষদভাবে এ বিষয়ে বলা প্রয়োজন।

পূর্ব্বোক্ত আলোচনাদি হইতে একথা বুঝা কঠিন হয় নাই যে, পুংবীর্য্যাণু স্ত্রী-অণ্ডাণুর সহিত মিলিত হইয়া গর্ভমধ্যে ভ্রূণের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু স্ত্রীসহবাস করিলে প্রতি সহবাসেই যে গর্ভ হয়, তাহা নহে। স্ত্রীসহবাস করিলেই পুরুষের রেতঃ স্খলিত হইয়া থাকে এবং ঐ বীর্য্যে অসংখ্য শুক্রকীটসকল বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়, কিন্তু নারীদের বেলায় সঙ্গম সময়ে অতি অল্পসংখ্যক অণ্ডাণুই নির্গত হইয়া থাকে—তাহাও মাসিক ঋতু প্রকাশ পাইবার অষ্টম হইতে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত সতেজ ও কার্য্যক্ষম থাকে। প্রতি মাসে ঋতুকালীন নারীগণের অণ্ডাণুকোষ (ovary) হইতে ৩।৪টীর অধিক অণ্ডাণু কখনও বাহির হয় না। সাধারণতঃ সম্ভোগ সময়ে রমণীগণের যোনিপ্রদেশে যে রস উত্থিত হয় তাহা রমণক্রিয়াকে সহজ করিয়া দিবার জন্য যোনিপ্রদেশ পিচ্ছিল করিয়া দেয় মাত্র। সঙ্গম সময় ব্যতিরেকেও সর্ব্বসময়েই অতি ক্ষীণভাবে রমণীগণের যোনিপ্রদেশে এই রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই রসের মধ্যে, সঙ্গম সময় ব্যতিরেকে যে রস নিঃসৃত হইতে থাকে তাহা যোনিপ্রদেশে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচ্ছন্ন গ্রন্থিনিচয় হইতেই নিঃসৃত হয়, কিন্তু সঙ্গমকালীন রতিক্রিয়ার চরম অবস্থায় আবার ঐসকল নিঃস্রাব ছাড়াও জরায়ুমুখ হইতে আর একপ্রকার ঘনতর রস নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই উভয়প্রকার রসই কিন্তু অণ্ডাণুশূন্য; কাজেই গর্ভসঞ্চারে ইহাদের কোনই সার্থকতা থাকিতে পারে না। অতএব

বিশেষ অনুকূল অবস্থা ব্যতিরেকে কখনও গর্ভ হওয়া সম্ভব হয় না।

সম্ভোগ সময়ে পুরুষের বীর্য্য স্খলিত হইয়া সবেগে নারীর যোনিপ্রদেশে পতিত হয়। খুব বেগে বীর্য্যপাত ঘটিলে উহা স্ত্রীযোনি অভ্যন্তরে জরায়ু গ্রীবায় গিয়া লাগে, তখন পুংবীর্য্যস্থ কীটাণু স্বকীয় চলৎশক্তি বলে তাড়িত হইয়া ক্রমে জরায়ুগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রী-অণ্ডাণুর সহিত মিলিত হইলেই গর্ভাধান হইতে পারে। ইহা ছাড়া কখনও কখনও রমণীগণের প্রবল কাম-উদ্দীপনার ফলে সঙ্গমকালীন তাহাদের জরায়ুমুখ বিশেষভাবে প্রসারিত হইয়া পড়ে, ফলে জরায়ুগ্রীবা পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগ আঁকড়াইয়া ধরে ও শুক্র স্খলিত হইয়া সরাসরি জরায়ুগহ্বরমুখে পতিত হয় এবং জরায়ুমধ্যে স্ত্রীবীজ বা অণ্ডাণু থাকিলে উহার সহিত মিলিত হইয়া অতি সহজেই গর্ভাধানসম্ভব ক্রিয়া সাধিত হয়। দ্বিতীয় প্রকার গর্ভপ্রকরণ ক্রিয়া অনেক সময় স্বামী, বিশেষ করিয়া স্ত্রী অনেক সময়ই বুঝিতে পারেন। কারণ এইপ্রকার জরায়ুগ্রীবা দ্বারা পুংজননেন্দ্রিয় আঁকড়ানো অবস্থায় সঙ্গমকালে পুরুষের সুখানুভূতি যেমন প্রবলতর হয়, তেমনি নারীর উত্তেজনাও চরম সুখাবহ হইয়া উঠে এবং ইহার ফল অনেক নারী সেই রাত্রিতেই বুঝিতে পারেন।

যে সকল পুরুষের উত্থিত পুরুষাঙ্গ পাঁচ ইঞ্চিরও অধিক দীর্ঘ হয় ও যাঁহাদের পত্নীগণ অধিক কামাতুরা, তাঁহারা সাধারণতঃ এইভাবে সরাসরি জরায়ুর মুখের ভিতরই বীর্য্যপাত করিয়া গর্ভাধান সম্পন্ন করেন। এই-প্রকার গর্ভাধানকে বিশেষ গর্ভাধান নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীতে অর্থাৎ জরায়ুগ্রীবায় শুক্র পতিত হইয়া শুক্রকীট যেরূপে জরায়ুগর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভাধান করিয়া থাকে উহাকে সামান্য গর্ভাধান বলে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি ডিম্বকোষস্থিত ডিম্বাণু ডিম্বকোষ ফাঁটিয়া ছিট্‌কাইয়া উপরে উঠে এবং ডিম্ববাহী নলের মুখে আকর্ষিত হইয়া উহাতে প্রবেশ করতঃ জরায়ুমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখানে পুংবীর্য্যাণুর মিলনাকাঙ্খায় অবস্থান করে। যদি উভয়ে সাক্ষাৎ ঘটে তবে ত কথাই নাই ; নচেৎ নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে জীবিত বা মৃতাবস্থায় উহারা শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। স্ত্রী-ডিম্বাণু কখন কখন জরায়ুর মুখের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত উঠিয়া আসে ও পুংবীর্য্যাণুর সহিত মিলিত-হইয়া পুনর্ব্বার জরায়ুগহ্বরে চলিয়া আসে এবং ইহাতেই গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। তেমনি সতেজ শুক্রকীটও গর্ভাশয়ে বা জরায়ুগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া যদি কোন স্ত্রীডিম্বের সাক্ষাৎ না পায়, তবে তাহারা জরায়ুর উর্দ্ধপ্রান্তে উঠিয়া ডিম্ববাহী নলীর মধ্যে প্রবেশ করে এবং যদি এখানে কোন জরায়ু-অভিগামী স্ত্রীডিম্বের সাক্ষাৎ পায় তবে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ উভয়ে মিলিত হয় ও এইখানেই গর্ভাধান কার্য্য সম্পন্ন হয় এবং যুক্তবীজ জরায়ুমধ্যে চলিয়া আসিয়া গর্ভসঞ্চারে রত হয়। ইহা ছাড়াও অর্থাৎ সতেজ পুংবীর্য্যাণু যদি ডিম্ববাহী নলীর মধ্যেও কোন স্ত্রীডিম্বের সাক্ষাৎ না পায়, তবে শুক্রকীট নলী দিয়া চলিতে চলিতে নলীপ্রান্তে ঝালরের ন্যায় রূপবিশিষ্ট মুখের কাছে অবস্থান করে এবং ডিম্বকোষের আচ্ছাদন ফাটিয়া স্ত্রীবীজ ছিট্‌কাইয়া উঠিবামাত্র পরস্পর আকর্ষিত হইয়া উভয়ে সম্মিলিত হয় ও সেইখানেই গর্ভাধানের সূত্রপাত হইয়া মিলিতবীজ ডিম্ববাহী নলের মধ্যে গড়াইয়া গড়াইয়া জরায়ুগর্ভে নীত হয় এবং সেইখানে ভ্রূণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে, তাহাদের দেহনিঃসৃত বীর্য্যাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যেও পরস্পর সেইরূপ চুম্বক-সংস্কারবশেই ইহারাও উভয়ে সম্মিলিত হইবার জন্য এইপ্রকার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়া থাকে।

পুংবীর্য্যাণু যদি ঝালরের স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট ডিম্ববাহী নলের মুখ সকাশেও স্ত্রীডিম্বের সাক্ষাৎ না পায়, তবে উহার সন্ধানে ঐস্থান অতিক্রম করিয়া কোষ্ঠধরা কলার মধ্যে দিয়া রাস্তা ধরিয়া উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হয় ও গতিশক্তি রহিত হইয়া মারা পরে। অবশ্যই ইহাতে শরীরের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

জননবিজ্ঞানবিদেরা বলেন: গর্ভাধানকালীন পুংবীর্য্যনিঃসৃত অসংখ্য পুংবীর্য্যাণু স্ত্রীডিম্বকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরে। ইহার ফলে অসহায় স্ত্রীডিম্ব গড়াইয়া গড়াইয়া পলাইতে চায়, কিন্তু শুক্রকীটের হাতে রেহাই পায় না এবং যে শুক্রকীটটি প্রথমেই স্ত্রীডিম্বের সন্নিধানে আসে, সে মস্তক দ্বারা উহার স্বচ্ছ সূক্ষ্ম আবরণীতে আঘাত করিয়া উহা ফাটাইয়া দেয় ও অণ্ডাণুগাত্রে যে সূক্ষ্ম ছিদ্রের সৃষ্ট হয় উহাতে মাথা গলাইবামাত্র কোষকেন্দ্রস্থ জননবিন্দুতে আটকাইয়া যায়—ইহাই গর্ভাধান। এ সম্পর্কে ডাঃ আর. টি. ট্রেল মহাশয়ের মত এই যে, এইরূপ পর পর কয়েকটী পুংবীর্য্যাণু অণ্ডদেহে অনুপ্রবিষ্ট হয় ও ইহাতেই গর্ভাধানক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

গর্ভাধান ও গর্ভসঞ্চার—এই দুইটীতে কিন্তু পার্থক্য আছে। গর্ভাধান সম্পন্ন হইলেই যে গর্ভ হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। গর্ভাধান কার্য্যটী স্ত্রী ও পুংবীর্য্যাণুর সম্মিলন এবং গর্ভসঞ্চার উহার পরবর্ত্তী অবস্থা অর্থাৎ সম্মিলিত বীর্য্যাণুর জরায়ুগহ্বরের ভিতরগাত্রে প্রোথিত হইয়া যাওয়া। কারণ এমনও দেখা যায় যে, মিলিত বীর্য্যাণুদ্বয় জরায়ুগহ্বর-গাত্রে সংলগ্ন বা প্রোথিত না হইয়া আলগা ভাবে অবস্থান করে, কিম্বা গাত্রভ্রষ্ট হইয়া জরায়ুর মুখের কাছেও চলিয়া আসে ও পরবর্ত্তী সঙ্গমসময়ে জরায়ুগ্রীবানিঃসৃত রস-সংযোগে শরীরের বাহিরে বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই গর্ভাধান সম্পন্ন হইলে সাধারণতঃ সম্মিলিত বীর্য্যাণুদ্বয় জরায়ু আভ্যন্তরিণ শ্লৈষ্মিকঝিল্লিময় পদার্থে সংশ্লিষ্ট হইয়া

জরায়ুগহ্বরগাত্র সংলগ্ন অবস্থায় কিছুদিন অবস্থান করে ; পরে দ্রুতগতিতে ক্রমেই শ্লৈষ্মিকঝিল্লি ঘন আবরণ বিস্তার করিয়া উহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া ফেলে। ইহাই হইল গর্ভসঞ্চারের প্রথমাবস্থা। সেই সময় হইতে যুক্ত অণ্ডাণুদ্বয় ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। দুই মাসের মধ্যেই পাণমুচী ও ফুল বিকশিত হয়। অর্দ্ধপরিমিত তরল প্রাণ-পঙ্কের মধ্যে নিহিত কোষাণু ক্রমশঃ একের পর এক বৃদ্ধি পাইতে থাকে .ও অসংখ্য কোষের সমষ্টি হইয়া উঠে। গর্ভসঞ্চারের পনেরো দিবসের মধ্যেই উহা কঠিনাকার প্রাপ্ত হইয়া 'একটী মটরাকার বিন্দুতে পরিণত হয়। তিন মাসের মধ্যেই একমুষ্টি পরিমাণ ভ্রূণদেহ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তারপর পুরা নয় মাস দশদিনে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তখন প্রসবকাল সমাগত হইলে পূর্ণাঙ্গ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে।

স্বামী সহবাসে রমণীগণের গর্ভ-সম্ভাবনা আশা করা যায় সাধারণতঃ রজঃপ্রকাশের চতুর্থ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ দিন মধ্যে এবং অতঃপর পরবর্ত্তী রজঃস্রাব আরম্ভের প্রায় চারিদিন পূর্ব্বেও। আর সাধারণতঃ ১৬ বছর বয়স হইতে ৬০।৬৫ বৎসর বয়স্ক পুরুষ সংযোগে ১৩ বৎসর হইতে ৪০।৪২ বৎসর বয়স্কা নারীর গর্ভ-উৎপাদন করা সম্ভব হইয়া থাকে। তবে এই সকলের ব্যতিক্রম কচ্চিৎ কখনও পরিদৃষ্ট হইতে দেখা যায়।

# পঞ্চম অধ্যায়

## জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও তাহার প্রক্রিয়া

একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা জীবনে কখনও সৎপরামর্শ দেয় না, সময় বুঝিয়া তাহারাই উপদেশ দিতে আসেন যে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পন্থা গ্রহণ করা পাপ, তাহার দ্বারা শরীর নষ্ট হয় ইত্যাদি নানাকথার সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু তলাইয়া দেখিতে গেলে তাহাদের কথায় যে সত্যতা বা যুক্তি নাই, তাহা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। যে সমস্ত লোক এ কথা বলিতে আসেন, তাহাদের মধ্যে এক হয় ভ্রান্ত আর না হয় তাহারা ভণ্ড।

আবার কুমতলবের বশবর্ত্তী হইয়া যাহারা ইহাকে সমর্থন করিতে আসেন, তাহাদেরও ক্ষমা করা যায় না। জন্ম-শাসনের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা কোথায় তাহাই আমাদের দেখিতে হইবে।

আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে খাদ্যাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অর্থাভাবে লোক যখন হাহাকার করিয়া মরিতেছে, সেই সময় অধিক সন্তান জন্ম দিয়া, দেশের মেরুদণ্ডকে আরও বলহীন, অসার ও দুর্ব্বল করা কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষার অভাব, অতিরিক্ত যৌনপ্রবণতা এবং যৌনক্ষুধা মিটাইবার স্বচ্ছন্দ অবকাশ না পাওয়াতে যে নর-নারীর জীবন, যৌবন ও স্বাস্থ্য চিরতরে নষ্ট হইয়া যায়, আজ একথা বিশেষভাবে প্রচার করিবার সময় আসিয়াছে; আর সেইসঙ্গে সমাজের কতকগুলি প্রাচীন ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন করা আশু প্রয়োজন এবং তার জন্য সমাজের প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিকেই সাহস সঞ্চয় করিতে হইবে।

এদেশের মেয়েরা যৌবন, লাবণ্য ও স্বাস্থ্যকে কি করিয়া নিটোল ও স্থায়ী রাখিতে হয়, কি করিয়া গর্ভ হয়, প্রসূতিকে কি কি নিয়ম পালন

করা উচিত, এবিষয়ে প্রকৃত কোন জ্ঞানই লাভ করে না। সেই কারণেই আজ দেশে অসংখ্য চিররুগ্ন, দুর্ব্বল ও বিকলাঙ্গ শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। তাই ভারতে ৪ মিনিট অন্তর ১টী করিয়া মৃতশিশু প্রসূত হয়।

ঐ সকল কারণ ব্যতীতও দেখা যায়, আমাদের মেয়েদিগকে সংসার সম্বন্ধে অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাও কোন স্কুল-কলেজে দেওয়া হয় না। পাশ্চাত্ত্যের কোন কোন দেশে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে যে সমস্ত ব্যাপার দেখা যায়, তাহা এত সুন্দর যে, সেই সব শিক্ষালাভ করিয়া যে কোন মেয়ে সংসারক্ষেত্রে প্রকৃত সুখের অধিকারিণী হইতে পারেন। স্কুল কলেজ হইতে মেয়েরা যৌন-বিজ্ঞান, শিশু-পালন, সৌন্দর্য্য-চর্চ্চা প্রভৃতি বিষয়েও শিক্ষা পান।

আমাদের দেশের অভিভাবকদের অনেকেরই এমন একটা কুৎসিত ধারণা আছে যে, মেয়েদের তথা উপযুক্ত বয়স্ক ছেলেদেরও যৌন-শিক্ষা দিলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে। ইহা যে নিতান্ত ভুল ধারণা, সে কথা বলাই বাহুল্য। কারণ প্রকৃত যৌন-জ্ঞান মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল না করিয়া সৌন্দর্য্যের উপাসক করিয়া তোলে—স্বাস্থ্যধর্ম্ম পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করে এবং পূর্ব্ব হইতেই তাহারা পাপপথে পা বাড়াইতে সাবধান হয়।

শিক্ষিতা অবিবাহিতা মেয়েদের তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স হইতেই যে যৌন-বিজ্ঞান ও বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিতে হইবে, সেকথা বিশেষভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রত্যেক স্কুল-কলেজে এ সম্বন্ধে যাহাতে শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক হিতকামী ব্যক্তিরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যতদিন পর্য্যন্ত সেই রকম কোন বন্দোবস্ত না হইতেছে, ততদিন প্রত্যেক শিক্ষিতা মেয়েরই উচিত যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক পাঠ করিয়া নিজেদের জ্ঞানলাভ করা—

যাহাতে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য বাজায় থাকে, বিবাহিত জীবনে যাহাতে শান্তি আসে, যাহাতে সুস্থ ও সবল সন্তান প্রসব করিয়া দেশের মুখোজ্জ্বল করা যায় এবং যাহাতে অধিক সন্তানের মাতা হইয়া অকালে জীবন বিসর্জ্জন দিতে না হয়। তারপর প্রত্যেক বিবাহিত নব-দম্পতির পক্ষে উচিত সন্তান পালন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কিংবা সন্তানের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত না করা পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে জন্ম-নিরোধ করা। আর পুরানো দম্পতিরও উচিত স্ত্রীর অস্বাস্থ্যকর অবস্থায়, অভাবের সংসারে কিংবা বহু রুগ্ন ও দুর্ব্বল সন্তানের জন্মদান আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রোধ করা। এই ব্যাপারে লজ্জা কিংবা ঘৃণার কিছুই নাই। তাহা ছাড়া একথা বোধহয় কেহই স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, বিবিধ রতিজরোগ সম্পন্ন, নানাবিধ কুৎসিৎ পীড়াক্রান্ত কিংবা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত, নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পীড়াগ্রস্ত, উন্মাদ অথবা রুগ্নাবস্থায় ও রোগভোগের অব্যবহিত পর পিতামাতার সন্তানের জন্ম দেওয়া কোনমতেই বাঞ্ছিত নহে। অধিক সন্তানের জন্ম হওয়া, অসমর্থা বা দুর্ব্বলা নারীর গর্ভ হওয়া, দুর্ব্বল বা রোগগ্রস্ত পিতার সন্তান জন্ম দেওয়া এবং অপ্রাপ্তবয়স্কা নারীর গর্ভ হওয়া যে নীতি বিগর্হিত কার্য্য, হইতে কোনই সন্দেহ নাই।

## জন্মশাসন কেন প্রয়োজন ঃ

"আজ জগতে অর্থনৈতিক সমস্যা যে ভীষণ দৈন্যমূর্ত্তি লইয়া প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে 'মানুষ' আর 'অমানুষ' যেই হো'ক তার আশার পথ রোধ করা ছাড়া উপায় নাই। অতীতে বিস্তৃত ক্ষেত্র ছিল, তাই লোকসংখ্যা বাড়াইয়া পৃথিবীকে জনপূর্ণ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া আজ সন্তানগণের আগমনের কারণটুকু অজানা দেবতার

স্কন্ধে চাঁপাইয়া ভূমিষ্ঠ শিশুর অভ্যর্থনা করেই শুধু বসিয়া থাকিলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে, অদূর ভবিষ্যতে এই পুত্র-কন্যাদের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে—অভাবের তীব্র হাহাকারের মধ্যে তাহাদিগকে আনার কোন অধিকার তাহাদের পিতা-মাতার আছে কিনা?"—শ্রীরমলা সরকার।

উপরে শিক্ষিতা ভদ্রমহিলা যে উক্তি করিয়াছেন, জগতে সেইটাই আজ সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; বিশেষ করিয়া আমাদের দেশ আজ এতদূর জনপূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে, সন্তান জননের এই প্রবল বন্যা রোধ না করিলে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা অদূর ভবিষ্যতে সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিতে পারে, প্রকৃতির সাথে মানুষ যুঝিয়া উঠিতে পারে কি করিয়া? আর বিবাহ করা যখন সাধারণ মানুষের জীবনে অপরিহার্য্য ব্যাপার এবং বিবাহ করিলে অধিকাংশ দম্পতিরই যখন সন্তান হওয়া একেবারেই স্বাভাবিক, এমতাবস্থায় সন্তানজন্ম নিবারণ করিতে হইলে লোকের বিবাহ করাই কি অনুচিত? কিন্তু তাহাও শতকরা ৯৭টি ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। ইহাতে সমাজে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া যৌন-ব্যভিচারে সারাদেশ ভরিয়া যাইবে। কাজে কাজেই আজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম-নিরোধ করা ছাড়া অন্য উপায় নাই।

জগতের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি আজ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপার সমর্থন করেন। ভারতের রাষ্ট্রগুরু মহাত্মা গান্ধীজীও তাঁহার 'ব্রহ্মচর্য্য' পুস্তকে লিখিয়াছেন,—"সন্তান জন্ম দেওয়া নিরন্ন ভারতের পক্ষে বর্ত্তমানে কোন প্রকারেই উচিত নহে।" কিন্তু সেকারণ তিনি বিজ্ঞানের আশ্রয় না লইয়া ব্রহ্মচর্য্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে বলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্যের আশ্রয় লওয়া যত সহজ মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে তাহা কিরূপ কঠিন

ব্যাপার, ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রেই তাহা জানেন। তাই তাঁহারা উপদেশ না দিয়া চুপ করিয়া থাকেন। আর ইহা শুধু কঠিন নহে, অনাবশ্যক। কারণ পরমার্থিক লাভের আশা না থাকিলে, সাংসারিক জীবনে যৌনাকাঙ্খার মত প্রবলশক্তিকে নিষ্পেষিত করিবার কোন উপযোগিতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং এই নিষ্পেষণের ফল যে কতদূর বিষময় হইতে পারে, আধুনিক মনোবিজ্ঞান তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছে। আজ কে না জানেন, অধিকাংশ মানসিক রোগ ও বিকারের মূলে এই যৌনপ্রবৃত্তির অচরিতার্থতা—বিশেষ করিয়া বিবাহিত জীবনে সংযমের প্রয়াস—হাস্যকর; যেখানে বৎসরের মধ্যে একটীমাত্র দিনের অসংযমেও একটী শিশু সংসারে সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারে। কাজেই পারিবারিক, অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব বজায় রাখিতে হইলে, বিজ্ঞানসম্মত মতে সন্তান-নিবারণ করা ছাড়া আর কোন উপায় আছে কি? এবং ইহাতে অপরাধই বা কোথায়?

সভ্য জগতের সর্ব্বত্র আজ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিয়াছে কিন্তু তার জন্য তাঁহারা চুপ করিয়া বসিয়া রহেন নাই। কারণ দেশের জনসংখ্যা অপরিমিত বর্দ্ধিত হইলেই দেশের লোক দুর্ব্বল, শক্তিহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়িবে। সেই কারণে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে জন্ম সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য হাজারো প্রকার বৈজ্ঞানিক কৌশল, ঔষধপত্র ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং ঐ সকলের দ্বারা তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন। যে যাহার ইচ্ছানুযায়ী অর্থাৎ যে কয়টী সন্তান প্রতিপালন করিতে সক্ষম, অথবা সন্তান প্রতিপালন করিতে একেবারেই অক্ষম, ঠিক সেই হিসাবে সন্তানের জন্ম দেন অথবা দেন না। যদিচ সেই সকল দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা আমাদের দেশের মত প্রবলভাবে দেখা দেয় নাই এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতে যদিচ

প্রবেশ করিলে ক্ষত উৎপন্ন করিতে পারে। সুতরাং ডুশ ক্যানটি দুই ফিটের উর্দ্ধে স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে।

(গ) মনে রাখিতে হইবে, ডুশের সলিউশনটী যেন ঈষদুষ্ণ অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। গর্ভনিরোধের জন্য শুধু ডুশ ব্যবহারের কোনও সার্থকতা নাই। রবার পেশারী, স্পঞ্জ কিম্বা প্লাগ সহযোগে যদি ডুশ ব্যবহার করা যায় তাহা হইলেই কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

**ডুশরূপে ব্যবহার্য্য গর্ভরোধক ঔষধ সমূহ** (Contraceptive medicines used in Douch) ঃ—গর্ভোৎপত্তি নিবারণার্থ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ঔষধগুলি ডুশরূপে প্রযুক্ত হয় ; যথা ঃ—

(১) **সাধারণ জল** ঃ—শুক্রকীট জলের সংস্পর্শে আসিলে অসার হইয়া যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। সুতরাং গর্ভরোধার্থ সাধারণ জলের ডুশ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে।

(২) **নিমপাতার ক্বাথ** ঃ—নিম্ব পত্রের মধ্যে তিক্তাস্বাদযুক্ত যে ঔষধীয় বীর্য্য আছে তদ্দ্বারা শুক্রকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই নিম্বপত্রের ক্বাথ গর্ভরোধার্থ ডুশরূপে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **লেবুর রস** ঃ—লেবুর রসে ৫ পার্সেণ্ট নাইট্রিক এসিড থাকে। শুক্রকীট (spermatozoa) ধ্বংস করিতে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। ডুশ দেওয়ার জন্য ১ কোয়ার্ট বোতলে ১ আউন্স পরিমাণ লেবুর রসই যথেষ্ট। লেবুর রস গণোরিয়ার বীজাণুও ধ্বংস করিয়া থাকে। ইহা সহজ লভ্য এবং ইহার ব্যবহার প্রণালীও সহজ।

(৪) **ভিনিগার (শির্কা)** ঃ—ইহাতে ৫ পার্সেণ্ট এসেটিক এসিড আছে, ১ আউন্স জলের সহিত ইহার ১ ড্রাম পরিমাণ মিশ্রিত করিলে শুক্রকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে, ইহাও সহজলভ্য এবং সুলভ।

(৫) **সাধারণ লবণ** :—১ পাইণ্ট পরিমিত জলের সহিত মাত্র এক চামচ লবণ মিশ্রিত করিয়া ডুশ দিলে যাবতীয় শুক্রকীট বিনষ্ট হইয়া থাকে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা সহজ লভ্য। প্রতি গৃহেই ইহা পাওয়া যায়, ইহা অতিশয় কার্য্যকরী। ইহা ব্যবহারে কোনও অনিষ্ট হয় না। মূল্যও খুব কম।

(৬) **ফিট্‌কিরি** (Alum) :—ইহাও প্রায় সব দোকানেই পাওয়া যায়। শুক্রকীট বিনষ্ট করিতে ইহা একটা উৎকৃষ্ট ঔষধ। ২ পাইণ্ট জলের সহিত ১ ড্রাম পরিমিত ফিট্‌কিরি মিশ্রিত করিয়া ডুশ দেওয়া আবশ্যক। ফিট্‌কিরির আর একটী বিশেষ গুণ এই যে, ইহা শিথিলীকৃত স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রাচীর সঙ্কুচিত করিয়া থাকে।

(৭) **বোরিক এসিড** (Boric Acid) :—গর্ভ নিরোধের জন্য ইহা তত কার্য্যকরী নহে ; কারণ, যে পরিমাণ বোরিক এসিড যে পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে উহার শুক্রকীট ধ্বংস করিবার সামর্থ্য হয় ঐ পরিমাণ বোরিক এসিড ঐ পরিমিত জলে দ্রব করা যায় না।

(৮) **ল্যাক্টিক এসিড** (Lactic Acid) :—অনেকেই ল্যাক্টিক এসিড ব্যবহারের পক্ষপাতী। কারণ স্ত্রীযোনি গহ্বরে সাধারণতঃ ল্যাক্টিক এসিডই বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু ইহার কার্য্যকরী শক্তি মৃদু ; সুতরাং ব্যবহার না করাই ভাল। বিশেষতঃ শুক্রকীট ধ্বংস করিতে ২ পার্সেণ্ট ল্যাক্টিক এসিড ব্যবহারের প্রয়োজন হয় কিন্তু ঐ পরিমাণ ল্যাক্টিক এসিড প্রয়োগে স্ত্রীযোনি গহ্বরে প্রদাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

(৯) **সাবান** (Soaps) :—সাবান জল গর্ভ নিরোধের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। সাধারণতঃ সাবান জলে স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের প্রদাহ ও টাটানি উপস্থিত হয়, কিন্তু নারিকেলের তেলের সাবান জলে (cocoanut oil soaps) ডুশ দিলে কোনও প্রদাহ উপস্থিত হয় না।

(১০) **কুইনাইন** (Quinine) :—গর্ভরোধার্থ কুইনাইন বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এতদর্থে কুইনিন সল্টের ১ পার্সেণ্ট সলিউশন (1% Solution of Soluble Quinine Salt) ডুশরূপে ব্যবহার শুক্রকীট ধ্বংস করিবার পথে যথেষ্ট। কুইনাইন সাল্‌ফ্‌ জলে দ্রব হয় না। কুইনাইন বাই সালফ্‌, বাই হাইড্রোক্লোর অথবা কুইনাইন ইউরিয়া হাইড্রোক্লোর সহজে জলে দ্রব হইয়া থাকে। সুতরাং ডুশরূপে ইহাদের সলিউশন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গর্ভনিরোধার্থ দৈনিক কুইনাইন ব্যবহার করিলে খরচ খুব বেশী পড়ে। বিশেষতঃ কুইনাইন স্ত্রীযোনি প্রাচীরের মধ্যে শোষিত হইয়া বিষক্রিয়ার লক্ষণ উৎপন্ন করে বলিয়া অনেকে অভিমত প্রকাশ করেন।

(১১) **লাইসোল** (Lysol) :—শুক্রকীট বিনষ্ট করিতে লাইসোলের ১—১০০ শক্তির সলিউশন বিশেষ কার্য্যকরী। অধিক শক্তির সলিউশন প্রয়োগ বিপজ্জনক।

(১২) **পারক্লোরাইড অব মার্কারী** (হাইড্রার্জ্জন পার ক্লোরাইড্‌—Perchloride of Mercury) :—ইহাও একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ ইহা পচন নিবারক ও উপদংশের বীজাণুনাশক। কিন্তু সামান্য শক্তিতে ইহা প্রয়োগ করিলেও স্ত্রীজননেন্দ্রিয়ের উত্তেজনা উপস্থিত হয়।

(১৩) **পটাশ পার্ম্মাঙ্গানেট্‌** (Potas Permanangate) :—ইহাও একটী উত্তম শুক্রকীট ধ্বংসকারক ঔষধ; শতকরা ২০ ভাগের ১ ভাগ সলিউশন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যৌনব্যাধিরও ইহা একটী কার্য্যকরী ঔষধ।

গর্ভরোধার্থ কতকগুলি ঔষধ জেলি আকারে ব্যবহৃত হয়।

(১৪) জেলি (Jellies) ঃ—জেলি খুব শক্তও নহে, নরমও নহে। ইহা গ্লিসারিন, গঁদ, পাতলা গুড় ইত্যাদি কয়েকটী অনুপানের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। গর্ভনিরোধের নানাপ্রকার জেলি বাজারে পাওয়া যায়। ইহা নমনীয় (Collapsible) টীউবের টুথ পেষ্টের ন্যায় স্ক্রুক্যাপ সংযুক্ত অবস্থায় থাকে। কোনও কোনও টীউবে ভ্যাজাইন্যাল নোজেল পর্য্যন্তও সংযুক্ত থাকে। কিন্তু মূল্যাধিক্যবশতঃ সাধারণ লোকের অনেকেই ইহা ক্রয় করিতে পারেন না। ইহা ক্রয় করিবার সময় কি প্রকার জেলি ক্রয় করিতে হইবে, বিশেষ সতর্কতা সহকারে উহা নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। এরূপ জেলি ক্রয় করিতে হইবে, ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গেই যাহাতে জেলি সংমিশ্রিত রাসায়নিক ঔষধটী অতি সত্বর দ্রবীভূত ও বিস্তৃত হইয়া শুক্রকীটগুলি বিনষ্ট করিতে পারে।

(১৫) টেবলেট্ ঃ- টেবলেট আকারে প্রস্তুত অনেক রকম দেশী ও বিলাতী ঔষধ বাজারে পাওয়া যায়। এই সব টেবলেট স্ত্রীঅঙ্গের অন্তর্দ্দেশে সঙ্গমের ২।৩ মিনিট পূর্ব্বে অঙ্গুলী সাহায্যে ঢুকাইয়া দিতে হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা স্ত্রীঅঙ্গের ভিতরে গলিয়া যাইয়া এক প্রকার ফেনার সৃষ্টি হয়। অতঃপর সঙ্গমে বীর্য্যস্খলনে শুক্রকীটগুলি ঐ ঔষধের সংস্পর্শে নির্জীব হইয়া পড়ে। বিবিধ কুইনাইন পেশারীগুলির মধ্যে 'রেণ্ডল' ও 'ডকার পেশারী' সমধিক উল্লেখযোগ্য ও অপকারিতা বিহীন। নিম্নে উহার প্রস্তুত প্রণালী দেওয়া যাইতেছে ঃ—

| | | |
|---|---|---|
| কুইনাইন সালফেট্ | ... | ১ ড্রাম। |
| কোকোবাটার | ... | ১ আউন্স। |

কোকোবাটার গলাইয়া তাহাতে কুইনাইন সালফেট দিয়া খুব ঘাঁটাইতে হইবে। তৎপর দশটী সমানাকৃতি চৌকোণ বটিকায় রূপ দিবেন।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## যৌনব্যাধি ও তাহার প্রতিকার

### শুক্রপীড়া ঃ

চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ শুক্রপীড়া বলিতে শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটোরিয়া-কেই সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। কামের উদ্দীপন বা লিঙ্গের সমুত্থান না হইয়াই যে ক্ষেত্রে শুক্রস্খলন হয়, তাহাকেই শুক্রমেহ বা স্পার্ম্মাটোরিয়া রোগ বলা হয়। এই পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিগণের মূত্রের সহিতও অযথা শুক্র নির্গত হইয়া থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, অবিবাহিত যুবকের দলই এ পীড়ায় আক্রান্ত হয় বেশী।

(ক) হস্তমৈথুন ( মাষ্টার্বেশন্ )। (খ) স্বপ্নদোষ ( নাইট পলিউসন্ অথবা নক্ট্যারন্থাল এমিসন্ )। (গ) প্রিয়েপিজম্ ( লিঙ্গের অযথা দীর্ঘস্থায়ী উত্থান )। (ঘ) পুরুষত্বহানি ( ষ্টেরিলিটী ইন্ দি মেল )। (ঙ) সঙ্গমে বিতৃষ্ণা। (চ) প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা কামোন্মাদ ( সেটাইরিয়েসিস্ বা নিম্ফোম্যানিয়া )। (ছ) ধাতুদৌর্ব্বল্য ( নারভাস্ ডেবিলিটী )। (জ) ধ্বজভঙ্গ ( ইম্পোটেন্সি )।

এই সকল পীড়া মূলতঃ সেই শুক্রমেহ পীড়ারই অন্তর্গত। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, অত্যধিক স্ত্রী-সহবাস, স্ত্রীদিগের মনোরঞ্জনার্থ নানাপ্রকার বাজে বীর্য্যস্তম্ভ ও তেজস্কর ঔষধ সেবন করতঃ নিয়মিত সময়ে শুক্রস্খলনের গতিরোধ করা ; স্বভাবিক সময় হইতে অধিককাল সহবাস করা এবং হস্তমৈথুন প্রভৃতি নানাভাবে অপরিমিত শুক্রক্ষয় হেতুই মূলতঃ এই পীড়া দেখা দিয়া থাকে।

## শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য ঃ

**পীড়া উৎপত্তির কারণ ঃ**—শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য (Spermatorrhea & Nervous Debility), উভয় পীড়া উৎপত্তির কারণ প্রায় একই রূপ। আর শুক্রমেহ রোগের সঙ্গেই ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ উপসর্গরূপে দেখা দিয়া থাকে। আবার পক্ষান্তরে ধাতুদৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইলেও শুক্রমেহ রোগের উৎপত্তি হয়। দুইটীতে প্রায় অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে অনেকেই ইহাকে পৃথক পৃথক পীড়া বলিয়া থাকেন। আবার অনেকে ধাতুদৌর্ব্বল্য পীড়াকে স্বতন্ত্র একটী রোগ বলিয়াও ধরিয়া লন না। কারণ তাঁহারা বলেন—ইহা বিবিধ পীড়ার আনুসঙ্গিক একটী উপসর্গ বা একটী সাধারণ লক্ষণ মাত্র। যাহাই হউক এই উভয়বিধ পীড়ার উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিলে দেখা যায় :—সাধারণতঃ হস্তমৈথুন, পুংমৈথুন, উপযুক্ত বা অপ্রাপ্ত বয়সে অস্বাভাবিকরূপে শুক্রক্ষয়, অধিকরূপে শুক্রক্ষয়, অসময়ে বা অপরিণত বয়সে কিংবা পরিণত বয়সেও অত্যধিক ইন্দ্রিয় সেবা, স্বপ্নবিকার, প্রমেহ, উপদংশ, বহুকাল বা পুনঃ পুনঃ রোগভোগ, সংযম শক্তির অভাব, কুলটা বা বারনারীতে আসক্তি, অযোগ্য বিবাহ, বহুবিবাহ, কিংবা বহুনারী গমন, স্নায়ুমণ্ডলীর পীড়া, সংসর্গপ্রবৃত্তির প্রাবল্য, সর্ব্বদা কামোদ্দীপক বিষয়াদির আলোচনা ও আদিরস প্রধান নাটক-নভেল পাঠ এবং রঙ্গালয়ে, বায়স্কোপে নানা প্রেমের দৃশ্য দর্শনজনিত ইন্দ্রিয়োত্তেজনা প্রভৃতি কারণে উক্ত পীড়া উপস্থিত লইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, হৃদ্‌পিণ্ড, ফুস্‌ফুস, যকৃত, পাকস্থলী প্রভৃতি বিবিধ যান্ত্রিক পীড়া, রক্তহীনতা, সর্ব্বদা ঘোটকারোহন এবং অর্শ, ক্রিমি, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কারণেও শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অযথা শুক্রক্ষয়ই এই পীড়ার প্রধান কারণ।

**শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য পীড়ার লক্ষণ—**

প্রথমাবস্থায় :—মানসিক নিস্তেজকতা; নিরুৎসাহ; লাজুকতা; কাজে একাগ্রতা ও দৃঢ়তাহীন; নির্জ্জনপ্রিয়তা; মনোমধ্যে ভয়; অপরের প্রতি অবিশ্বাস ও ভয়; অমূলক চিন্তা; বুদ্ধি বিবেচনা ও স্মরণ-শক্তির হ্রাস; মেজাজ খিট্‌খিটে; কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা, পাঠে অমনোযোগিতা ও উদ্যমরহিত প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। কাহারো কাহারো ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রবল হয়। এই সকল লক্ষণ ব্যতীত শিরঃপীড়া, চক্ষের নীচে কালিমা ইত্যাদি প্রকাশ পায়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবার পরও যদি অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত না হওয়া যায় এবং যথোপযুক্ত চিকিৎসার দ্বারা দুর্ব্বল স্নায়ুবিধানের সবলতা সাধন করা না হয়, তাহা হইলে ক্রমশঃ ঐ সকল লক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়া তৎসহ নানাবিধ যন্ত্রের বিকৃতি, যথা :—অণ্ডদ্বয় (testes), শুক্রস্খলনকারী স্নায়ু (visicula seminalis), শুক্রপ্রক্ষেপক নালী (spermatic cord) এবং শুক্রদ্বার (prostate) প্রভৃতির দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইয়া উহার ক্রিয়াবিকৃতি সংঘটিত হয়।

**ভাবীফল ও উপসর্গ পীড়া :**—অজীর্ণ, অম্লপীড়া, মস্তিষ্কের বিবিধ অসুখ, স্মরণশক্তির হ্রাস, মাথাধরা, মাথা শূন্য বোধ হওয়া, মাথাঘোরা, সার্ব্বাঙ্গিক দৌর্ব্বল্য, প্রস্রাবের দোষ, ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ; হাত-পা-মুখ জ্বালা করা; বৈকালে জ্বর জ্বর বোধ; শরীর শ্রীহীন; রক্তদুষ্টি, বিবিধ চর্ম্মরোগ;—খোঁস, পাঁচড়া, চুলকানি; রক্তহীনতা; দেহের কৃশতা, শীর্ণতা; পাকস্থলী, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস্, যকৃৎ, মূত্রযন্ত্র প্রভৃতির পীড়া হইয়া থাকে।

**চিকিৎসা বা প্রতিকারের উপায়—**

শুক্রপীড়া বা ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে শুক্ররক্ষাই প্রধান চিকিৎসা। আমাদের এ দেহ সাতটী উপাদানে গঠিত। যথা—রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। অতএব ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগ উপস্থিত হইলে শরীরের

এই সাতটী উপাদানেই বৈকল্য ঘটে। কারণ চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন—"শুক্রই মানব-শরীরের শ্রেষ্ঠ উপাদান এবং দেহের ভিত্তি স্বরূপ"। রক্তের চরম সারভাগই শুক্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। কাজে কাজেই উক্ত পীড়া উপস্থিত হইলে আর যাহাতে অযথা শুক্রধাতুর অপব্যয় না হয় অগ্রে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে। যথা :—

( ১ ) চা, কফি, মদ্যাদি উত্তেজক পানীয় পান পরিত্যাগ।

( ২ ) দিবানিদ্রা, নরম বিছানা ও রোগারোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত মৈথুন নিষেধ।

( ৩ ) প্রত্যহ প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গ, নিয়মিত আহার, রাত্রে অন্ততঃ শুইবার ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে আহার করিতে হইবে। শুইবার পূর্ব্বে মূত্রত্যাগ বিশেষভাবে উচিত। সহ্যমত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিতে হইবে। ডুব দিয়া স্নান সব চেয়ে ভাল।

( ৪ ) খাদ্যাদি সহ্যমত সবই খাওয়া উচিত এবং খাদ্য যাহাতে পুষ্টিকর হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যে সকল খাদ্যে কোষ্ঠবদ্ধতা হয় এইরূপ খাদ্য না খাওয়াই উচিত। রাত্রের খাদ্য লঘু হওয়াই বাঞ্ছনীয়। পিয়াজ খাওয়া নিষিদ্ধ। ডিম অর্দ্ধসিদ্ধ করিয়া. ( মুরগীর ডিম ) খাওয়া যাইতে পারে—অবশ্য যদি সহ্য হয়।

( ৫ ) স্বপ্নদোষ, শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগীর ব্যায়াম করা বিশেষ আবশ্যক। উন্মুক্ত স্থানে ধীরে ধীরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত অঙ্গাদি চালনা করিতে হইবে। গভীরভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস লইলে নাড়ীমণ্ডলী সবল ও সুস্থ হয় এবং উহার দরুণ শুক্রাধারের উত্তেজনা বা শিথিলতা কমিয়া যায়। শুইয়া শুইয়া পেটের পেশীর ক্রিয়া যাহাতে হয়, এইরূপ ব্যায়ামাদির সহিত গভীরভাবে শ্বাস গ্রহণ

করিলে যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় এবং ইহাতে কোষ্ঠকাঠিন্যও দূর হইয়া থাকে।

(৬) শুক্রপীড়াক্রান্ত ব্যক্তির আহারে ও বিহারে মিতাচারী হওয়া প্রয়োজন। মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সৎ-আলোচনা, সৎ-গ্রন্থ পাঠ, সৎ-চিন্তা ও সৎ-সঙ্গ আবশ্যক।

(৭) উপযুক্ত ব্যায়ামাদির প্রয়োজন সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু অতিরিক্ত ব্যায়াম কিংবা অতিরিক্ত পরিশ্রম—বিশেষভাবে মানসিক পরিশ্রম এই সময় পরিত্যাগ করিতে হইবে।

(৮) উপযুক্ত পথ্য, নিয়মাদি পালনের সহিত উপযুক্ত ঔষধ সেবনে অকালবার্দ্ধক্যগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সত্বরই রোগমুক্ত হইয়া সুস্থ ও সবল হইতে পারেন।

**হোমিওপ্যাথিক ঔষধীয় চিকিৎসা—**

**কাল্কেরিয়া কার্ব্ব**—প্রবল মৈথুন ইচ্ছা, কিন্তু লিঙ্গোদ্রেক না হইয়াই অতি শীঘ্র শুক্রপাত, সর্ব্ব শরীরে বেদনা, দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণে কাল্কেরিয়া কার্ব্ব—৩x ভাল ঔষধ।

**এ্যাগ্নাস্ ক্যাক্টাস্**—শুক্রমেহ, মানসিক অবসন্নতা, ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব, সদা অন্যমনস্কভাব, বৃদ্ধকালে অধিক মাত্রায় ইন্দ্রিয় চালনা ও জননেন্দ্রিয়ের অতিশয় দুর্ব্বলতা, কামপ্রবৃত্তি প্রবল, কিন্তু সামর্থ্য নাই। এই সকল লক্ষণে এ্যাগ্নাস্—৩x, ৬x অথবা $\phi$ মূল আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সেব্য।

**নাক্স্ ভমিকা**—অল্পেই কামাভাব, অতি সত্বর রেতঃপাত, কুৎসিৎ স্বপ্নাদি দেখা, স্বপ্নদোষ, রাত্রিকালে মেরুদণ্ডে বেদনা, কোমরে বেদনা, ভ্রমণে কষ্ট, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে অযথা লিঙ্গোদ্রেক, উত্তেজক দ্রব্য সেবনে স্বপ্নদোষ; এই সব

লক্ষণে নাক্স-ভমিকা—৩x, ৩০ বিশেষ উপযোগী। সুরাপানের দরুণ শুক্রক্ষরণ হইলে নাক্স-ভমিকা—ϕ মূল আরক ব্যবহার্য্য।

**জেলসিমিয়াম**—হস্তমৈথুনের পরিণাম ফলে অনিচ্ছায় শুক্রক্ষয়, জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, উত্তেজনা ছাড়াও শুক্রস্খলন, মূত্রনলী পথে টন্‌টনানি, তরুণ গণোরিয়া বা গণোরিয়ার প্রথমাবস্থা, সুতার ন্যায় স্রাব, সামান্য সামান্য বেদনা, সঙ্গমশক্তি হ্রাস প্রভৃতি লক্ষণে জেলসিমিয়াম—৩x বিশেষ উপযোগী।

**থুজা**—অতিরিক্ত শুক্রক্ষরণের দরুণ অথবা গণোরিয়া জনিত উপসর্গ পীড়ায় থুজা ϕ মূল আরক প্রতি ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ সেবনীয়।

**ক্যালাডিয়াম**—অধিক মাত্রায় ইন্দ্রিয় পরিচালনার ফলে উত্তেজনা ব্যতীত রেতঃপাত, পুরুষাঙ্গ কোমল, দুর্ব্বল ও শিথিল লক্ষণে ক্যালাডিয়াম ৩x, ৬ উপযোগী।

**এ্যাসিড্ পিক্রিক**—পুনঃপুনঃ ও অত্যধিক মাত্রায় লিঙ্গোত্থান, অতিশয় উদ্দীপনা, স্বপ্ন ছাড়াও রাত্রিতে অধিক পরিমাণে রেতঃপাত, দুর্ব্বলতা, পদদ্বয় ভারী ভারী বোধ প্রভৃতি লক্ষণে এ্যাসিড্ পিক্রিক্ ৬x—৩০ অতিশয় কার্য্যকরী।

**সেলেনিয়াম**—নিদ্রায়, জাগরণে, হাটিলে, মলত্যাগ কালে, সাইকেলে চড়িলে আপনা হইতে শুক্রপাত হয়, শুক্র অতিশয় পাতলা, মানসিক অবসাদ, নিদ্রাকালে অসাড়ে শুক্রক্ষরণ, প্রাতে শয্যাত্যাগকালে শিরঃঘূর্ণন, মেরুদণ্ডের পক্ষাঘাতিক দৌর্ব্বল্য, রমণেচ্ছা প্রবল থাকিলেও সঙ্গমে অসমর্থতা প্রভৃতি লক্ষণে সেলেনিয়াম ৬x—৩০ অব্যর্থ মহৌষধ।

**নুফার**—স্বপ্নদোষসহ দুর্ব্বলতায়, শুক্র পাতলা হওয়ায় নুফার ϕ মূল আরক প্রত্যহ ৫ ফোঁটা মাত্রায় সেব্য।

**লাইকোপডিয়াম**—জননেন্দ্রিয়ের শিথিলতা, জননাঙ্গ শীতল, উত্তেজনার অভাব, বৃদ্ধদের শুক্রমেহের সঙ্গে পরিপাকের গোলযোগ, লিঙ্গোদ্রেক ব্যতিরেকে শুক্রপাত, সময় সময় পুরুষাঙ্গ শত চেষ্টাতেও উত্তেজনা প্রাপ্ত হয় না, ধ্বজভঙ্গ; হস্তমৈথুনের কুফল জনিত লক্ষণে লাইকোপডিয়াম ৩০—২০০ অতিশয় ফলপ্রদ।

**ফস্ফোরাস**—রেতঃস্খলন ও ইন্দ্রিয়ের নিস্তেজভাব দূর করিয়া ইন্দ্রিয় সবল করিতে ফস্ফোরাস অতীব আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। রতিশক্তির অল্পতা, দ্রুত রেতঃপাত, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, মস্তিষ্ক শূন্য বোধ হওয়া, মাথাঘোরা, মানসিক চিন্তা, হস্তমৈথুন দোষে লিঙ্গ উত্তেজিত না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিলে ফস্ফোরাস ৬x—৩০ অব্যর্থ।

**এসিড ফস্ফোরিক্**—স্মৃতিশক্তির অল্পতা, চিত্তের বিষণ্ণ ভাব, অতিরিক্ত সহবাস বা হস্তমৈথুনে জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইলে; স্বপ্নদোষ, সত্বর বীর্য্যপাত, অণ্ডকোষে বেদনা (আকর্ষণবৎ), মলত্যাগ কালে শুক্রস্খলন (এ লক্ষণ সেলিনিয়ামেও আছে), পদদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশে দুর্ব্বলতা এসব লক্ষণে এসিড ফস্ ৩x—৩০ অমোঘ ঔষধ।

**ডিজিট্যালিন্**—অতিশয় দুর্ব্বলতা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা প্রভৃতিতে ডিজিট্যালিন্ ৩x।

**সিনা**—ক্রিমিজনিত দোষের শুক্রক্ষয়ে সিনা ৩x—৩০,২০০ অব্যর্থ।

**সালফার**—চিত্তোন্মত্ততা, পৃষ্ঠ বেদনা, দুর্ব্বলতা, রাত্রিতে দ্রুত শুক্রপাত, শুক্র জলের ন্যায় পাতলা, ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল প্রভৃতিতে সালফার ৬x—১২x ভাল।

**জিঙ্কাম**—চক্ষুর চারিদিকে নীল রেখা, অণ্ডকোষ ঝুলিয়া পড়া, চিত্তোন্মাদ, অনেকদিনের অপব্যবহারের দরুণ শুক্রতারল্য দোষ লক্ষণে জিঙ্কাম—৬x উপযোগী।

## পানিমৈথুন বা মাষ্টার্বেশন ঃ

হস্ত দ্বারা রতিক্রিয়া সাধিত করাকেই পানিমৈথুন বা হ্যাণ্ডপলিউসন্ বলা হয়। কিন্তু ইংরাজী মাষ্টার্বেশন শব্দের অর্থ একটু অন্যরূপ অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের মিলন ছাড়া অস্বাভাবিক উপায়ে রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার নামই মাষ্টার্বেশন। সাধারণতঃ বালক-বালিকাগণই এই পীড়ায় অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে। এই কু-অভ্যাসটিতে একবার আসক্ত হইলে অতি সহজে তাহা পরিত্যাগ করাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। অনেকে বিবাহের পরও এ দোষ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নাই।

সুবিখ্যাত যৌনতত্ত্ববিদ্ ডাঃ আর. টি. ট্রেল বলেন—পানিমৈথুন বা মাষ্টার্বেশন রোগগ্রস্ত রোগীদিগকে এই কয়টি লক্ষণাদি দ্বারা চিনিতে পারা যায় ঃ—যাহারা অস্বাভাবিক ভাবে যৌন চরিতার্থতায় রত হয়, তাহাদের চক্ষুতারা হয় প্রসারিত; দৃষ্টিশক্তি দুর্ব্বল, শরীরে জীর্ণ জ্বর, শিরঃপীড়া, ক্ষুধাভাব, কোষ্ঠ-কাঠিন্য প্রভৃতি লাগিয়াই আছে; তাহা ছাড়া নিদ্রাভঙ্গে হস্তে পদে কম্প, অতিশয় আলস্য বোধ, স্মরণশক্তি রহিত ও কোন কোন ক্ষেত্রে উন্মত্ততা প্রভৃতি লক্ষণও দেখা দিয়া থাকে। বালিকাগণও এইরূপ ক্রিয়াসক্ত হইলে তাহারা লোকসমাজে বাহির হয় না—কুণো স্বভাবের হয়। শরীর কৃশ, মুখ মলিন, চক্ষু কোটরাগত, চক্ষের নীচে কালিমা, তাহা ছাড়া শরীর লাবণ্যহীন ও মেজাজ রুক্ষ হইয়া থাকে। তাহাদের নাড়ী ও হৃদপিণ্ড ধীরগতি হয়।

### হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

পানিমৈথুনের দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছা দমনার্থ পুরুষের পক্ষে **ক্যান্থেরিস্**—৬x, **বিউফোর‍্যানা**—৬x এবং রমনীর পক্ষে **প্ল্যাটিনা**—৬x সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা ছাড়া **ওরিগেনাম মেজেরেনা**—৩ শক্তি আহারের ক্ষণিক

পূর্ব্বে প্রত্যহ দুইবার; **অষ্টিলেগো**—৩ প্রত্যহ দুইবার, **বেলিস্-পেরেনিস্**—৩x প্রত্যহ চারিবার সেবনে ( নারী পুরুষ উভয় পক্ষেই পানিমৈথুনের কু-অভ্যাস নিবারিত হইয়া থাকে।

**এ্যাসিড্ ফস্ফোরাস্**—হস্তমৈথুন জনিত দুর্ব্বলতা, শিরোঘুর্ণন, স্মরণ-শক্তি ও দৃষ্টিশক্তির হ্রাস, পুনঃ পুনঃ জলের ন্যায় মূত্রত্যাগ প্রভৃতি দেখা দিলে এ্যাসিড্-ফস—৩ বিশেষ কার্য্যকরী।

**নেট্রাম মিউর**—অতিরিক্ত হস্তমৈথুন দোষে শুক্র জলের ন্যায় তরল হইলে, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরষাঙ্গ শীতল ও শক্তিহীন লক্ষণে নেট্রাম মিউর—৩০ উপকারী।

**ক্যালি ব্রোম্**—স্মৃতিশক্তি নাশ, বিভ্রম, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসাড়তা ও ঝিন্‌ঝিন্ ভাব, মাথাঘোরা প্রভৃতি লক্ষণে ক্যালি-ব্রোম—ф মূল আরক সেবনীয়।

**ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া**—হস্তমৈথুনের দরুণ জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা ভীরু স্বভাব, নৈরাশ্যভাব, কুৎসিত স্বপ্নাদি দর্শন, মস্তিষ্কের উত্তেজনা অথবা নিস্তেজ ভাব, এই সব লক্ষণে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া—৩x অব্যর্থ।

**চায়না**—হস্তমৈথুনের জন্য কাজে কর্ম্মে অনিচ্ছা, অজীর্ণ, অনিদ্রা, অক্ষুধা, দুর্ব্বলতা, মাথাঘোরা প্রভৃতি দেখা দিলে চায়না—৩ উপযুক্ত ঔষধ।

**সালফার**—হস্তমৈথুনের দরুণ শুক্র জলবৎ তরল, জননেন্দ্রিয় সামর্থ-হীন ও শীতল, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতিতে সালফার—৩ উপকারী।

**সিনা**—ক্রিমি থাকার দরুণ হস্তমৈথুনের ইচ্ছা নিবারণ করিতে সিনা—৩x অব্যর্থ।

**নেট্রাম ফস্**—হস্তমৈথুনের জন্য মাঝে মাঝে রেতঃস্খলন ও স্বপ্নদোষ হইলে বাইওকেমিক নেট্রাম ফস্ ৩x বিচুর্ণ ৩ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ৫ বার সেবনে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়।

## স্বপ্নদোষ বা নাইট্ পলিউসন :

ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্য্যস্খলন হইলেই তাহাকে স্বপ্নদোষ বা নাইট-পলিউসন্ অথবা নক্ট্যারন্যাল এমিসন্ কহে। মূলতঃ ইহা স্বতন্ত্র কোন পীড়া নহে ; বিবিধ শুক্র পীড়ার ইহা একটী প্রধান লক্ষণ বা শুক্রমেহ রোগের একটী পূর্ব্ব প্রতিভাসিক বিকাশ মাত্র।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ে অধিক চিন্তা করিলেই স্বপ্নে সে সকল মনে উদিত হইয়াই স্বপ্নবিকার বা স্বপ্নদোষ ঘটায়। অত্যধিক স্ত্রী সহবাস ও যাহারা হস্তমৈথুনে রত হয় তাহাদেরই এই পীড়া আক্রমণ করিয়া থাকে। প্রথম প্রথম ইহা সামান্য ভাবেই দেখা দেয় অর্থাৎ খুব দেরীতেই সুপ্তিস্খলন হয় ; কিন্তু পরে ইহা ভীষণাকার ধারণ করে। তখন অনেকের দুই একদিন পর পর অথবা প্রত্যহ স্বপ্নদোষ হইতেও দেখা যায়। এমন কি একই রাত্রে ২।৩ বার স্বপ্নদোষ হয়, এমন ব্যক্তিরও অভাব নাই। সুস্থকায় নীতিপরায়ণ ও বীর্য্যশালী ব্যক্তিরও সময় সময় এইরূপ ভাবে বীর্য্যপাত হইয়া থাকে। কিন্তু মাসে ১ বার বা ২ বার সুস্থ অবিবাহিত ব্যক্তির এরূপভাবে বীর্য্যস্খলন বা স্বপ্নদোষ হওয়া কোন দোষের নহে।

আমরা দেখিয়াছি অনেকের প্রথমতঃ শুক্রতারল্য উপস্থিত হইয়া স্বপ্নদোষ দেখা দেয়। কাহারও কাহারও বিনা উত্তেজনায় স্বপ্নদোষ হওয়ার কথাও শোনা যায়, কিন্তু স্বপ্নদোষের এই প্রকার লক্ষণ বড়ই খারাপ। কারণ ইহার পরিণামে স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস, ধাতুদৌর্ব্বল্য, ধ্বজভঙ্গ, যক্ষ্মা, প্রমেহ ইত্যাদি দেখা দেয় এবং এই সকল ব্যক্তির অত্যধিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়। অনেকের শুক্র এতদূর পাতলা হইয়া থাকে যে তাহাদিগের স্ত্রীলোক দর্শন, স্পর্শন, অথবা স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় আলোচনা করা মাত্রেই অসাড়ে বীর্য্যপাত হয়। ক্রমশঃ এই রোগের কবলে পতিত হইয়া ইহাদিগের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া জীবন অসাড় হইয়া থাকে।

হস্তমৈথুন ব্যতীতও কাহারো কাহারো স্বপ্নদোষ দেখা দিয়া থাকে তন্মধ্যে প্রমেহ, নানা কারণে মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হইলে, অণ্ডকোষে চুলকানি বা দদ্রু থাকিলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি সমূহ বহির্গত হইয়া জননেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিলে কিংবা অজীর্ণ জনিত উদরাধ্মান প্রভৃতি কারণই প্রধান।

স্বপ্নদোষাক্রান্ত ব্যক্তির মন স্ফূর্ত্তিহীন, দেহ ক্ষীণ ও মুখ অপ্রসন্ন হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া ক্ষুধাহীনতা, মস্তিষ্ক ভার ভার বোধ, শিরোঘূর্ণন, উঠিতে বসিতে মাথাঘোরা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, পরিপাক ক্রিয়ার বিকৃতি, অজীর্ণ, নানাবিধ স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, কাহারও কাহারও জীর্ণ জ্বর, মূত্রনলীর শিথিলতা, প্রস্রাবের পর বীর্য্যপাত প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

**হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—**

**ব্যারাইটা কার্ব্ব**—স্বপ্নদোষের ইহা একটী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ; বিশেষ করিয়া রাত্রে স্বপ্নদোষের পর অবসাদ, হৃদ্‌স্পন্দন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি লক্ষণে ৬ শক্তি ব্যারাইটা কার্ব্ব ব্যবহার্য্য।

**নুফার লুটিয়াম্**—স্বপ্নদোষ সহ অতিশয় দুর্ব্বলতা থাকিলে নুফার $\phi$ মূল আরক ব্যবহার করিতে হইবে।

**য়্যাসিড্ পিক্রিক্**—কামস্বপ্ন ছাড়াও যে স্থলে অতিশয় রেতঃপাত হইয়া থাকে এবং তাহার দরুণ শরীরে দুর্ব্বলতা অনুভব হয়, সে ক্ষেত্রে য়্যাসিড্ পিক্রিক্ ৩০ অতিশয় কার্য্যকরী।

**ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া**—হস্তমৈথুনের কুফলের দরুণ স্বপ্নদোষ এবং স্বপ্নদোষের পর কোমরে বেদনা অনুভূত হয়, চক্ষুর চারিপাশে কালিমা, গণ্ড বসিয়া যাওয়া প্রভৃতি লক্ষণে ষ্ট্যাফিসাগ্রিয়া ৩ উপকারী।

**নাক্স্ ভমিকা**—উত্তেজক জিনিষ খাইবার দরুণ স্বপ্নদোষ হইলে, কুৎসিৎ স্বপ্নদর্শনে স্বপ্নদোষ, দুর্ব্বলতা, অস্থিরতা, মেরুদণ্ডে ও কোমরে বেদনা ও জ্বালা এই সব লক্ষণে নাক্স্ ভমিকা ৩০ বিশেষ উপযোগী।

**নেট্রাম ফস্**—শুক্র পাতলা হইলে এবং প্রতি রাত্রেই স্বপ্নদোষ দেখা দিলে বাইওকেমিক নেট্রাম্ ফস্—৩x, ৬x অতিশয় কার্য্যকরী।

**ক্যানাবিস্ স্যাট্**—উপদংশ ক্ষতজনিত স্বপ্নদোষে ক্যানাবিস্ স্যাট্—১x, ২x শক্তি অব্যর্থ।

**ক্যালি ব্রোমেটাম্**—বীর্য্যাধিক্য হেতু রাত্রিকালে বার বার স্বপ্নদোষ ঘটিলে ক্যালি ব্রোমেটাম্ ৩x চূর্ণ ও ৩০ শক্তি বিশেষ উপযোগী।

## পুরুষত্বহানি ঃ

পুরুষত্বহানি বা ষ্টিরিলিটি ইন্ দি মেল অর্থাৎ পুরুষের বন্ধ্যাত্ব। এই পীড়া যে সকল পুরুষের আছে সাধারণতঃ দেখা যায় (১) তাহাদের বীর্য্যে স্পার্মাটোজোয়া বা শুক্রকীটের অভাব, আর তাহা না হইলে (২) সঙ্গমের সময়ে তাহাদের বীর্য্যপাত হয় না। আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেকের এই বন্ধ্যাত্বের সহিত ধ্বজভঙ্গতাও বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়। অনেকের রতিশক্তি বেশ অক্ষুণ্ণ আছে এবং বীর্য্যও নিয়মিত স্খলন হয়, কিন্তু উহাতে শুক্রকীট সজীব থাকিতে দেখা যায় না।

বিবিধ কারণে এই পীড়া উপস্থিত হইতে পারে। যথা :—জন্ম হইতেই অণ্ডকোষ অথবা শুক্রনলীর (spermatic cord) অভাব কিংবা উহার ক্রিয়াবিকৃতি বা স্থানচ্যুতি। যদি এই কারণে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব হইয়া থাকে তবে ইহার আর কোনও চিকিৎসা নাই। উহা ছাড়া অনেক সময় দেখা যায়, অত্যধিক রতিক্রিয়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, যক্ষ্মা, আফিম সেবন, সুরাপান প্রভৃতি এবং প্রমেহ বা উপদংশজনিত দোষেও পুরুষের বন্ধ্যাত্ব উপস্থিত হয়।

### হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা—

এই পীড়ায় দীর্ঘকাল ব্যবধানে সঙ্গম, পুষ্টিকর ও লঘুপাক খাদ্য বিধেয়। সাধারণ পুরুষত্বহানি রোগে **কোনিয়াম্**—৩ শক্তি একটি উৎকৃষ্ট

ঔষধ। ইহাতে যদি বিশেষ ফল না দেয় তবে **আয়োডিয়াম্ ৬** প্রত্যহ তিনবার সেবনীয়।

অত্যধিক ধূমপানের জন্যও অনেক পুরুষের বীর্য্যে শুক্রকীট বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায় না। এ ক্ষেত্রে **এপোসাইনাম ক্যান** $\phi$ মূল আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় সেবনে ফল পাওয়া যায়।

পুরুষত্বহানি রোগ প্রমেহ বা উপদংশজনিত হইলে অগ্রে উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া রোগ নির্ম্মূল করিতে হইবে; তারপর অন্যান্য ঔষধ ব্যবহার্য্য। পুরুষত্বহানি পীড়ার অন্যান্য ঔষধ ধ্বজভঙ্গ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

## প্রিয়েপিজম্ বা লিঙ্গোচ্ছ্বাস্ঃ

লিঙ্গের অযথা ও দীর্ঘস্থায়ী উত্থানকে প্রিয়েপিজম্ বলে। সাধারণতঃ ইহা প্রমেহ রোগের একটী উপসর্গ পীড়া; তবে অন্যান্য শুক্রদোষজনিত কারণেও অনেক সময় ইহা দেখা দেয়। নিম্ন ঔষধগুলি এই পীড়ায় উৎকৃষ্ট। এই পীড়ায় ঔষধ খাইবার সঙ্গে জননেন্দ্রিয় বেশ করিয়া ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া ফেলা উচিত।

**হোমিও ঔষধঃ**—১। মাইগেল ল্যাসিওডোর—৬, ৩x ২। ক্যান্থারিস্—৩x—৬, ৩। এ্যাকোনাইট্—৩x, ৪। আর্জ্জেণ্টাম নাইট্রিকাম—৬, ৫। ক্যানাবিস্ ইণ্ডিকা—২x, ৬। পিক্রিক্ এ্যাসিড—৩০, ৭। আগেভা এ্যামেরিকানা—$\phi$ মূল আরক সেবনীয়।

যদি উপরোক্ত ঔষধগুলিতে ফল না পাওয়া যায় তবে রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ক্যালি ব্রোম্—$\phi$ মূল আরক ব্যবহারে যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়।

## প্রবল সঙ্গমেচ্ছাঃ

প্রবল সঙ্গমেচ্ছা বা কামোন্মাদ (নিম্ফোম্যানিয়া) রোগে পুরুষের পক্ষে পিক্রিক্ এ্যাসিড ৬x (এবং রমণীর পক্ষে প্ল্যাটিনা ৬x অথবা ২০০ শক্তি) উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কামোন্মাদ রোগে ( বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের ) কামেন্দ্রিয় অতিশয় উত্তেজিত হইলে **ক্যাল্ক-ফস্** ৬x অতিশয় কার্য্যকরী। ইহা ছাড়া নিম্ন ঔষধগুলি এই রোগে সর্ব্বদা ব্যবহৃত হইয়া থাকে—১। মিউরেক্স ৩, ২। চিমাফিলা ৬x ও ২০০, ৩। মেজেরিয়াম ৩০, ৪। সিমিসিফিউগা ৩x, ৫। ক্যান্থারিস্ ৬, ৬। মস্কাস্ ৩x—৬x, ৭। ট্যারেণ্টুলা হিস্পানিকা ৩০—২০০, ৮। ক্যানাবিস্ স্যাটাইভা ১x—৩ এবং ৬, ৯। হায়ওসায়েমাস্ ৩০ স্ত্রী পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা চলে।

## সঙ্গমে বিতৃষ্ণা ঃ

জননেন্দ্রিয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ সঙ্গমে বিতৃষ্ণা জাগে। পুরুষের পক্ষে এই রোগেব প্রধান ঔষধ **এ্যাসিড ফস্** ৬ এবং **জেলস্** ১x—৩x। স্ত্রীলোকের পক্ষে **গ্র্যাফাইটিস্** ৬ এবং **অ্যামন্ কার্ব্ব** ৩x শ্রেষ্ঠ ঔষধ। সঙ্গমেচ্ছার একান্ত অভাব এমন কি ঘৃণা, ইন্দ্রিয় শীতল, সঙ্গমে রোগ বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণে **সিপিয়া** ১x প্রত্যহ ২ বার সেবনীয়। পুরুষের জননেন্দ্রিয় অত্যধিক দুর্ব্বলতা হেতু নিতান্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যদি সঙ্গমে অনিচ্ছা প্রকাশ পায় তবে **স্যাবল্ স্যারুলেটা** $\phi$ মূল আরক ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেব্য। বাইওকেমিক **নেট্রাম ফস্** ৩x অথবা ৬x এই পীড়ায় একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই পীড়ায় পুষ্টিকর খাদ্যাদি আহার ও সঙ্গম কিছুদিনের জন্য পরিত্যাগ করা উচিত।

## ধ্বজভঙ্গ বা ইম্পোটেন্সী ঃ

পুরুষের রতিক্রিয়ার অসমর্থতা প্রকাশ পাইলেই তাহাকে ধ্বজভঙ্গ বা ইংরাজীতে ইম্পোটেন্সি বলা হয়। সাধারণতঃ এই পীড়া দুইটী প্রধান কারণেই উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। যথা :—মানসিক ও দৈহিক। ধ্বজভঙ্গ রোগ দেখা দিলে সাধারণতঃ পুরুষের সন্তানোৎপাদনের কোন শক্তি থাকে না।

**উৎপত্তির কারণ**ঃ—হস্তমৈথুন, অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাস, শুক্রমেহ বা স্বপ্নদোষ, প্রমেহ, পক্ষাঘাতে মেরুদণ্ড আহত হইলে, নানাবিধ ক্ষয়রোগ, শরীরে মেদাধিক্য, অণ্ডকোষের ক্ষুদ্রতা, মুদা, লিঙ্গোপরি কোনরূপ আঁচিল অথবা ক্যানসার হওয়া, পুরুষাঙ্গের খর্ব্বতা, বিকলতা, কিংবা রতিযন্ত্রের কোন অংশের অভাব বশতঃ ও অন্যান্য মস্তিষ্ক পীড়া, মানসিক রোগ এবং কঠিন পীড়াক্রান্ত হইয়া এই রোগ দেখা দিয়া থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শোক, দুঃখ, ভয়, ক্রোধ, বহুমূত্র, অগ্নি-মান্দ্য, জননেন্দ্রিয় ক্ষুদ্র—বিকৃত ; একশিরা, হার্ণিয়া, মূত্রনলীর প্রদাহ—সঙ্কীর্ণতা, রেতঃনলীর বিকৃতি এবং জননযন্ত্রের নানাবিধ অস্বাভাবিকতার জন্যও ধ্বজভঙ্গ রোগ উপস্থিত হইতে পারে বা হয়। তা'ছাড়া দীর্ঘকাল কোনও উত্তেজক ঔষধ ব্যবহার ; আফিম, গাঁজা, সুরাপান, তার্পিণ, তামাক, কর্পূর, সোডা ইত্যাদি ক্ষার দ্রব্য, ব্রোমাইড্ ও আইয়োডিন্ ঘটিত বিবিধ ঔষধ ব্যবহার প্রভৃতি কারণেও এই পীড়া উপস্থিত হইতে দেখা যায়।

**পীড়ার লক্ষণ**ঃ—ধ্বজভঙ্গ রোগীর মানসিক কষ্ট যে কিরূপ তাহা বলিবার নহে। রতিসুখ কামনায় অগ্রসর হইতেই হয়ত লিঙ্গ শিথিল হইয়া আর কোনরূপেই উহা উত্তেজনা প্রাপ্ত হয় না। অনেকের হয়ত মনে দারুণ কামতৃষ্ণা আছে, কিন্তু উপভোগ করার উপায় নাই ; কারণ রতিযন্ত্র শিথিল ও দুর্ব্বল, বক্র অথবা ক্ষুদ্র।

রোগের প্রথমাবস্থায় সামান্য একটু লিঙ্গোত্থান হইলেও সঙ্গমের প্রারম্ভেই বীর্য্য স্খলিত হইয়া থাকে। রোগী বিমর্ষ, উদ্বিগ্ন ও উদ্যমবিহীন। ধ্বজভঙ্গ রোগ অধিক কাল স্থায়ী হইলে অনেকের পুরুষাঙ্গ অতি ক্ষুদ্র হইয়া যায়। ধ্বজভঙ্গ রোগের জন্য অনেকের উন্মাদ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে।

**চিকিৎসা ঃ**—ধ্বজভঙ্গ রোগের ঔষধীয় চিকিৎসা করার পূর্ব্বে এই রোগের কতকগুলি আনুসঙ্গিক নিয়ম পালন করা বিশেষভাবে কর্ত্তব্য। নচেৎ শুধু ঔষধে রোগারোগ্য হওয়ার ভরসা খুব কম। এইখানে ধ্বজভঙ্গ রোগীর যে কতকগুলি সহজ নিয়ম পালনের কথা বলা হইল, উহা পালন করিয়া চলিলে এবং তৎসঙ্গে যে সকল ঔষধের কথা লিখিত হইল তাহার মধ্য হইতে সুনির্ব্বাচিত ঔষধ ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করা যায়।

( ১ ) এই রোগ দেখা দিবামাত্র দীর্ঘকালের জন্য অন্ততঃ ৬ মাস বা ১ বৎসর মৈথুন একেবারে বর্জ্জনীয়।

( ২ ) মানসিক বল বা শক্তি সঞ্চয় এই পীড়ার একটী প্রধান ঔষধ।

( ৩ ) মানসিক বিকারগ্রস্ত **রোগীদের মনে সর্ব্বপ্রথমে সাহস ও** উৎসাহ প্রদান প্রত্যেক চিকিৎসকের একান্ত কর্ত্তব্য। 'রোগীর পীড়া যে মোটেই সাংঘাতিক নহে, অতি সামান্য'—এ বিশ্বাস রোগীর মনে সর্ব্বাগ্রে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত এবং ইহাতেই ধ্বজভঙ্গ রোগের অর্দ্ধেক আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রত্যেক চিকিৎসক একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন।

( ৪ ) এই রোগে বলকারক ও শুক্রজনক ঔষধ এবং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

( ৫ ) প্রত্যহ শীতল জলে স্নান করা বাঞ্ছনীয়—অবশ্য সহ্য হইলে।

( ৬ ) পীড়া আরোগ্য হওয়ার পরও অতিরিক্ত সহবাস একেবারে বর্জ্জন করিতে হইবে। মাসে তিন দিবসের বেশী রতিক্রিয়া করা সঙ্গত নহে এবং একদিনে একবারের বেশী রতিক্রিয়ায় নিযুক্ত হওয়া অসঙ্গত।

( ৭ ) অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম পরিত্যজ্য।

( ৮ ) কোষ্ঠ যাহাতে পরিষ্কার হয়, খাদ্য যাহাতে হজম হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

অন্যান্য নিয়ম পালনাদির কথা শুক্রমেহ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য চিকিৎসা অণুঅধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। ধ্বজভঙ্গ রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পুনরায় অনিয়মিত অত্যাচারের দ্বারা এই রোগ আনয়ন করিলে দ্বিতীয়বার উহা আরোগ্য করা প্রায়ই অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাজেই রোগে সারিলে প্রত্যেকেরই সাত্ত্বিক ও সহজভাবে চলা উচিত।

**হোমিওপ্যাথিক ঔষধ—**

**বিউফো রাণা**—পুরুষত্বহীনতা বা ধ্বজভঙ্গ রোগের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ। অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত ও বুদ্ধিহীন, স্মৃতিশক্তির নাশ প্রভৃতি লক্ষণ যে সব ধ্বজভঙ্গ রোগীর বর্ত্তমান, তাদের পক্ষে ত ইহা অমৃততুল্য মহৌষধ। সাধারণতঃ ৬x ক্রম ব্যবহার্য্য। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহার অতি উচ্চ শক্তি প্রয়োজন হয়।

**নেট্রাম ফস্**—বাইওকেমিক্ নেট্রাম ফস্ এই রোগের আর একটী চমৎকার ঔষধ।

**স্যাবল্ সেরুলেটা**—অত্যধিক দুর্ব্বলতা বশতঃ সঙ্গমে অসমর্থ হইলে স্যাবল্-সেরুলেটা—$\phi$ মূল আরক প্রতি ৫ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেব্য।

**মস্কাস্**—বহুমূত্রসহ ধ্বজভঙ্গ ( কোকা ), তীব্র সঙ্গমেচ্ছা, অনিচ্ছায় শুক্রস্রাব, প্রচুর ফেকাসে বর্ণের প্রস্রাব, রোগীর মনে হয় শীঘ্রই তাহার মৃত্যু হইবে, সর্ব্বশরীর কাঁপে, মাথাঘোরা, এই সব লক্ষণে মস্কাস্ —৩০ উপকারী।

**সেলিনিয়াম্**—অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস কিংবা হস্ত-মৈথুনের দরুণ এই পীড়া দেখা দিলে, তৎসহ মানসিক অবসাদ, চলিতে ফিরিতে শুক্রপাত ও সঙ্গমে একেবারে অসামর্থ্যতা প্রকাশ পাইলে সেলিনিয়াম্ ২০০ বিশেষ উপযোগী।

**ল্যাক্‌-ভ্যাক্সিনাম ডিফ্লোরেটাম**—অবসন্ন ও দুর্ব্বলতা সহ জনন-শক্তি এবং সহবাস ক্ষমতা লোপ পাইলে ল্যাক্‌-ভ্যাক্সিনাম ডিফ্লোরেটাম—২০০ অথবা আরও উচ্চশক্তি প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে ফল পাওয়া যায়।

**এ্যাভেনা স্যাটাইভা**—অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের দরুণ ধ্বজভঙ্গ দেখা দিলে এ্যাভেনা স্যাটাইভা ϕ মূল আরক দশ ফোঁটা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার সেবনীয়।

**আর্নিকা**—লিঙ্গে কোনওরূপ আঘাত প্রাপ্তি বশতঃ ধ্বজভঙ্গ দেখা দিলে আর্নিকা—৩x খুব ভাল ঔষধ।

**এ্যানাকার্ডিয়াম্‌**—অতিরিক্ত স্ত্রীসহবাস হেতু রতিশক্তি লোপ পাইলে এ্যানাকার্ডিয়াম্‌—৩০ এবং ২০০ শক্তি যথেষ্ট ফল দেয়।

**ফস্ফোরিক এ্যাসিড্‌**—অতিরিক্ত স্ত্রীসঙ্গম হেতু ধ্বজভঙ্গ দেখা দিলে এ্যাসিড্‌ ফস্ফোরিক—ϕ মূল আরক ব্যবহারেও যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া এই পীড়ায় নিম্নক্রমাদি সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য।

**এ্যাগনাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌**—ধ্বজভঙ্গ রোগের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-শক্তি যখন একেবারে লোপ পায় নাই—সেই অবস্থায় এ্যাগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌—৩x প্রয়োগে রোগ আর বৃদ্ধি না পাইয়া আরোগ্য হয়।

**নাক্স ভমিকা**—ধ্বজভঙ্গসহ অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, মানসিক বিষণ্ণভাব, ইহাতে নাক্স ভমিকা—৩০ অনেক সময় কার্য্যকরী হইয়া থাকে।

**ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব**—ইহা এ্যাগ্নাস্‌ ক্যাষ্টাস্‌ এর অনুরূপ ঔষধ অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গের প্রথমাবস্থায় ইহা ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়।

**লাইকোপডিয়াম**—অত্যধিক পরিমাণে ইন্দ্রিয় সেবা বশতঃ যে ক্ষেত্রে ধ্বজভঙ্গ দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রে ইহার ৩০ শক্তি ব্যবহার্য্য। সঙ্গমেচ্ছার অভাব এবং লিঙ্গে সঙ্কোচন ও শিথিলতায় ইহার ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য।

## বাজীকরণ ঔষধী :

'ভাবপ্রকাশে' বাজীকরণাধিকরণে বলা হইয়াছে—

যদ্দ্রব্যং পুরুষং কুর্য্যাৎ বাজিবৎ সুরতক্ষমম্।
তদ্বাজীকরণমাখ্যাতং মুনিভির্ভিষজং বরৈঃ॥

যে দ্রব সেবন করিলে পুরুষ অশ্বের ন্যায় সুরতক্ষম হয়, অর্থাৎ যে ক্রিয়া দ্বারা অশ্বের ন্যায় রতিশক্তি বার্দ্ধত হইয়া থাকে, তাহাই বাজীকরণ। স্বভাবতঃ যাহাদের রতিশক্তি অল্প এবং অতিরিক্ত স্ত্রী-সহবাসাদি দুষ্ক্রিয়া দ্বারা যাহাদের রতিশক্তির হীনতা ঘটিয়াছে, তাহাদের বাজীকরণ ঔষধ সেবন বিধেয়। শরীরের মধ্যে শুক্রধাতুই শ্রেষ্ঠ এবং ধাতু শরীর পোষণের একমাত্র প্রধান উপাদান, সুতরাং এই ধাতুর অল্পতা হইলে যাহাতে ঐধাতু বৃদ্ধি হয়,এইরূপ উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শুক্রক্ষয় হইলে সকল ধাতুরই ক্ষয় হইয়া অকালে শরীর নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ; এই জন্য বাজীকরণ ঔষধাদি সেবন দ্বারা ক্ষীণশুক্রের পূরণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

সাধারণতঃ ঘৃত, দুগ্ধ, মাংস প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে সেবন করিলে বাজীকরণের প্রয়োজন অনেক পরিমাণে সিদ্ধ হয়। যে সকল দ্রব্য মধুর রস, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, বলবর্দ্ধক ও তৃপ্তিজনক সেই সকল পদার্থ সাধারণতঃ বৃষ্য বা বাজীকরণ নামে অভিহিত। প্রিয়তমা এবং অনুরক্তা সুন্দরী যুবতী রমণীই বাজীকরণের প্রথম উপাদান।

'ভাবপ্রকাশে' আছে—ক্লৈব্য বা ক্লীবতা ( সুরতশক্তি ) উপস্থিত হইলে বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিতে হয়। যথা : মানব সুরতক্রিয়ায় আসক্ত হইলে তাহাকে ক্লীব কহে, ক্লীবের ভাব ক্লৈব্য, এই ক্লৈব্য সাত প্রকার। ইহার নিদানাদি এইরূপ :—ভয়, শোক ও ক্রোধাদি কর্ত্তৃক কিংবা অহৃদ্য সেবন হেতু অথবা অনভিপ্রেতা দ্বেষ্যা স্ত্রীর সহিত মৈথুন করিলে মনের প্রীতি না হইয়া বরং অসুস্থতা জন্মে। ইহাতে শিশ্নের উত্তেজনা শক্তি রহিত হয়, তখন তাহাকে মানস-ক্লৈব্য কহে।

অতিরিক্ত কটু, অম্ল, লবণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবনে পিত্তবৃদ্ধি হইয়া শুক্রধাতু ক্ষয় হয়। ইহাতে শিশ্নের উত্তেজনা রহিত হইলে তাহাকে পিত্তজ ক্লৈব্য কহে। যে ব্যক্তি বাজীকরণ ঔষধ সেবন না করিয়া অতিরিক্ত মৈথুনাসক্ত হয়, তাহারও শুক্রক্ষয় হেতু ক্লৈব্য জন্মে। বলবান ব্যক্তি অত্যন্ত কামাসক্ত হইলে যদ্যপি মৈথুন না করিয়া শুক্রবেগ ধারণ করে, তাহা হইলে তাহার শুক্র স্তব্ধ হেতু ক্লৈব্য রোগ জন্মে। জন্ম হইতে ক্লৈব্য হইলে বাজীকরণ ঔষধ সেবনে কোন ফল হয় না। বীর্য্যবাহিনী শিরা চ্ছেদ হেতু যে ক্লৈব্য উপস্থিত হয়, তাহাও চিকিৎসা-সাধ্য নহে। সাধ্য ক্লৈব্য রোগে হেতুর বিপরীত কার্য্য করা বিধেয়; কারণ নিদান পরিবর্জ্জনই সর্ব্বপ্রকার চিকিৎসা হইতে শ্রেষ্ঠ।

বাজীকরণ ঔষধ সেবনবিধি সম্বন্ধে 'ভাবপ্রকাশে' লেখা আছে: মানবগণ উত্তমরূপে কায়া শোধন করিয়া ১৬ বৎসর হইতে ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বাজীকরণ ঔষধ সেবন করিবে। অবিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ঔষধ সেবন বিধেয় নহে, তাহাতে নানাবিধ শারীরিক অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিশুদ্ধ শরীরে বাজীকরণ ঔষধ সেবনে রতিশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

বিলাসী, অর্থশালী ও রূপযৌবন সম্পন্ন মনুষ্যগণের এবং যাহাদের বহু স্ত্রী, তাহাদিগের বাজীকরণ ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। বৃদ্ধ রমণেচ্ছু, মৈথুন হেতু ক্ষীণ, ক্লীব ও অল্পশুক্র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এবং যে ব্যক্তি স্ত্রীদিগের প্রিয় হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে বাজীকরণ ঔষধ হিতকর এবং প্রীতি ও বলবর্দ্ধক।

নানাপ্রকার সুখকর আহার ও পানীয়, রমণীয় বাক্য, স্পর্শসুখ, প্রসাধন কলাভিজ্ঞা রূপযৌবনসম্পন্না কামিনী, শ্রবণ সুখকর গীত, তাম্বুল, মদ্য, মাংস, মনোহর গন্ধ, চিত্রিত রূপ দর্শন এবং মনের প্রীতিকর দ্রব্য সমূহ মানবগণের বাজীকরণ নামে অভিহিত। ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলে বাজীকরণ হইয়া থাকে।

(১) স্বর্ণমাক্ষিক, পারদ ভস্ম ও লৌহচূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে এবং হরিতকী, শিলাজতু ও বিড়ঙ্গ ঘৃতের সহিত একবিংশতি দিবস লেহন করিলে অশীতি বৎসর বৃদ্ধও যুবার ন্যায় স্ত্রী প্রসঙ্গ করিতে সমর্থ হয়।

(২) গুলঞ্চের রস, মারিত অভ্র, লোধ, এলাচি, চিনি ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল দ্রব্য মধুর সহিত লেহন করিলে সেই ব্যক্তি শত স্ত্রীতে উপগত হইতে পারে।

(৩) জীববৎসা গাভীর দুগ্ধদ্বারা গোধুমচূর্ণ, চিনি, মধু ও ঘৃতসহ পায়স প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে বৃদ্ধ ব্যক্তিও রতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(৪) ঈষৎ অম্লমধুর দধি ৮ সের, পরিষ্কৃত চিনি ২ সের, মধু অর্দ্ধ পোয়া, শুণ্ঠী ৮ মাষা, ঘৃত অর্দ্ধ পোয়া, মরিচ ৪ মাষা এবং লবঙ্গ অর্দ্ধ ছটাক একত্র করিয়া পরিষ্কৃত বস্ত্রখণ্ডে হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিবে। তাহাতে বস্ত্রছিদ্র দিয়া নিম্নে যে দ্রব্য গলিয়া পড়িবে, তাহার সহিত কস্তুরী ও চন্দন মিশ্রিত করিবে, পরে তাহা অগুরু দ্বারা ধূপিত করিয়া কর্পূর যোগে সুগন্ধি করিয়া লইবে। এইরূপে রসালা প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। মকরেশ্বর স্বয়ং সেবনের জন্য ইহা অবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহা অতিশয় সুখদায়ক এবং কামাগ্নি-সন্দীপক।

(৫) গোক্ষুর বীজ, কোকিলা, অশ্বগন্ধা, শতমূলী, তালমূলী, শূকশিম্বী বীজ, যষ্টিমধু, গোরক্ষ-চাকুলিয়া ও বেড়েলা একত্র চূর্ণ করিয়া ঘৃতে ভাজিয়া দুগ্ধে সিদ্ধ করিবে। পরে তাহা চিনির সহিত মোদক প্রস্তুত করিয়া অগ্নির বলানুসারে ভোজন করিলে উত্তম বাজীকরণ হয়। সকল বাজীকরণ ঔষধ হইতে সার গ্রহণ করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা সকল প্রকার বাজীকরণ হইতে শ্রেষ্ঠ। এই ঔষধ প্রস্তুত কালে চূর্ণ হইতে ৮ গুণ দুগ্ধ, চূর্ণের সমান ঘৃত এবং সমস্ত দ্রব্যের সমান চিনি দিতে হয়। ইহাকে রতিবর্দ্ধক মোদক কহে।

---

# সপ্তম অধ্যায়

## যৌন-সঙ্গম ও যৌনতৃপ্তি

যৌন-সঙ্গমের দ্বারা প্রকৃত যৌনতৃপ্তি অনেক দম্পতিই লাভ করেন না। ইহা লাভ না করিবার মূলে প্রধানতঃ দেখা যায় যৌনকলাজ্ঞানের অভাব। তাহা ছাড়া, যৌন-প্রতিযোগিতা, অত্যুগ্র যৌনক্ষুধা, ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব কিংবা শারীরিক অসুস্থতা ও অযোগ্য মিলন প্রভৃতিও প্রকৃত যৌনতৃপ্তি লাভের অন্তরায় হইয়া থাকে। রমণীর রাগসঞ্চার করিবার সঙ্কেতাদি ও রাগলক্ষণাদি চিনিবার ক্ষমতা যে সকল পুরুষ অর্জ্জন না করিয়াছেন, তাঁহারা কোনদিনই প্রকৃত যৌনতৃপ্তি লাভে সক্ষম হইতে পারিবেন না ও স্ত্রীকেও এই আনন্দ হইতে বঞ্চিত রাখিবেন। তদুপরি স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চরমানন্দ (orgasm) একই সময়ে না আনিতে পারিলেও অনেক সময় যৌনতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব হইয়া উঠে না। কেবলমাত্র লালসা নিবৃত্তি করিতেই যাঁহারা যৌন সঙ্গমে রত হন ও কোন প্রকার যৌননীতি না মানিয়া অবিরত সঙ্গমে মাতেন, তাঁহারাও প্রকৃত যৌনতৃপ্তি কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারেন না।

পুরুষের কামলালসা যেমন অতি সহজেই জাগ্রত হয়, তেমনি সহজেই শুক্রস্খলনের দ্বারা উহাতে তৃপ্তও হয়। কিন্তু রমণীর পক্ষে উহা হওয়া সম্ভব নহে। পুরুষের কামকেন্দ্র কেবলমাত্র জনন অঙ্গের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; কাজেই কামনার সকল অনুভূতি তাহার জনন অঙ্গেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, তাই কেবল জননযন্ত্রের পরিচালনায়ই পুরুষ কাম-পরিতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু রমণীর কামকেন্দ্র কেবলমাত্র জনন অঙ্গেই সীমাবদ্ধ নহে। যদিও কামকেন্দ্রই উহার প্রধান কেন্দ্রস্থল, তথাপি রমণী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়াই অল্প বিস্তরভাবে কামনার অনুভূতি উপলব্ধি করিয়া থাকেন।

স্তনবৃন্ত, গণ্ডমূল, ওষ্ঠ ও জিহ্বায় রমণীগণ অপেক্ষাকৃত নিবিড়ভাবে কামাবেশ উপলব্ধি করেন। তাই রমণীর যৌনলালসা যেমন ধীরে ধীরে জাগ্রত হয় তেমনি ধীরে ধীরেই উহা চরমানন্দের পথে অগ্রসর হইয়া থাকে। কিন্তু স্বামী যদি সঙ্গমের মধ্যপথেই শুক্রস্খলনের দ্বারা নিজের তৃপ্তি লাভ করতঃ সঙ্গম-বিরতি করেন, তাহাতে স্ত্রীর পক্ষে তৃপ্তিলাভ করা ত সম্ভব হয়ই না, উপরন্তু বুভুক্ষু হৃদয়ে অতৃপ্তবাসনা ধীরে ধীরে দিনের পর দিন তাঁহার মনের কোণে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার ফলে এক সময় সে বিবিধ স্নায়ুরোগগ্রস্তা হইয়া পড়ে।

যৌনসঙ্গমের দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের একই সময়ে চরমানন্দ লাভ করিবার ফলে যে সমস্ত সুকুমার বৃত্তি বিকাশপ্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল এবং উহার ফলে প্রেমকুসুম পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া উঠিত, অজ্ঞ স্বামীর ঐ প্রকারের সমতাবিহীন যৌনসঙ্গমে ও স্বার্থপরতায় উহার অপমৃত্যু ঘটে। অনেক স্বামীই স্ত্রীর যৌন-জীবনের এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ও উদাসীন। এই কারণেই যৌনমিলনে অনেক নারীকেই একবারে নিষ্ক্রিয়, নির্লিপ্ত ও অতৃপ্ত থাকিতে দেখা যায়। পুরুষের এই অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতায় বহু নারীকেই চিরজীবনব্যাপী কামপরিতৃপ্তি-ব্যর্থতা জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহার ফলে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর স্বাভাবিক আকর্ষণ এবং দাম্পত্য-জীবনের প্রকৃত সুখ-শান্তি ও মাধুর্য্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে।

রতিশয়নে স্বামীর উচিত প্রথমেই স্ত্রীর রাগসঞ্চার করা। এইজন্যই আমাদের প্রাচীন যৌনকলাবিদ্‌গণ তাঁহাদের গ্রন্থনিচয়ে ৬৪ প্রকার শৃঙ্গারের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শৃঙ্গার বা রমণোপাচারের দ্বারা অগ্রে স্ত্রীর-কাম জাগ্রত না করিয়া সঙ্গমে রত হইলে প্রকৃত যৌনতৃপ্তি লাভ করা ত সম্ভব নহেই ; উপরন্তু ইহা হৃদয়হীন কার্য্য বলিয়াই গণ্য।

প্রত্যেক স্বামীর স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, রতিশয়নে স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে কামপরিতৃপ্ত করিতে হইলে যৌনমিলনে রত হইবার পূর্ব্বে চুম্বন, দংশন, আলিঙ্গনাদি বিবিধ উপচারে স্ত্রীর দেহ-মনে রতিরাগ বিশেষভাবে জাগ্রত করিয়া তাহার পর মূল-সহবাসে রত হইতে হইবে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, পশুজীবনেও যাহা সহজ সুলভ দেখা যায়, তাহা অনেক শিক্ষিত মানুষের জীবনেও পরিলক্ষিত হয় না। প্রাণিগণের যৌনসম্মিলন লক্ষ্য করিলে আমরা দেখিতে পাই, মূলসহবাসরত হইবার পূর্ব্বে পুরুষ অনেকক্ষণ ধরিয়া লম্ফন, ঝম্পন, লেহন, দংশন ও আলিঙ্গনাদির দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে রতিরাগ সঞ্চারের জন্য কি চেষ্টাই না করিয়া থাকে! তথাপি স্ত্রী সহজেই পুরুষের নিকট ধরা দিতে চাহে না, সে ছুটিয়া কেবল পলাইতে চায়; পুরুষপ্রাণিটী তাহাকে আয়ত্বে আনিবার জন্য তাহার পশ্চাৎধাবন করে। এই সকল ক্রীড়ায় উভয়ের রতিরাগ ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তারপর যখন স্ত্রীর রতিসম্মতির লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন উভয়ে মূল সহবাসে রত হইয়া থাকে। পক্ষী-জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। অথচ অনেক জ্ঞান-বিবেকশীল মানুষের জীবনে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে!

রতিশয়নে সামান্য উত্তেজনা পুরুষকে যেমন প্রবলভাবে কামোত্তপ্ত করিয়া তোলে তেমনি নারীকে পরিপূর্ণরূপে কামোদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতে অনেক যৌন-উপচারের প্রয়োজন হয় এবং সে কার্য্য পুরুষেরই করা প্রয়োজন। রতিশয়নে পুরুষ স্বভাবতঃ সক্রিয় ও নারী স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় থাকে। কাজেই সক্রিয় অংশীদার নিষ্ক্রিয়কে জাগ্রত করিয়া না তুলিলে প্রকৃত যৌনতৃপ্তি লাভ করা কখনই সম্ভব হইয়া উঠিবে না। পুরুষ কেবলমাত্র যৌনাঙ্গের পরিচালনায়ই পরিতৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু নারী তাহা পারেনা। তাই পৃথিবীর অন্যতম যৌনকলাবিদ্ ডাঃ মেরী

কারমাইকেল ষ্টোপস্ তাঁহার জগৎপ্রসিদ্ধ 'Married Love' গ্রন্থে রতিশয়ানের পূর্ব্বে প্রতি স্বামীকেই এই বিষয়ে সচেতন করিয়া দিতেছেন, 'স্মরণ রাখিও প্রতি সম্ভোগকালেই কোমলভাবে পত্নীর অন্তরে প্রণয়-সঞ্চার দ্বারা তাহাকে যৌনকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে হইবে। সম্ভোগবৃত্তির জন্য পত্নীর দেহ-মন একান্ত উন্মুখ না হইলে যৌনমিলন সঙ্গত নহে।...... প্রত্যেক সহবাসের পূর্ব্বে পত্নীর অন্তরে রাগসঞ্চার করা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য।'...*

সহবাসরত হইবার পূর্ব্বে রমণোপাচারের দ্বারা স্ত্রীকে প্রবলভাবে কামোদ্দীপ্তা করিয়া লইতে পারিলে স্ত্রী অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে রতিপরিতৃপ্ত হইয়া থাকে এবং তাহাতে পরস্পরের রতিসাম্যতা বা চরমানন্দলাভ সহজ-সাধ্য হয়। যৌন উপচারের দ্বারা রমণীর বিভিন্ন শাখা কামকেন্দ্রগুলি উত্তেজিত হইলে যেমন প্রবলভাবে কামোদ্দীপ্তা হয়, তেমনি নিবিড় যৌন-আনন্দও উপভোগ করে এবং তীব্র কামোদ্দীপনার সময় নারীর যৌনাঙ্গ হইতে যে একপ্রকার রস নিঃসৃত হয় তাহা যোনিপ্রদেশ সিক্ত ও পিচ্ছিল করিয়া দেওয়ায় উহা সম্ভোগকার্য্যকে বিশেষ সহায়তা করে। †

রমণীকে উপচার দ্বারা সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারিলে রমণীও স্বভাবতঃ উহার প্রতিদান দিয়া থাকে। রতি-ক্রীড়ায় নারী পুরুষের সহিত সমান অংশ গ্রহণ না করিলে পুরুষও তৃপ্ত হইতে পারে না। পুরুষের যৌন উপচার যেরূপ নারীর দেহে-মনে অপূর্ব্ব পুলক ও আনন্দসঞ্চার করে, তেমনি নারীর পক্ষ হইতে তাহার প্রতিদানে পুরুষের

* Remember. that each act of union must be tenderly wooed for and won, and that no union should ever take place. Unless the woman also desires it and is made physically ready for it.. .........he must woo her before every separate act of coitus, . ......

† Dr. Havlock Ellis. The physchology of Sex, Vol. V: The Mechanism of Detumescence.

দেহ-মনেও ঘন আনন্দের সৃষ্টি করে। কাজেই স্বামীর যেমন কর্ত্তব্য স্ত্রীর রাগসঞ্চার করিয়া সহবাসে নিযুক্ত হওয়া, তেমনি স্ত্রীরও কর্ত্তব্য রতিক্রীড়ার সময়ে উদাসীন না থাকিয়া সক্রিয়-সচেতন হওয়া।

এখানে পুরুষের পক্ষে রমণীর ভাবলক্ষণগুলি জানিয়া রাখা প্রয়োজন। নারীত্বের পূর্ণ জাগরণ কাহারো শীঘ্র শীঘ্র ও কাহারো বা বিলম্বে হয়। তবে যৌবনাগমেই অধিকাংশ রমণীর নারীত্ব উদ্বুদ্ধ হয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, রমণীর ৩০ বছর বয়ঃক্রম অতিক্রম না করা পর্য্যন্ত নারীত্ব বিকশিত হয় না। অনেক নারীর বহু বৎসর স্বামীসঙ্গ হইবার পর তাহার নারীত্ব উদ্বুদ্ধ হয়। অনেক নারী দুই একটী সন্তানের মা হইবার পর নারীত্বের সাড়া পান। মনের অন্তস্তলে কামনার অস্তিত্ব লুক্কায়িত রাখা প্রায় সকল রমণীরই একটী বিশেষত্ব। কাজেই স্বামীকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই পত্নীর ভাবলক্ষণ দৃষ্টেই তাহার রাগসঞ্চার বুঝিয়া লইতে হইবে। নব-পরিণীতা ও অল্প বয়স্কার নারীত্বের বিকাশ বুঝিয়া উঠা যথেষ্ট জ্ঞানের প্রয়োজন এবং নারীত্বের বিকাশ না হইয়া থাকিলে উহা ধীরে ধীরে বিকাশপ্রাপ্ত হইবার জন্য স্বামীর নিপুণতা, সহৃদয়তা ও ধৈর্য্যের অবশ্যক হইয়া থাকে। ভালবাসা, আদর সোহাগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীর নারীত্ব বিকাশপ্রাপ্ত হয়।

ডাঃ জোচিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, পত্নীর ভাবলক্ষণের উপর পতির লক্ষ্য থাকা উচিত। তিনি বলিতেছেন, 'রমণীগণের ভাবসঞ্চার হইলে তাহারা স্বামীকে অতিরিক্ত প্রশংসা করে এবং সোহাগ আদর করে; শরীরের কোন কোন অঙ্গ হইতে যেন অনবধানতা বশতঃই গাত্রাবরণ উন্মোচন করিয়া ফেলে; তাহাদের স্তন স্ফীত বোধ হয়; তাহারা অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়; তাহাদের মুখমণ্ডল ক্ষণে ক্ষণে রাগরঞ্জিত হয় ও চক্ষু উজ্জ্বল দেখায় এবং অত্যন্ত রাগসঞ্চার হইলে তাহাদের কণ্ঠ

ভার হয়, স্বর কম্পিত ও গদ্‌গদ হয়, অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে এবং নিজেকে আত্মবশে রাখিতে পারে না। স্বামী যতই অনবধান হউক না কেন, এই সকল লক্ষণ দ্বারা সে নিশ্চিত বুঝিতে পারে যে তাহার স্ত্রীর রাগসঞ্চার হইয়াছে।' *

গাইয়ট বলেন: "রমণীর রাগসঞ্চার হইলে তাহার অধরোষ্ঠ দৃঢ় হয় এবং ঈষৎ কম্পিত হইতে থাকে, স্তন স্ফীত হয় এবং স্তনবৃন্ত উচ্ছ্রিত হয়। স্বামী সুচতুর হইলে ঐ সকল লক্ষণ দেখিয়া কদাচ ভুল বুঝিবেন না। যদি এ সকল লক্ষণ উপস্থিত না থাকে, তবে আদর ও সোহাগদ্বারা স্বামীর ঐ সকল লক্ষণ আনয়ন করা কর্ত্তব্য। যদি বিবিধ যৌনোপচারেও রমণীর ঐ লক্ষণগুলি উপস্থিত না হয়, তবে পুরুষ নিজের অভিলাষ দমন করিবে।" রমণীর রাগ সঞ্চার হইলে ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহে, গাত্র ঈষৎ উষ্ণ হয় এবং কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া থাকে। কখনো পদাঙ্গুলির কম্পন ও অধরে ঈষৎ হাসির ভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন রমণী স্বামীর গাত্র-সংলগ্ন হইতে ভালবাসে এবং কোন কোন অঙ্গ স্বামীর দেহের উপর ন্যস্ত করে ও স্ত্রী যেন আত্মসমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হয়। অবশ্য এই সমুদয় লক্ষণই সকল রমণীতে লক্ষিত হয় না; তবে ইহার মধ্যে কোন কোন ভাব উপস্থিত হইলেই বুঝিতে হইবে যে রমণীর রাগসঞ্চার হইয়াছে।

* When sexual desire arises within they are accustomed to ask their husbands questions on matters of love; they flatter and caress them; they allow some part of their body to be uncovered as if by accident; their breasts appear to swell: they show unusual alacrity; they experience unusual ardour, they stammer, talk beside the mark, and are scarcely mistress of themselves. All there signs should convince a husband, however inattentive he may be, that his wife craves for satisfaction.

এ সম্পর্কে মহর্ষি বাৎসায়ন বলিয়াছেন : "প্রীতি আসন্নপ্রায় হইলে নারীর ব্রীড়া অপনীত হয় এবং সে দৃঢ়ভাবে স্বামী-সংলগ্না হয় ; প্রীতি প্রাপ্ত হইলে তাহার শরীর শিথিল হয় ও চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসে।"

পরস্পর বিরোধীভাবের একত্র সমাবেশ নারীর অপর একটী বিশেষত্ব। সম্প্রয়োগকালে যে নারী একদিন নিতান্ত নির্ভীক ও নির্লজ্জার ন্যায় আচরণ করিয়াছে, অপর দিন সেই নারীই নিতান্ত ভীরু ও লাজুকতার অভিনয় করে, কিংবা সম্প্রয়োগ বিদ্বেষিণী হইয়া থাকে। মৃদু মন্দ ব্যবহার যে নারী একদিন পছন্দ করিয়াছে, সেই নারীই অপর দিন স্বামীর জোর-জবরদস্তি কামনা করে এবং সম্প্রয়োগকালে বলপ্রয়োগ কিংবা কঠোর উপচার প্রয়োগে তাহার অত্যধিক প্রীতিসঞ্চার হয়।

দম্পতি বিশেষের পরস্পরের যৌনাঙ্গের অসামঞ্জস্যতা হেতু অনেক সময় যৌনমিলন যৌনতৃপ্তি লাভের অন্তরায় হইয়া উঠে কিন্তু যৌনকলাভিজ্ঞ পুরুষের নিকট রতিআসনের পরিবর্ত্তনে ঐ সমস্যার সমাধান হয় এবং রতিতৃপ্তি সুখাবহ হইয়া উঠে।

আদিকাল হইতে উন্মেষশালী স্পৃহাবলে দেশ-বিদেশের নর-নারী রতিশয়নে নানারূপ রতি আসনের সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহা যে কত বিচিত্র প্রকারের, আজ তাহা নিরূপণ করাও শক্ত। তবে সাধারণতঃ মানুষের রতিশয়নে একটী সাধারণ আসনই বিশেষরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রচলিত দেখা যায়। এই সাধারণ আসন রমণীর ঊর্দ্ধমুখী হইয়া শয়ন এবং পুরুষের রমণীদেহের উপর অবস্থান। ইহা সৃষ্টিকার্য্যে বিশেষ সহায়ক আর ইহার বন্ধন প্রক্রিয়াও অতি সহজ ও আড়ম্বরবিহীন। এই সকল কারণে সর্ব্বদেশের নর-নারীর পক্ষেই ইহা একান্ত উপযোগী ও প্রশস্ত বলিয়া বিবেচিত। ইহার যে বিপরীত অবস্থা তাহা বিপরীত আসন বলিয়া পরিচিত। বিপরীত আসন বন্ধনে পুরুষের ঊর্দ্ধমুখ হইয়া শয়ন ও

রমণীর পুরুষের দেহোপরি অবস্থান বুঝায়। এতদ্ভিন্ন পাশাপাশি আসন প্রভৃতি অনেক প্রকার রতি আসনের কথা বাৎসায়নের 'কামসূত্রম্' গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ আছে। কাজেই যে সকল দম্পতির মধ্যে যৌনাঙ্গের অসাম্যতা পরিলক্ষিত হয়, তাঁহারা যদি অবস্থা বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের উপযোগী আসন বাছিয়া লন তবে তাঁহাদের পক্ষেও প্রকৃত যৌনতৃপ্তি লাভ করা কঠিন হইবে না।

এমনও দেখা গিয়াছে, অনেক অপরিণত ভগাঙ্কুরবিশিষ্টা ও খর্ব্বকায়া রমণী সাধারণ আসনে মোটেই তৃপ্ত হন না, কিন্তু ইঁহারা অনেকেই আবার বিপরীত অথবা পাশাপাশি আসনে পূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। যে সকল নারী সাধারণ আসন বন্ধনে বিশেষ অবসন্ন ও শ্রান্ত হইয়া পড়ায় প্রকৃত তৃপ্তিলাভে বঞ্চিতা থাকেন, তাঁহারাই আবার পাশাপাশি আসন বন্ধনে পরিপূর্ণ আনন্দ ও তৃপ্তিলাভে সমর্থা হন। অনেক পুরুষকে দেখা যায়, সাধারণ আসন বন্ধনে হয়ত দুই এক মিনিটের বেশী বীর্য্যধারণে সমর্থ হন না, তাঁহারাই আবার পাশাপাশি আসন বন্ধনে অধিককাল বীর্য্যধারণে সমর্থ হইয়া থাকেন। গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাস ও শেষের তিন মাস সঙ্গম একেবারে পরিত্যাগ সবচেয়ে মঙ্গলকর। এতদ্ভিন্ন ঐ অবস্থায় অন্যান্য সময়ে রমণে সাধারণ ও বিপরীত আসন উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া পাশাপাশি আসন বন্ধনে রমণলিপ্ত হইলে গর্ভিণীর বিশেষ কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

দম্পতির মধ্যে রতিকালের স্থায়িত্ব সমান করিতে পারিলে সবচেয়ে ভাল। নচেৎ উভয়ে চরমানন্দ লাভ না করা পর্য্যন্ত রতি বিরতি করা কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিশেষজ্ঞগণের অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে, বয়স্থা স্বাস্থ্যবতী নারীগণ সাধারণতঃ ১০ হইতে ১৫ মিনিট কাল সম্ভোগ ব্যতিরেকে চরিতার্থ হয় না; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বয়স্ক স্বাস্থ্যবান পুরুষদিগকে

সাধারণতঃ ২ হইতে ৫ মিনিটকাল মধ্যেই পরিতৃপ্ত হইতে দেখা যায়। আবার এমন পুরুষও দেখা যায়, যাঁহারা চরমানন্দ লাভ করিতে অগ্রসর হইলে স্ত্রী ইহার ভিতর একাধিকবার রতিপরিতৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে স্ত্রীর শক্তিবর্দ্ধনের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কিন্তু অল্প রতিশক্তিসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে ঔষধাদির সহিত মনোবল প্রয়োগে রতিকে বিলম্বিত করা দরকার। 'বিবাহের মিথুন-সঙ্কেত' নামক পরবর্ত্তী পুস্তকে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিব।

সমাপ্ত